শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে

তৃতীয় খণ্ড

সঙ্কলক ও সম্পাদক

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

কলকাতা

প্রকাশক
স্বামী মুমুক্ষানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলকাতা-৭০০০০৩
E-mail : info@udbodhan.org

প্রথম প্রকাশ
শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি
১লা জানুয়ারি ১৯৯৫

দ্বিতীয় সংস্করণ
ফাল্গুন ১৪১১/February 2005

প্রথম পুনর্মুদ্রণ
শ্রাবণ ১৪১৩
August 2006
2M2C

ISBN 81-8040-072-7 (set)
ISBN 81-8040-075-1 (Vol.-III)

মুদ্রক
[illegible] প্রেস
২/৩০ দমদম রোড
কলকাতা-৭০০০৩০

প্রকাশকের নিবেদন

'শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে'র তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। আশাকরি প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের মতো এই খণ্ডটিও ভক্তদের কাছে সাদরে গৃহীত হইবে। দুই বৎসর আগে প্রকাশিত প্রথম খণ্ডটির মতো গত বৎসর প্রকাশিত দ্বিতীয় খণ্ডটিও প্রকাশের তিন মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হইয়া যায় এবং পুনর্মুদ্রণ করিতে হয়। বর্তমানে দুটি খণ্ডই পরবর্তী পুনর্মুদ্রণের অপেক্ষায়। ইহা হইতে বুঝা যায়, গ্রন্থটি সম্পর্কে ভক্তদের চাহিদা কী বিপুল! এই চাহিদা ইহাই প্রমাণ করে যে, শ্রীশ্রীমায়ের কথা জানিবার জন্য মানুষের আগ্রহ উত্তরোত্তর প্রবলভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে।

বর্তমান খণ্ডে শ্রীশ্রীমা সম্পর্কে ৩৫টি স্মৃতিকথা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ৮টি স্মৃতিকথা ভিন্ন বাকি ২৭টি স্মৃতিকথা বিভিন্ন সময়ে 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত হইয়াছে। স্মৃতিকথাগুলির মধ্যে ৫টি স্মৃতিকথা ইংরাজী হইতে অনূদিত। এই খণ্ডের বিশেষ আকর্ষণ 'শ্রীশ্রীমায়ের পত্রাবলী'। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য মহারাজ তাঁহার পূর্বপ্রকাশিত 'পাঁচ ফুলে সাজি' পুস্তিকাটি বর্তমান খণ্ডে সম্পূর্ণতঃ অথবা অংশতঃ অন্তর্ভুক্তির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এবং অনুমোদন আমাদের স্বেচ্ছায় দান করিয়াছেন। গ্রন্থটির 'পরিশিষ্ট' অংশটিও খুব মূল্যবান। গ্রন্থের প্রথম দুটি খণ্ডের ন্যায় বর্তমান খণ্ডটিরও সঙ্কলন ও সম্পাদনা করিয়াছেন 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।

১লা জানুয়ারি ১৯৯৭

স্বামী সত্যব্রতানন্দ

চিত্রসূচী

সঙ্কলক ও সম্পাদকের নিবেদন

'শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে'র তৃতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হলো। বর্তমান খণ্ডে মোট ৩৫টি স্মৃতিকথা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এগুলির মধ্যে ৮টি ভিন্ন বাকি ২৭টি 'উদ্বোধন'-এ বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। ষষ্ঠ পর্বে অন্তর্ভুক্ত ৫টি স্মৃতিকথাই ইংরেজী থেকে অনূদিত।

বর্তমান খণ্ডে ৫টি পর্ব—পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম এবং নবম। এছাড়া রয়েছে 'পরিশিষ্ট'। অষ্টম পর্বে অন্তর্ভুক্ত "পাঁচ ফুলের সাজি" অংশটি শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য পূজ্যপাদ ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য মহারাজের পূর্বপ্রকাশিত 'পাঁচ ফুলে সাজি' পুস্তিকার নির্বাচিত সঙ্কলন। পূজ্যপাদ মহারাজ স্বেচ্ছায় তাঁর এই পুস্তিকাটি সম্পূর্ণতঃ অথবা অংশতঃ বর্তমান খণ্ডে অন্তর্ভুক্তির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, অধিকার এবং অনুমোদন আমাকে দান করেছেন। তাঁর এই উদার দাক্ষিণ্যের জন্য আমরা কিছু মূল্যবান স্মৃতিকণিকা বর্তমান খণ্ডে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি।

নবম পর্বে শ্রীশ্রীমায়ের ১০৮টি পত্র রয়েছে। বাস্তবিকই 'শ্রীশ্রীমায়ের পত্রাবলী' যেন একটি জপমালা! পত্রগুলির মধ্যে ৫৮টি পত্র এপর্যন্ত অপ্রকাশিত ছিল। বাকি পত্রগুলি প্রধানতঃ 'উদ্বোধন'-এ বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। 'উদ্বোধন' ভিন্ন অন্যত্র প্রকাশিত পত্রগুলির সূত্র যথাস্থানে নির্দেশিত হয়েছে। অপ্রকাশিত পত্রগুলি যাঁদের সূত্রে আমরা পেয়েছি তাঁদের নাম যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। 'পরিশিষ্ট' অংশে 'ভানু-পিসির গান', 'স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পত্র', 'স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের পত্র', 'কথামৃতকারের পত্র' এবং 'পুঁথিকারের পত্র' আমরা পেয়েছি পূজ্যপাদ ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য মহারাজের পূর্বোক্ত 'পাঁচ ফুলে সাজি' পুস্তিকা থেকে।

বর্তমান খণ্ডটি প্রস্তুত এবং প্রকাশ করার জন্য 'উদ্বোধন' এর একনিষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবী শ্রীকল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা সর্বাগ্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা থেকে প্রকাশ পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে তাঁর একান্ত সক্রিয় ও নিরলস সহযোগিতা ভিন্ন খণ্ডটি প্রকাশ করা কঠিন হতো। 'উদ্বোধন' এর আরেকজন নিষ্ঠাবান স্বেচ্ছাসেবী তরুণ অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্যের নীরব অথচ সক্রিয় সেবার স্বাক্ষর এই খণ্ডের বহু পৃষ্ঠায় রয়েছে। 'উদ্বোধন' এর তরুণ কর্মী শ্রীমান অরিন্দম দাস যে নিষ্ঠা এবং ভালবাসার সঙ্গে গ্রন্থটির আদ্যন্ত প্রুফ সংশোধনের কাজ করেছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। 'উদ্বোধন'-এর প্রবীণ কর্মী শ্রীসুবোধকৃষ্ণ ভট্টাচার্য এবং তরুণ কর্মী শ্রীঅনুপ রায়ও এই খণ্ডটি প্রকাশের কাজে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। তাঁরা সকলেই কাজটিকে শ্রীশ্রীমায়ের সেবা হিসেবে নিয়েছিলেন বলে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন কাজটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করবার। শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ যে তাঁদের ওপরে অকাতরে বর্ষিত হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের সমস্ত পরিশ্রম সার্থক হবে যদি ভক্তজনদের কাছে গ্রন্থের বর্তমান খণ্ডটি মাতৃ অনুধ্যানে সহায়ক হয়ে ওঠে।

১লা জানুয়ারি ১৯৯৭ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

সূচীপত্র

অষ্টম পর্ব

নবম পর্ব

পরিশিষ্ট

পঞ্চম পর্ব

"তোমার লিখিবার শক্তি আছে। কিন্তু কোন্ বিষয়ে কিরূপে লিখিলে লোকে ঠিক ঠিক [শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষত্ব, বক্তব্য, আচরণ এবং বাণীর তাৎপর্য] বুঝিতে পারিবে এবং কোন্ ঘটনার কতদূর প্রকাশ করা কর্তব্য—এই সকল বিষয়ে শিক্ষা করিতে হইবে। লেখনী অনেকস্থলে সংযত রাখিতে হয়।" —স্বামী সারদানন্দ

"শ্রীশ্রীমায়ের কথা যদি উদ্ধৃত কর, তবে খুব হিসাব করে করবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা উল্লেখ করতে পার, কিন্তু তাও খুব সতর্কতার সঙ্গে করবে।" —স্বামী সারদানন্দ

শ্রীশ্রীমায়ের কথা

লক্ষ্মীমণি দেবী

লক্ষ্মীমণি দেবী শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্রী—রামেশ্বরের দ্বিতীয় সন্তান, শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীতে 'লক্ষ্মী-দি' বা 'লক্ষ্মী-দিদি' নামে সুপরিচিতা।—**সম্পাদক**

ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বর বাগানে ছিলেন, শ্রীমা ও আমি ঠাকুরের ঘরের উত্তরদিকে নহবতের নিচের ঘরে থাকতাম। অনেকদিন মায়ের সঙ্গে ঐ নহবতে বাস করেছিলাম। তখন শ্রীমার বয়স বাইশ-তেইশ, আমার বয়স চৌদ্দ-পনের। নহবতের ছোট ঘরটিতে শ্রীমা, আমি, গোলাপ-মা, যোগীন-মা এবং মধ্যে মধ্যে মাস্টার মহাশয়ের স্ত্রী, চুনিলালের স্ত্রী, গৌরী-মা, যোগীন স্বামীর স্ত্রীও[১] থাকতেন। আবার সেখানে রাজ্যের জিনিস। সব রকম ভাঁড়ারের জিনিস—কাঠ, উনুন, জলের জালা পর্যন্ত; কাঠের সিন্দুক, পোর্টমেন—এসমস্ত থাকত। মাকে রান্না করতে হতো, আমি যোগাড় দিতাম। রান্না আবার অনেক রকম। ছেলেদের জলখাবার, ডাল-ভাত, তরকারি; রাত্রিতে ঘন ঘন ডাল ও বড় বড় রুটি। ঠাকুরের জন্য ঝোলভাত। আর আমাদের প্রায়ই ভাতে-ভাত যা-হয় হতো। এর ওপর কোন ভক্ত বেলায় এসে গাড়ি থেকে নামবার সময় হয়তো হেঁকে বললেন ঃ "আজ ছোলার ডাল খাব।" মা আবার ছোলার ডাল বসালেন।

নহবতের সরু বারান্দা চাটাই (দরমা) দিয়ে মাথার ওপর পর্যন্ত ঘেরা ছিল। তার মধ্যেই বাস করতে হতো। ঠাকুর তাই আমাদের খাঁচার পাখি—শুকশারি—বলতেন। কখনো কখনো তাঁর ঘরে কীর্তন, গান ইত্যাদি হওয়ার আগে রামলাল-দাদাকে নহবতের দিকের দরজাটি

---

১ শ্রীরামকৃষ্ণের যুবক ভক্ত যোগীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী—পরবর্তী কালে স্বামী যোগানন্দ—বিবাহিত ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর কথা এখানে বলা হয়েছে।—**সম্পাদক**

খুলে দিতে বলতেন। বলতেন : "এখানে কত ভাব-ভক্তি হবে ওরা সব দেখবেনি? শুনবেনি? কেমন করে তবে শিখবে?" চাটাইয়ের মধ্যে আঙুল-প্রমাণ সরু ছেঁদা দিয়ে আমরা ঠাকুরের ঘরের ভিতর সব দেখতাম। উত্তরের দরজাটা প্রায় খোলা থাকত। কত গান, কীর্তন, নাচ, সমাধি আর ভক্তদের নিয়ে কী আনন্দ! একদিন [চাটাইয়ের মধ্যে] সেই ছেঁদা একটু বেড়ে গেছে দেখে ঠাকুর হাসতে হাসতে [রামলাল-দাদাকে] বললেন : "ওরে রামনেলো, তোর খুড়ীর পরদা যে ফাঁক হয়ে গেল!"

আমাদের যে কী আনন্দ গেছে সে আর কী বলব? আমাতে মা-ঠাকরুনতে যখন নহবতে থাকতাম—তখন যে কী আনন্দ, তার কাছে ব্রহ্মানন্দও তুচ্ছ হয়ে যায়। এমন ঠাকুরের সঙ্গ—পূর্ণ হতেও পূর্ণ যিনি! পূর্ণব্রহ্ম বললে, কি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্তা বললে একটু ঐশ্বর্য বোঝায়। কিন্তু আমাদের ঠাকুরের ঐশ্বর্যের নাম-গন্ধ নেই। তিনি প্রেমে ঢালা ঢলঢল মূর্তিখানি—প্রেমের সার জিনিসটি।

শ্রীমা যখন ঠাকুরকে পেন্নাম করতে যেতেন, অমনি ঠাকুমাকেও[২] একটি পেন্নাম করতেন।

দক্ষিণেশ্বরে থাকতে একদিন শ্রীমা বললেন : "কাল উনি আমার জিভে লিখে দিয়েছেন। তুইও যা না।" আমি বললাম : "আমার বড় লজ্জা করে। কি বলে চাইব?—কারা সব আছে।" তারপর একদিন পেন্নাম করতে গেছি। কিছু বলিনি। তিনি আপনিই বললেন : "তোর কোন্ ঠাকুর ভাল লাগে?" আমার ভারী ভেতরে ভেতরে আনন্দ। বললাম : "রাধাকৃষ্ণ"। তিনি ঐ বীজ ও নাম জিভের ওপর লিখে দিলেন। তারপর মুখে তা বলে দিলেন। আমার গলায় তখন তুলসীর মালা ছিল। কামারপুকুরের জমিদার লাহাবাবুদের পেসন্ন-দিদি[৩] পরিয়ে দিয়েছিল। বললেন : "মালা রাখবি। তোকে

২ শ্রীরামকৃষ্ণের গর্ভধারিণী চন্দ্রমণি দেবী।—সম্পাদক

৩ ধর্মদাস লাহার বালবিধবা কন্যা প্রসন্নময়ী। তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং পবিত্র স্বভাবের জন্য গ্রামের সকলে তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা এবং সম্ভ্রমের সঙ্গে দেখত।—সম্পাদক

বেশ দেখায়।" আমি ও মা ইতিপূর্বে একজন উত্তর [উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল] দেশের সন্ন্যাসীর কাছে শক্তিমন্ত্র নিয়েছিলাম। বেশ মোটা-সোটা, খাসা চেহারা। শান্ত মূর্তি। নাম স্বামী পূর্ণানন্দ। বুড়ো দেখতে যেন পাকা আমটি। সেকথা মা ঠাকুরকে পরে বলেছিলেন। তিনি বললেন : "তা হোক, লক্ষ্মীকে আমি ঠিকই দিইছি।" সন্ন্যাসী আমাদের কামারপুকুরে গিয়েছিলেন। শুনেছি, তাঁর কাছ থেকে ঠাকুর ও আমার বাবা[৪] কিসব মন্ত্র নিয়েছিলেন।

ঠাকুরের তো রাত্তিরে বেশি ঘুমই হতো না। প্রায় রাত তিনটেয় তিনি ঝাউতলায় শৌচে যেতেন। যাবার সময় নহবতের পাশে এসে আমাকে ডাকতেন : "ও লক্ষ্মী, ওঠরে ওঠ। তোর খুড়ীকে তোলরে। আর কত ঘুমুবি? রাত পোহাতে চলল। গঙ্গাজল মুখে দিয়ে মার নাম কর, ধ্যান-জপ আরম্ভ করে দে।" তখন আমাদের ঘুম পাতলা হয়ে এসেছে। শীতের সময় ওঁর সাড়া পেলে মাঝে মাঝে শ্রীমা লেপের ভেতর শুয়ে শুয়ে আমাকে আস্তে আস্তে বলতেন : "তুই চুপ কর। ওঁর চোখে ঘুম নেই। এখনো ওঠবার সময় হয়নি। কাক-কোকিল ডাকেনি। সাড়া দিসনি।" সাড়া না পেলে বা আমরা উঠিনি মনে হলে তিনি দরজার নিচে দিয়ে জল ঢেলে দিতেন। সব ভিজে যাবার ভয়ে তাড়াতাড়ি আমাদের উঠে পড়তে হতো। 'সব' আর কি—একখানা মাদুর আর একটা কাঁথা। এক-একদিন সেসব ভিজেও যেত। শুকোনো দায় হতো, রোদ তো আর পেতুম না। বাইরে দেওয়া চলত না। ঠাকুর আমার কাছে বিছানা ভেজার কথা শুনে গাইতেন : "প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়, শান্তিপুর ডুবুডুবু, নদে ভেসে যায়"—ইত্যাদি। সেই থেকে খুব ভোরে উঠবার অভ্যাস হয়ে গেছে।

আমি দেশে থাকতে মাকে একটু একটু পড়াতুম। আমি পাঠশালে যেতুম। অনেক বাধার মধ্যেও মা পড়তে শিখেছিলেন। নহবতে

---

৪ শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যম অগ্রজ রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।—সম্পাদক

থাকাতে আমি সময় [-সুবিধা] জেনে মাকে পড়ে শোনাতাম। একদিন ঠাকুর বাগানের পীতাম্বর ভাণ্ডারীর এগারো বছরের ছেলে শরৎ ভাণ্ডারীকে বললেন : "তুই লক্ষ্মীকে ও তার খুড়ীকে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ পড়িয়ে দে।" এই দুইভাগ শেষ হলে এবং আমরা সামান্য লিখতে পারলে ঠাকুর আমাদের বললেন : "আর লেখাপড়া শিখতে হবে না। এখন রামায়ণাদি ধর্মপুস্তক বেশ পড়তে পারবে।..."

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীমা ও আমি একদিন রাত্রিতে মৃদুগলায় গান করছিলাম। ভাবের সঙ্গে ভজন বেশ জমেছিল। ঠাকুর তা শুনতে পেয়েছিলেন। পরদিন তিনি শ্রীমাকে বললেন : "কাল যে তোমার খুব গান হচ্ছিল। তা বেশ বেশ, ভাল।"

একদিন যদু মল্লিকের স্ত্রী একটি চওড়া লালপেড়ে কাপড় গেরুয়া রঙে ছুপিয়ে শ্রীমাকে দিয়েছিলেন। তিনি সে-কাপড় পরে ভবতারিণী ও রাধাকান্তকে প্রণাম করে ঠাকুরকে প্রণাম করতে এলেন। ঠাকুর শ্রীমার গেরুয়া কাপড় দেখে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : "লক্ষ্মী, এ কাপড় কে দিলে? এটি নহবতে গিয়ে ছেড়ে রাখতে বল। বাগানে কোন ভৈরবী এলে তাকে দিতে বলবি। গেরুয়ার জল পায়ে পড়তে নেই।"

শরীর যাবার পূর্বে ঠাকুর কাশীপুরের বাগানে বালিশে ঠেস দিয়ে বসে আছেন। রোগশয্যা। সেইদিন রাত্রেই শরীর যাবে। সবাই চুপচাপ। সকলেই ভাবছিল, কথা বন্ধ হয়ে গেছে। শ্রীমা ও আমি যেতেই আস্তে আস্তে বললেন : "এসেছ? দেখ, আমি যেন কোথায় যাচ্ছি। জলের ভেতর দিয়ে, অনেক দূর।" শ্রীমা কাঁদতে লাগলেন। ঠাকুর বললেন : "তোমাদের ভাবনা কি? যেমন ছিলে তেমনি থাকবে। আর এরা (নরেন প্রমুখ) আমার যেমন করেছে, তোমায়ও তেমনি করবে। লক্ষ্মীটিকে দেখো। কাছে রেখো।"

★

[১৮৮৯-এর জানুয়ারিতে] পুরী থেকে জাহাজপথে কলকাতায় ফিরে শ্রীমা সহ আমরা বলরামবাবুর বাটীতে[?] উঠি। সেখান

থেকে আমাদের আঁটপুর হয়ে কামারপুকুর যাবার ব্যবস্থা হয়। সেখানে তখন স্বামীজী প্রভৃতি রয়েছেন। শ্রীমাকে পেয়ে স্বামীজীর খুবই আনন্দ। ইতিমধ্যে আমাদের মালপত্র এসে পড়ে। তার মধ্যে বিছানার মোটটি বেশ একটু বড় ছিল। ওটি নামানো মাত্র স্বামীজী আনন্দ-ভরে বালকের মতো ওটিকে ঘোড়া করে উঠে বসলেন এবং হেটহেট করে অঙ্গভঙ্গি-সহ যেন দৌড়াতে লাগলেন। শ্রীমা ছেলের আনন্দ দেখে খুব হাসছেন ও আনন্দ করছেন, এদিকে আমার বুকের ভেতর যেন দুর-দুর করতে লাগল এবং চোখ-মুখও যেন বিবর্ণ হয়ে গেল। শ্রীমা আমার অবস্থা লক্ষ্য করে বললেন ঃ "লক্ষ্মীর আবার কি হলো?" আমি বললাম ঃ "দাদাকে বারণ কর।" শ্রীমা বললেন ঃ "তুমি বল না"—এবং সঙ্গে সঙ্গে দাদাকে বললেন ঃ "লক্ষ্মী নামতে বলছে।" স্বামীজী অবিলম্বে নেমে আমায় বললেন ঃ "কি হয়েছে দিদি? বেশ ঘোড়া পেয়েছিলাম।" আমি বললাম ঃ "ওর মধ্যে আমার জগন্নাথের পট আছে, ভেঙে যাবে।" স্বামীজী বললেন ঃ "তুমি আগে বললেই পারতে, তাহলে কি আর উঠি?" এই বলে তিনি উদ্দেশে প্রণাম করলেন, তখন আমারও খুব আনন্দ হলো।

একবার আমি কয়েকটি ভক্ত-সহ শ্রীমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দক্ষিণেশ্বর থেকে উদ্বোধনের বাটীতে এসেছিলাম। বহুক্ষণ আমাদের কথোপকথন চলল। শ্রীমা জানালেন যে, যোগীন-মা জ্বরে পড়ে আছেন। এই শুনে আমি তাঁকে দেখতে গেলাম। যোগীন-মা সেদিন থাকার জন্য অনুরোধ করায় আমি বললাম ঃ "অনেক রকম সব সঙ্গে এনেছি, আজ আসি।" যোগীন-মা অসুস্থ থাকায় যত্ন নিতে পারেননি এবং আমার বিদায়কালে আমাকে কিছু খাওয়াবার বা দেবার কথা শ্রীমার মনে ওঠেনি। পরে শ্রীমা—লক্ষ্মীকে সমাদর করা হলো না, পাছে সে কিছু মনে করে—এই ভেবে চিন্তিত হলেন। আমি সেদিন সশিষ্য ইটিলীতে [মধ্য কলকাতার এন্টালীতে] শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবে গেলাম। কিছুক্ষণ পরে শ্রীমা তাঁর জনৈক আশ্রিতকে বললেন ঃ

"ওরে, লক্ষ্মী চলে গেল। তাকে কিছু দেওয়া হলো না। নে, তুই এই টাকা দুটি ও নতুন কাপড়খানি নিয়ে তাকে দিয়ে আয়।" আশ্রিতটি শ্রীমার আদেশ শিরোধার্য করে আমাকে উক্ত জিনিসগুলি অবিলম্বে ইটিন্দীতে গিয়ে দিয়ে এল।[৫]

একবার কামারপুকুরে জনৈক ভক্ত শ্রীমার সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। সেখানে আমিও ছিলাম। তিনি [ভক্তটি] বিদায় নেবার সময় শ্রীমা তাঁকে বললেন : "আমায় ডাকিস।" পরে বললেন : "ঠাকুরকে ডাক, তাঁকে ডাকলেই সব হবে।"

আমি—না মা, একি কথা, এ তো তোমার বড় অন্যায়। ছেলেদের এমন করে ভোলালে তারা কি করবে?

শ্রীমা—কই, আমি কি করলুম?

আমি—তুমি এই মুহূর্তে বললে, 'আমায় ডাকিস'; আবার বলছ, 'ঠাকুরকে ডাক'।

শ্রীমা—ঠাকুরকে ডাকলেই তো সব হলো।

আমি—মা, এরকমভাবে ভোলানো তোমার অন্যায়। (ভক্তকে—) দেখ, আমি আজ এই নতুন শুনলুম যে মা বলছেন—আমায় ডেকো। তুমি একথা যেন ভুলো না। ঠাকুর আর কে? তুমি মাকেই ডেকো। তোমার বড় ভাগ্য যে, মা নিজে তোমায় একথা বললেন। তুমি মাকেই ডেকো। (শ্রীমাকে—) কেমন মা, হয়েছে এখন?

মা মৌন থেকে সম্মতির লক্ষণ জানালেন।[*]

সঙ্কলন : সোমনাথ ভট্টাচার্য

---

৫ এই প্রসঙ্গে বর্তমান খণ্ডে প্রকাশিত স্বামী শঙ্করানন্দের স্মৃতিকথাটি দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক

* শ্রীশ্রীলক্ষ্মীমণি দেবী—কৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৪৩, পৃঃ ১৭, ৬৭, ১৬০; ৫৫, ২০১; ৬৫; ৫২; ৫৮; ৫৫, ২০১, ৩৬; ২০১, ১৬০; ৭১; ১৭০; ২৩৬; ৫৪; ৭৯; ৭৩; ৭০

মায়ের স্মৃতি

স্বামী শঙ্করানন্দ

১৯০৪ কি ১৯০৫ সাল। খোকা মহারাজ (স্বামী সুবোধানন্দ), আমি ও বিশ্বরঞ্জন (স্বামী হরিহরানন্দ) মায়ের দেশে গেছি। মা তখন জয়রামবাটীতে। আমরা পৌঁছাতেই তিনি জেলে ডাকিয়ে পুকুরে মাছ ধরালেন। প্রথমবারেই দুটো মাছ পড়ল মাঝারি রকমের। দুটোই রেখে দিলেন। মা বললেন : "তোমরা এসেছ বলে প্রথমবারেই মনোমত মাছ পাওয়া গেল। তোমরা পয়মন্ত। এই সেদিন কালীর[১] বিয়ের পাকা দেখার দিনে, অনেকবার জাল ফেলে কয়েকটি ছোট ছোট মাছ পাওয়া গেল।" মা নিজেই সব রান্না করলেন। আমাদের কাছে বসিয়ে কত আদর-যত্ন করে খাওয়ালেন। সে স্নেহ-ভালবাসা কত সহজ সুন্দর! একেবারে নাগালের মধ্যে, অন্তরের অন্তস্তলে।

ভোররাত্রে উঠে আমি আর খোকা মহারাজ শৌচে বেরিয়েছি। মাঠের মাঝখান দিয়ে আমোদর নদের দিকে এগোচ্ছি। খোকা মহারাজ লক্ষ্য করলেন, একটি মেয়ে মাথায় ঝুড়ি কিংবা চাঙাড়ি নিয়ে এগিয়ে আসছে। আমাদের দেখতে পেয়ে, আরেকটি মেয়ের মাথায় বোঝাটি চাপিয়ে দিয়ে তারই আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমরা একটু চোখের আড়ালে চলে গেলে তারা মায়ের বাড়ির দিকে এগিয়ে যায়। আমি খোকা মহারাজকে জিজ্ঞেস করলাম : "আপনি কি চিনতে পেরেছেন, উনি কে?" তিনি বললেন : "হ্যাঁ, আমি চিনেছি, বেশ স্পষ্ট করে দেখেছি। আমাদেরই মা। কত রাত থেকে উঠে পাশের গ্রামের হাট থেকে আমাদের জন্য তরিতরকারি সংগ্রহ করতে গিছলেন।" পাড়াগাঁয়ে কী আর পাবেন? কয়েকটি ডাঁটা, থোড়, কাঁচকলা ছিল

---

১ কালী-মামা—শ্রীমায়ের তৃতীয় ভ্রাতা কালীকুমার মুখোপাধ্যায়।—সম্পাদক

ঐ চাঙাড়িতে। আমি শুনে হতভম্ব হয়ে গেলাম। তাহলে তো বেশিদিন আর এখানে থাকা হবে না! আমাদের জন্য মায়ের কষ্টের অবধি নেই। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম, রাত্রেও একটু ঘুমোতে পারেন না। তেরাত্রি বাস করে আমরা মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে আরামবাগে এলাম।

১৯১২ সাল। (রাজা) মহারাজের সঙ্গে আমি কাশী অদ্বৈত আশ্রমে রয়েছি। শ্রীশ্রীমাও তখন সেখানে। মহারাজ আমায় বললেন : "দেখ অমূল্য, মাকে আজ চপ তৈরি করে খাওয়াতে হবে।" আমি বাজার থেকে মোচা ও আলু কিনে আনলাম। সিদ্ধ করলাম। মোচা ভিতরকার পুর। আলু সিদ্ধ করে ছাড়িয়ে মাখছি, দেখলাম—থসথসে নরম। তখন আরেকটা জিনিস দিয়ে সেটাকে শক্ত করে নিলাম। চপ তৈরি করে যখন একটি থালায় সাজিয়ে ঠাকুরঘরে নিয়ে গেলাম, তখন মা পূজা শেষ করেছেন। অন্যান্য ভোগের সঙ্গে মা চপও ঠাকুরকে নিবেদন করলেন। মা অন্য প্রসাদের সঙ্গে চপ-প্রসাদও খেলেন। খুব ভাল লেগেছে। অবশ্য মায়ের স্বভাবই ছিল—সব জিনিসকে ভালভাবে দেখা। গোলাপ-মাও খেয়েছেন। বেশ মচমচে চপ। খেয়ে তারিফ করলেন। বিকেলে ওপরের বারান্দা থেকে গোলাপ-মা আমায় জিজ্ঞেস করছেন : "হ্যাঁ অমূল্য, এত চমৎকার চপ কি করে তৈরি করলে? কেমন মচমচে, খুব সুস্বাদু।" মহারাজও তখন বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন। আমায় চোখ টিপে দিলেন। আমি চুপ করে রইলাম। কোন উত্তর দিলাম না। মহারাজ উত্তর দিলেন : "গোলাপ-মা, তোমরা ভেবেছ তোমরাই ভাল রান্না করতে জান। এখন দেখ, আমরাও তোমাদের চেয়ে ভাল রান্না করতে পারি।" মহারাজ পরে আমায় তৈরি করার প্রণালী জিজ্ঞেস করেছিলেন। বললাম : "যখন আলু চটকাতেই নরম চটচটে হয়ে গেল, তখন সুজি ভেজে ওর

সঙ্গে মিশিয়ে দিলাম। মশলাও ভেজে গুঁড়িয়ে পুরের সঙ্গে ঠেসে নিয়েছিলাম।"[২]

মা তখন উদ্বোধন-এ আছেন। এক রবিবার বিকেলে আন্দাজ তিনটের সময় ঠাকুরের ভাইঝি লক্ষ্মী-দিদি তিনজন ভক্তসঙ্গে সেখানে এলেন। তাঁরা সকলে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন ও প্রণাম করলেন। শ্রীশ্রীমা লক্ষ্মী-দিদিকে বললেন : "যোগীনের (যোগীন-মা) খুব জ্বর হয়েছে, শুয়ে আছে। ওকে একবার দেখে আয়।" লক্ষ্মী-দিদি যোগীন-মাকে দেখতে গেলেন। তখন যোগীন-মার খুব জ্বর। যোগীন-মার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে লক্ষ্মী-দিদি তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে এন্টালী [দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের আশ্রমে] চলে গেলেন। সেখানে ঠাকুরের তিথিপূজার উৎসব চলছিল।

কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীমা খোঁজ নিয়ে জানলেন যে, লক্ষ্মী-দিদি চলে গেছেন। মা জিজ্ঞেস করলেন, লক্ষ্মী-দিদিকে প্রসাদ দেওয়া হয়েছিল কিনা, কিন্তু কেউই বলতে পারলেন না যে, দেওয়া হয়েছে। এতে তিনি খুবই বিচলিত হয়ে উঠলেন—হয়তো এই কারণে যে, লক্ষ্মী-দিদি ছিলেন মা শীতলার অংশজাতা। ঠাকুর নিজে একথা বলে গিয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর ছোট্ট ভাইঝির সঙ্গে সর্বদা মিষ্ট ব্যবহার করতেন। পাছে লক্ষ্মী-দিদি রুষ্ট হলে কোন অমঙ্গল হয় সেই আশঙ্কায় মা তৎক্ষণাৎ একটি ছেলেকে ডেকে তার হাতে একটি ভাল শাড়ি ও মিষ্টি খাওয়ার জন্য দুটি টাকা দিয়ে তাকে নির্দেশ দিলেন এন্টালীর উৎসবে গিয়ে লক্ষ্মী-দিদির হাতে ঐগুলি দিতে এবং বলতে : "মা আশা করেছিলেন, আপনি চলে আসার আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসবেন। আপনার ঠিকমত যত্ন নেওয়া হয়নি বলে তাঁর দুঃখ হয়েছে। তিনি এগুলি আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।"

---

২ উদ্বোধন, ৯৮তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৩, পৃঃ ২২০। দ্রঃ স্বামী শঙ্করানন্দের গল্পকথা, বামুনমুড়া, ১৯৬৬, পৃঃ ৯, ১৭-১৮

ছেলেটি এন্টালীর আশ্রমে গিয়ে দেখল, বেশ কয়েকজন ভদ্রমহিলা লক্ষ্মী-দিদিকে ঘিরে রয়েছেন। সে সাবধানে তাঁদের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম করে শ্রীশ্রীমা তাকে যা বলতে বলেছিলেন তা বলল। লক্ষ্মী-দিদি যতটা খুশি হলেন ততটাই লজ্জিত হলেন—চলে আসার আগে মাকে জানিয়ে আসেননি বলে। তিনি বললেন : "আমার সঙ্গে যারা ছিল তারা এখানে আসার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল তাই আমি মাকে বলে আসতে ভুলে গেছি। যাহোক, মাকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিও এবং বোলো যে, আমি মায়ের কাছে একদিন গিয়ে সারাদিন থাকব।"

ছেলেটি ফিরে এসে লক্ষ্মী-দিদি যা যা বলেছিলেন সব বলাতে মা খুব স্বস্তি পেলেন। দু-তিন দিন পরে যেদিন লক্ষ্মী-দিদি এসে সারাদিন শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে কাটিয়ে গেলেন সেদিন মায়ের খুব আনন্দ হয়েছিল।[১] □

সংগ্রহ : স্বামী চেতনানন্দ

---

১ দ্রঃ Sri Sarada Devi : The Great Wonder, Ed. Swami Budhananda, Ramakrishna Mission, New Delhi, 1984, pp. 111-112. এই ঘটনাটি বর্তমান খণ্ডে প্রকাশিত লক্ষ্মীমণি দেবীর স্মৃতিকথাতেও উল্লিখিত হয়েছে।

স্বামী ঈশানানন্দ (বরদা মহারাজ) লিখেছেন, মায়ের শেষ অসুখের সময় রামলাল-দাদা সহ লক্ষ্মী-দিদি ও রামলাল-দাদার কন্যা কৃষ্ণময়ী একদিন উদ্বোধনে এসেছিলেন। সেদিনও মা লক্ষ্মী-দিদিকে কাপড় ও টাকা দিতে ভুলে গিয়েছিলেন এবং স্বামী ঈশানানন্দ ও স্বামী ধীরানন্দকে কাপড় ও টাকা দিয়ে এণ্টালীতে পাঠিয়েছিলেন। (দ্রঃ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ৭ম সং, ১৩৮০, পৃঃ ২৬৪-২৬৫; মাতৃসান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ, ৫ম সং, ১৩৯৬, পৃঃ ১৮০) তবে মনে হয় সেটি অন্য একদিনের কথা।—সম্পাদক

মায়ের কথা

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলব। তাঁকে কতটুকুই বা বুঝতে পেরেছি? ভগবান শঙ্করাচার্য তাঁর গীতাভাষ্যে লিখেছেন, অবতারপুরুষেরাও হুবহু মানুষের মতো লীলা করেন ; তবে তা নিজেদের কোন প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য নয়, জগতের কল্যাণের জন্যই তাঁরা মানুষের মতো আচরণ করেন। তাঁরা নিজেদের শরীরকে পর্যন্ত লোকহিতার্থে আহুতি দিয়ে থাকেন।

ঠাকুর বিনা আমন্ত্রণে কেশব সেনের কলুটোলার বাড়িতে ছুটে গিয়েছিলেন। কেশব সেদিন বাড়িতে ছিলেন না। ঠাকুর পরদিন হৃদয়কে নিয়ে বেলঘরেতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। কেশবের বাড়িতে এই যে ছোটাছুটি, এর পিছনে ঠাকুরের নিজের কোন স্বার্থ ছিল না ; ঠাকুরের যাতায়াত তাঁকে কিছু দেবার জন্য। কেশবের অসুখের সময় ঠাকুর সিদ্ধেশ্বরীকে ডাবচিনি মেনেছিলেন, যা আত্মীয়স্বজনের জন্য লোকে করে থাকে। ঠাকুর স্বামী বিবেকানন্দকে কত ভালবাসতেন! তাঁর অহৈতুকী ভালবাসা। সে-ভালবাসার আস্বাদ যারা পেয়েছে তাদের জীবনের ধারা বদলে গেছে। সে-আস্বাদ মুখে ব্যক্ত করা যায় না। ভক্তপ্রবর গিরিশ ঘোষ আমাদের বলেছিলেন : "ঠাকুর আমাকে দেবতা করে দিয়ে গেছেন। তিরস্কার বা ভর্ৎসনার ভিতর দিয়ে নয় রে, ভালবাসা দিয়ে।"

জীবনে প্রথম এই অহৈতুকী ভালবাসা আস্বাদন করেছি শ্রীমার কাছে। তাঁর অপার স্নেহলাভের সৌভাগ্য হয়েছে। সংসারাশ্রমে জননীর একমাত্র পুত্ররূপে আদরযত্নে পালিত হয়েছিলাম ; গর্ভধারিণীর ভালবাসাই তখন সর্বশ্রেষ্ঠ বোধ করতাম। শ্রীমার সান্নিধ্যে এসে সে-ভালবাসা আলুনি লেগেছিল।

জয়রামবাটীতে শ্রীমার প্রথম দর্শন লাভ করি। তখন ১৯০৫ কি ১৯০৬ সাল। আমার বয়স বাইশ-তেইশ। কলকাতার ছেলে পল্লীগ্রামে চলেছিলাম; ভাবনা হলো, কে শ্রীমার কাছে পরিচয় করিয়ে দেবে। মনে একটা সঙ্কোচ বোধ করছিলাম। যখন তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, মা তরকারি কুটছিলেন। আমাকে দেখেই বললেন : "কেমন আছ বাবা? রাস্তায় আসতে কোন কষ্ট হয়নি তো?" সম্পূর্ণ অপরিচিত আমি। "কেমন আছ বাবা?" এ কী প্রশ্ন! আমার জীবনে সেটি একটি স্মরণীয় দিন। সে-দিনটির কথা ভাবলে আজও অশ্রু সংবরণ করতে পারি না। সেবার মার কাছে সাতদিন ছিলাম। কত স্নেহ করেছিলেন! কত স্নেহবিগলিত কথা বলেছিলেন! তিনি তখনি ভাবসমাধি করিয়ে দিলেন না, চিরকালের মতো সন্তান বলে গ্রহণ করে নিলেন।

উদ্বোধনে একদিন পূর্ববঙ্গের একটি মেয়েকে মা দীক্ষা দিলেন। দীক্ষার পর তার সঙ্গে একত্র আহার করলেন। পরে তার হাতে এক ঘটি জল তুলে দিয়ে মা বললেন : "হাত ধোও।" হাত ধোওয়া হলে তাকে আরেক ঘটি জল দিয়ে মা বললেন : "পা ধোও।" মেয়েটি তো কেঁদে ফেলল। বলল, এমন আদেশ মা যেন না করেন। মা বললেন : "তুমি আমার কে?" সে উত্তর দিল : "আমি তোমার মেয়ে।" তখন মা বললেন : "তবে যা বলছি শোন। পা ধোও।" তখন সে পা ধুলো।

জয়রামবাটীতে একদিন একজন মুসলমান মজুর রোয়াকে খেতে বসেছে। ১৯০৫-১৯০৬ সালের পল্লীগ্রামের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণপরিবারের কথা বলছি। প্রসন্নমামার মেয়ে নলিনী উঠোন থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে সেই মজুরকে খেতে দিচ্ছিলেন। মা কি কাজে একটু ব্যস্ত ছিলেন; ব্যাপারটি তাঁর নজরে পড়তেই তিনি "ও কি রে!" বলে নলিনীর হাত থেকে থালা কেড়ে নিলেন। কাছে বসে "বাবা খাও" বলে পরিপাটি করে লোকটিকে খাওয়ালেন। তারপর এঁটো পরিষ্কার করে

মা গোবরজল ছড়া দিচ্ছেন, এমন সময় নলিনী বললেন ঃ "পিসিমা, তোমার জাত যাবে যে!" মা বললেন ঃ "ছেলের এঁটো পরিষ্কার করলে জাত যায় নাকি!"

নিবেদিতা তো মেম ছিলেন। মা তাঁর ভাষা জানতেন না; অথচ নিবেদিতার সঙ্গে একত্র খেতে বসতেন। তাঁর কী উদারতা! এইসব দৃষ্টান্ত আলোচনা করলে আমরা বুঝতে পারি মার ভালবাসা কী অদ্ভুত জিনিস। এই ভালবাসা দিয়েই তিনি 'সকলের মা' হতে পেরেছিলেন।

১৯১১ সালে দক্ষিণ দেশে গিয়ে মা ব্যাঙ্গালোরে এক সপ্তাহ ছিলেন। সেই দিনগুলির কথা আমার প্রায়ই মনে হয়। ঠাকুরের তখনো এত প্রচার হয়নি। মা আশ্রম দেখতে এসেছেন। কথা কানে হাঁটে। এই সাতদিন মহীশূর রাজ্যের দেওয়ান থেকে আরম্ভ করে গরিব দুঃখী পর্যন্ত কত লোক যে আশ্রমে এসেছিলেন তার ঠিকানা নেই। ন-বিঘে আশ্রম-প্রাঙ্গণ দর্শনার্থীতে ভরে যেত। মার এত আকর্ষণ! তিনি শুধু একটা ঘরে চুপ করে বসে থাকতেন, একটু একটু হাসতেন। ওদেশের ভাষা জানেন না বলে তাঁর খুবই কষ্ট হতো।

ব্যাঙ্গালোরে একদিন আড়াইটে-তিনটেয় মাকে ফিটনে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেই সময়টা আশ্রমে ভিড় ছিল না। কাছেই গোবিপুরের গুহা-মন্দির দর্শন করে আমরা যখন আশ্রমে ফিরলাম, তখন সেখানে লোকে লোকারণ্য। মাকে বললাম ঃ "দেখুন কত লোক দর্শনের জন্য এসেছে।" মা গাড়ি থেকে নামলেন। তাঁর পায়ে বাত ছিল, একটু টেনে টেনে চলতেন। মাকে দেখে দর্শনার্থী জনতা দক্ষিণদেশে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। মা অমনি সমাধিস্থা হয়ে বরাভয়করা মূর্তিতে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তাঁর বাহ্যজ্ঞান ছিল না। আমার ভয় হয়েছিল—পাছে পড়ে যান। সেদিন তিনি সকলের হৃদয় পুলকে ভরিয়ে দিয়েছিলেন। মা ব্যুত্থিতা হলে

দর্শনার্থীরা আনন্দ করতে করতে চলে গেলেন। একজন বললেন : "ইনি তো দেবী, আমাদের সত্যিকারের মা।"...

নারী ধর্মজগতে এক প্রহেলিকা। ভগবান বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, আচার্য শঙ্কর প্রমুখ অবতারদের জীবনে নারীর স্থান ছিল না। স্ত্রী ত্যাগ না করলে পরমার্থ লাভ হয় না—এই তাঁদের ভাব। শিবাবতার শঙ্কর বলেছেন : "নরকের দ্বার কি?—নারী।" সন্ত তুলসীদাসের দোঁহায় নারীকে "দিন কা মোহিনী রাত কা বাঘিনী" বলে অভিহিত করা হয়েছে। রামকৃষ্ণাবতারে কিন্তু এমন নয়। ঠাকুরের জন্য যখন পাত্রীর সন্ধান চলছিল, তখন তিনি নিজেই বলেছিলেন : "জয়রামবাটীতে রাম মুখুজ্জের বাড়িতে পাত্রী কুটোবাঁধা হয়ে আছে।" শ্রীমা ঠাকুরের সেই "কুটোবাঁধা" মেয়ে। সাক্ষাৎ জগদম্বা। ঠাকুর অন্য কাউকে গ্রহণ করলেন না। চিহ্নিত মেয়েটিকে নিয়ে সংসার-রঙ্গমঞ্চে তিনি যে অদ্ভুত লীলা, যে নিখুঁত অভিনয় করে গেলেন জগতের ইতিহাসে তার নজির মেলে না।

কৌরবসভায় দ্রৌপদী যখন লাঞ্ছিতা হন, যুধিষ্ঠির তখন সত্যবদ্ধ; তাই পাণ্ডবেরা ছিলেন নিষ্ক্রিয়। সতীর বেদনায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বুকের ভিতরটা দপদপ করছিল। চণ্ডীতে[১] আছে : "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু"। ঠাকুর এবং স্বামীজীও স্পষ্ট দেখেছিলেন—নারীজাতি না জাগলে দেশের উন্নতি হবে না। সত্যসঙ্কল্প স্বামীজীর একটি স্ত্রীমঠ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ছিল। মাকে কেন্দ্র করে গঙ্গার পূর্বতীরে স্বামীজীর স্ত্রীমঠের পরিকল্পনা আজ বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করতে চলেছে। সেখানে সন্ন্যাসিনীরা থাকবেন। তার ওপর বেলুড় মঠের কোন কর্তৃত্ব থাকবে না।[২] একদা অমাবস্যায় মাকে ষোড়শী-জ্ঞানে পূজা করে

১ চণ্ডী, ১১।৬

২ দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাতীরে শ্রীসারদা মঠের উদ্বোধন হয় ১৯৫৪ সালের ২ ডিসেম্বর উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দ।—সম্পাদক

শ্রীশ্রীমা

কাল : ১৩১৯ সাল (১৯১৩ খ্রীস্টাব্দ) স্থান : জয়রামবাটী

জেলো-জেলোর মাঠে ডাকাতকালীর মন্দির।

জেলো-জেলোর মাঠ। বর্তমানে এখানে চাষবাস হয়, আগে বিস্তৃত কাশবন ছিল। তার আড়ালে ডাকাতরা লুকিয়ে থাকত।

[আলোকচিত্র-দুটি আমরা মৃদুলকান্তি ধরের সৌজন্যে পেয়েছি।]

ঠাকুর ব্রহ্মকুণ্ডলিনীকে জাগিয়ে দিয়ে গেছেন। ভারতে আবার মৈত্রেয়ী গার্গীদের আবির্ভাব হবে। সমগ্র নারীজাতির ভিতর মাতৃভাবের উদ্বোধন—ষোড়শীপূজার এটাই গূঢ়ার্থ।

এখন ঠাকুর ও মায়ের যুগ। আমাদের সেইভাবে জীবন গঠন করতে হবে। মা কম সংসারী ছিলেন না! সংসারের মধ্যে থেকেই মেয়েদের আধ্যাত্মিক জীবন গঠন করতে হবে তাঁকে আদর্শ রেখে।

মার একটি উপদেশ আমি প্রত্যহ চিন্তা করি। লীলাসংবরণের চার-পাঁচ দিন আগে তিনি অন্নপূর্ণার-মা নামে আসন্ন মাতৃবিয়োগে শোকাকুলা একটি ভক্ত মেয়েকে বলেছিলেন : "যদি শান্তি চাও মা, কারো দোষ দেখো না, দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার।" নিমগাছের সবই তেতো। কিন্তু মৌমাছি নিমফুল থেকেও একটু মধু আহরণ করে নিয়ে যায়। তেমনি, সংসারে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক রয়েছে বটে, কিন্তু সকলেই মায়ের সন্তান। প্রত্যেকের মধ্যে একই ঈশ্বরীয় সত্তা বর্তমান বলে সকলকেই আপনার জ্ঞান করতে হবে।

মার এই অন্তিম উপদেশটি পালন করলে আমাদের জীবন মধুময় হয়ে যাবে।* □

সংগ্রহ : স্বামী চেতনানন্দ

---

* মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ১১ এপ্রিল ১৯৫৪ তারিখে পূজ্যপাদ মহারাজজীর ভাষণ। অনুলিখন : বিমলকুমার ভট্টাচার্য (দ্রঃ 'বিদ্যার্থী', শ্রীশ্রীমা-শতবর্ষ-জয়ন্তী সংখ্যা, ১৩৬১, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম, বেলঘরিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা। (পুনর্মুদ্রিত : উদ্বোধন, ৯৮তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, চৈত্র ১৪০২, পৃঃ ১৩৫-১৩৬)

শ্রীমা সারদাদেবী

স্বামী মাধবানন্দ

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাশক্তি হইয়াও শ্রীশ্রীমা নিজেকে সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখিয়াই তাঁহার দিব্যজীবন যাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, তাঁহার পুণ্যপ্রভাব অলক্ষ্যে দেশ-বিদেশের অসংখ্য নরনারীর হৃদয় অধিকার করিয়াছে। নতুবা তাঁহার অদর্শনের পর তাঁহার নামে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে এরূপ উন্মাদনার সৃষ্টি হইত না। তাঁহার জন্মস্থান জয়রামবাটীতে তাঁহার মর্মরবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারীর যে অপূর্ব আনন্দ-সম্মেলন হইয়াছিল, যাঁহারা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারা উহা কখনও ভুলিতে পারিবেন না। উহা শ্রীচৈতন্যদেবের অদ্ভুত আকর্ষণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বাস্তবিকই যেখানে যথার্থ ঐশী শক্তির বিকাশ, সেখানে ঐরূপই হইয়া থাকে।

স্বামী বিবেকানন্দের সুযোগ্য গুরুভ্রাতা স্বামী প্রেমানন্দ এক পত্রে লিখিতেছেন ঃ "...যে-বিষ নিজেরা হজম করতে পারছিনে, সব মার নিকট চালান দিচ্ছি। মা সব কোলে তুলে নিচ্ছেন! অনন্ত শক্তি—অপার করুণা!... স্বয়ং ঠাকুরকেও ওটি করতে দেখিনি। তিনিও কত বাজিয়ে বাছাই করে লোক নিতেন। আর এখানে—মার এখানে কি দেখছি? অদ্ভুত, অদ্ভুত! সকলকে আশ্রয় দিচ্ছেন, সকলের দ্রব্য খাচ্ছেন, আর সব হজম হয়ে যাচ্ছে। মা, মা! জয় মা!"

শ্রীমার এইরূপ অবারিত দ্বার ছিল বলিয়াই আমাদের মতো অনেকে তাঁহার নিকট আশ্রয় পাইয়াছে। মনে পড়ে ১৯০৯ সালের একটি দিনের কথা। পূজনীয় শশী মহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) তখন কলিকাতায় বলরামবাবুর বাটীতে (বর্তমানে বলরাম-মন্দিরে)।

আধ্যাত্মিক জীবনের পরম সহায়করূপে তিনি অন্য দু-চার কথার পরে লেখককে বলিলেন ঃ "আর, মার কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে নাও। তাহলে সব হবে।"[১] প্রকৃতপক্ষে ইঁহারাই শ্রীশ্রীমার মহিমা যথার্থ বুঝিয়াছিলেন এবং সেইজন্যই অত্যন্ত সম্ভ্রমের সহিত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন। মানুষ নিজ নিজ মনোভাব অনুসারেই জগতের সব জিনিস দেখিয়া থাকে। তাই জগন্নাথদর্শন করিতে গিয়া কাহারও কাহারও পুঁইমাচা[২] দেখা আশ্চর্যের কথা নয়। ১৯০৮ সালের শেষভাগে পঠদ্দশায় তিন বন্ধুর সহিত জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম দর্শন লাভ করি। দুঃখের বিষয়, সেই দর্শনের অতি অস্ফুট স্মৃতিই এখন মনে রহিয়াছে। দ্বিতীয়বার জয়রামবাটী যাই ১৯১০ সালের গ্রীষ্মের প্রারম্ভে, মঠের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ পূজনীয় বিরজানন্দ স্বামীর সহিত। তখন তিনি মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ। মনে আছে, মা তাঁহার প্রিয় সন্তানকে অতি যত্নের সহিত খাওয়াইতে ব্যগ্র ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শুনি যে, ঠাকুরই সব; সাধনভজন সকলের সহজসাধ্য নয়, উহা মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া করিতে হয় এবং সঙ্ঘের কাজ ঠাকুরেরই সেবা। ১৯১৩ সালের শেষের দিক হইতে বৎসর দুই কাল উদ্বোধনে থাকিবার সময় শ্রীশ্রীমা কলিকাতায় আসিলে তাঁহার নিত্য দর্শনলাভের সুযোগ ঘটিয়াছিল। কিন্তু তাঁহাকে কোন

---

১ মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসীদের সূত্রে জানা গিয়েছে স্বয়ং মাধবানন্দজীর কাছেই তাঁরা শুনেছিলেন যে, তার পরেই (১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে) উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে তিনি মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন।—**সম্পাদক**

২ এক বৃদ্ধা জগন্নাথ দর্শন করতে গিয়েছিলেন। যাওয়ার সময় সারাক্ষণ তাঁর মনে ছিল একটি দুশ্চিন্তা। বাড়িতে দেখে এসেছেন পুঁইশাকের চারাগাছটি বড় হচ্ছে। তার জন্য মাচা বানানো হয়েছে। বৌমাকে বারবার বলে এসেছেন যাতে ছাগল-গরুতে পুঁইগাছটিকে না খেয়ে ফেলে। গাছটিকে বৌমা ঠিক দেখাশুনা করছে তো, গরু-ছাগলে খেয়ে ফেলেনি তো? অবশেষে যখন তিনি মন্দিরে জগন্নাথ-বিগ্রহকে দর্শন করছেন তখন বিগ্রহের জায়গায় দেখছেন জগন্নাথের বেদি জুড়ে পুঁইমাচা!—**সম্পাদক**

কিছু জিজ্ঞাসা করিবার কথা মনে উঠে নাই। তাঁহার চরণতলে বাস করিতেছি, ইহা ভাবিয়াই তৃপ্তিবোধ করিতাম।

তাঁহার শেষ দর্শন লাভ করি জয়রামবাটীতে ১৯১৮ সালে। কি উদ্বোধনে কি অন্যত্র, অনেক ছোটখাট ব্যাপারের মধ্য দিয়া তাঁহার সহজ অকৃত্রিম মাতৃস্নেহ ও অহেতুক করুণার নিদর্শন পাইয়া ধন্য হইয়াছি। ইহাতে আমাদের গুণপনা কিছু নাই, ইহা তাঁহারই জগজ্জননীসুলভ মাহাত্ম্য। পরে যখন ভক্তগণরচিত তাঁহার স্মৃতিকথা পাঠ করি, তখন এক-একবার মনে হইয়াছে, মাকে ঐরূপ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে হয়তো ভাল হইত। কিন্তু তাঁহারই উক্তি হইতে আমরা ইহা জানিয়া আশ্বস্ত হই যে, তিনি দীক্ষাদানকালে শিষ্যের যাহা কিছু করণীয় সব করিয়া দিয়াছেন। সাধারণ গুরু হইতে এইখানেই তাঁহার পার্থক্য।

স্থূলশরীর পরিত্যাগ করিলেও শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় তিনিও সূক্ষ্মশরীরে বিদ্যমান রহিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আরব্ধ জীবোদ্ধারকার্য সম্পূর্ণ করিবার জন্যই তিনি পতির অদর্শনের পর অত দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্বেচ্ছায় মায়াবন্ধন গ্রহণ করিয়া ধরাধামে অবস্থান করিয়াছিলেন। ধর্মজগতের ইতিহাসে তাঁহার তুলনা মিলে না। শিবশক্তির এই অপূর্ব লীলা অনুধ্যান করিবার সুযোগ পাইয়া আমরা সকলেই ধন্য হইয়াছি। মহাপুরুষগণের দেহবিয়োগে তাঁহাদের আধ্যাত্মিক শক্তি আরও ব্যাপকভাবে কার্য করিতে থাকে। জগতের সকল নরনারী তাঁহার দিব্যজীবন ও উপদেশামৃত আস্বাদন করিয়া অমরত্ব লাভ করুক, ইহাই তাঁহার চরণে প্রার্থনা।* □

সংগ্রহ : স্বামী চেতনানন্দ

---

* উদ্বোধন : শ্রীশ্রীমা-শতবর্ষ-জয়ন্তী সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬১ (পুনর্মুদ্রিত : উদ্বোধন, ৯৮তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ ১৪০৩, পৃঃ ১৯১)

শ্রীশ্রীমায়ের কথা

স্বামী নির্বাণানন্দ

১৯১২ সালে কাশী সেবাশ্রমে ব্রহ্মচারী হিসাবে আমি যোগদান করি। তখন মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ), মহাপুরুষ মহারাজ (স্বামী শিবানন্দ), হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ), মাস্টার মশাই (শ্রীম) ওখানে রয়েছেন। শ্রীশ্রীমাও তখন ওখানে ছিলেন—'লক্ষ্মীনিবাসে'। সেই সময়ে মাকে একদিন পালকি করে সেবাশ্রমে নিয়ে আসা হলো। সঙ্গে স্বামী শান্তানন্দ ও চারুবাবু (পরে স্বামী শুভানন্দ) ছিলেন। মা একটা চেয়ারে বসলেন। একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "মা, কেমন দেখলেন?" মা বললেন ঃ "দেখলুম ঠাকুরই বিরাজ করছেন। রোগীদের সাক্ষাৎ নারায়ণজ্ঞানে সেবা করে ছেলেরা তাঁরই সেবা করছে।" মা একথা বলার পর আমাদের ভিতর আরও প্রেরণা এল। সেবাশ্রমে তখন সাধু-ব্রহ্মচারীর সংখ্যা কম। ইন্ডোর-এর রোগীদের সেবার ভার আমার ওপর দেওয়া হয়েছিল। নারায়ণজ্ঞানে সেবা বাস্তব ক্ষেত্রে বড় কঠিন। বছর দুয়েক সেবাশ্রমে ছিলাম। খুব চেষ্টা করেছিলাম নারায়ণজ্ঞানে রোগীদের সেবা করতে। শ্রীশ্রীমায়ের কথার জোর, মহারাজের উৎসাহ, হরি মহারাজের প্রেরণা—এইসবের জন্যই তা করতে পেরেছিলাম।

কাশীতে, বাগবাজারে এবং বেলুড় মঠে মহারাজ শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করছেন—এই দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য আমার বহুবার হয়েছে। দেখতাম মহারাজ মায়ের সামনে গেলে কেমন যেন হয়ে যেতেন—ভাবে বিহ্বল। স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারতেন না, পা টলত, শরীর থরথর করে কাঁপত। কোনরকমে প্রণাম করেই উঠে আসতেন। অনেক সময় কাশীতে এবং মায়ের বাড়ীতে প্রণাম করার জন্য ওপরে উঠতেই পারতেন না, নিচে থেকেই দাঁড়িয়ে যুক্তকর মাথায় তুলে উদ্দেশে

প্রণাম জানাতেন। বাবুরাম মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ প্রমুখকেও মাকে প্রণাম করতে দেখেছি। তাঁদেরও প্রায় ঐরকমই অবস্থা, তবে অতটা নয়।

ব্রহ্মচর্যের পর (১৯১৪ খ্রীঃ) শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ নিতে উদ্বোধন-এ গিয়েছি। তখন মায়ের ঘরের সামনে এখনকার মতো বড় বারান্দা ছিল না। সিঁড়ি দিয়ে উঠে কেবল একফালি চওড়া বারান্দা। নিচের উঠোনটি তখন বড় ছিল। মাকে প্রণাম করতে তিনি একটু ভজন শোনাতে বললেন। নিচের উঠোনে শতরঞ্চি পেতে বেশ কয়েকটি ভজন গাইলাম। মা খুশি হয়ে প্রসাদ পাঠিয়ে দিলেন। মঠে ফেরার সময়ে মাকে প্রণাম করতে গেলে মা মাথায় হাত দিয়ে খুব আশীর্বাদ করলেন।

১৯১৫ সালের মার্চ-এপ্রিল হবে। আমি তখন মহারাজের সেবায় বেলুড় মঠে রয়েছি। দেখতাম, আমার বয়সী অনেক সাধু-ব্রহ্মচারী মহারাজের অনুমতি নিয়ে তপস্যায় যেতেন। হিমালয় বা অন্য কোথাও বছর খানেকের জন্য তপস্যা করে আসতেন। আমিও একদিন মহারাজের কাছে গিয়ে তপস্যার অনুমতি চাইলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন : "তুই তাহলে এখানে কী করছিস? এই যে সেবা করছিস, এ তপস্যার চেয়ে ঢের বেশি হচ্ছে। তোর আর কোথাও যাবার প্রয়োজন নেই।" কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি যখন বারবার পীড়াপীড়ি করতে লাগলাম, তখন তিনি আমায় মহাপুরুষ মহারাজের কাছ থেকে অনুমতি নিতে বললেন। মহাপুরুষ মহারাজ আমার কথা শুনেই বললেন : "তুই কি পাগল হয়েছিস? আর কোথায় যাবি তপস্যা করতে? এই যে মহারাজের সেবা করছিস, এতেই সব জানবি।" আমি তবুও জোর করতে লাগলাম। তখন তিনি বললেন : "আচ্ছা, বাবুরাম মহারাজের (স্বামী প্রেমানন্দ) কাছে যা। তিনি অনুমতি দিলে তবেই যাবি।" বাবুরাম মহারাজের কাছে গেলাম। আমার নিবেদন শুনে তিনিও একই উত্তর দিলেন। তবে আরও জোরের সঙ্গে। বললেন : "তুই কি সত্যি সত্যিই পাগল হলি, সূয্যি? দেখছিস

না, ঠাকুর রয়েছেন মহারাজের ভিতরে? আর কোথাও গেলে কি তুই ভগবানের মানসপুত্রের সাক্ষাৎ সান্নিধ্য পাবি?" কিন্তু আমি তবুও জেদাজেদি করতে থাকলে তিনি বললেন : "ঠিক আছে। উদ্বোধন-এ মা আছেন। মা যদি অনুমতি দেন, যাবি। প্রথমে কালীঘাটে গিয়ে মা-কালীকে পুজো দিবি। তারপর মায়ের কাছে যাবি আশীর্বাদের জন্য। জানবি, কালীঘাটে যিনি আছেন আর বাগবাজারে (উদ্বোধন-এ) যিনি আছেন, তাঁরা এক।"

কালীঘাট-মন্দিরে প্রণাম করে উদ্বোধন-এ পৌঁছালাম। দেখলাম, মায়ের দর্শনার্থীদের সারিতে আমিই শেষ ব্যক্তি। দূর থেকে দেখছি, মা মুখের ওপর ঘোমটা টেনে বসে আছেন আর যে-ই প্রণাম করছে তাকেই আশীর্বাদ করছেন। অবশেষে আমার পালা এল। অন্য সব ভক্ত তখন চলে গেছে। পায়ে মাথা দিয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে যখন উঠে দাঁড়ালাম তখন দেখি মা ঘোমটা সম্পূর্ণ খুলে ফেলেছেন। খুব হেসে আমাকে বললেন : "এই মিষ্টিটা নাও বাবা, খাও।" নিজের হাতে আমায় মিষ্টিপ্রসাদ দিলেন। মাকে মঠের সব খবর দিলাম। শেষকালে আমার প্রার্থনার কথা জানালাম। সব শুনে মা বললেন : "বাইরে গিয়ে কঠোরতা করা ঠাকুর পছন্দ করতেন না, বাবা। তাছাড়া মঠ ছেড়ে, রাখালকে ছেড়ে তুমি কোথায় তপস্যা করতে যাবে? রাখালের সেবা করছ—তাতেই কি সব হচ্ছে না?" কিন্তু আমি বাচ্চাছেলের মতো তাঁর অনুমতি আর আশীর্বাদের জন্য আবদার করতে লাগলাম। আমাকে নাছোড় দেখে শেষে মা বললেন : "আচ্ছা, তুমি তপস্যায় যেতে পার—কাশীতে যেতে পার। তবে আমাকে একটা কথা দিতে হবে। ইচ্ছে করে অনর্থক কঠোরতা করবে না। যদি পথে অযাচিতভাবে কোন সাহায্য পাও তা নেবে। কাশীতে তপস্যা করার সময়েও যদি তোমাকে কেউ কিছু দেয়, তাও নেবে। সেবাশ্রমে থাকবে, আর খুব ইচ্ছে হলে বাইরে মাধুকরী করে খেতে পার। কাশীবাসও হবে, আর তপস্যাও হবে।" আমি মাকে ~~কথা দিলাম। তবে তাঁর~~ অনুমতি চাইলাম পদব্রজে কাশী যাওয়ার।

মা অনুমতি দিলেন, তবে পায়ে হেঁটে যাওয়ার কথাটা যে তাঁর মনঃপূত হয়নি তাও বুঝলাম। তারপর মাকে প্রণাম করে তাঁর অজস্র আশীর্বাদ নিয়ে খুশিমনে মঠে ফিরলাম। মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, বাবুরাম মহারাজকে সব বললাম।

মাস পাঁচ-ছয় পর ছোট্ট একটা ঝুলি নিয়ে একদিন শেষরাত্রে গঙ্গাস্নান করে কাশীর উদ্দেশে মঠ থেকে বেরলাম। একগাছা লাঠি এক হাতে, আরেক হাতে একটা কমণ্ডলু। তখন ব্রহ্মচারী, তাই সাদা কাপড়। একটা কাপড়কে কেটে অর্ধেক পরেছি, অর্ধেক গায়ে দিয়েছি। একা একা গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। ভাদ্র মাস, হাঁটতে হাঁটতে বুঝলাম পায়ে হেঁটে যাওয়া মায়ের ইচ্ছা নয়। পথে খুব অসুস্থ ও দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। দু-দিন প্রায় কিছুই পেটে পড়েনি। মাঝে মাঝে মায়ের প্রতি অভিমান হচ্ছে। তৃতীয় দিন সকালে পথে একটা বড় আমগাছের তলায় ক্লান্ত হয়ে শুয়ে আছি। মনে মনে বলছি, মা তুমি আশীর্বাদ করলে, তার ফল কি এই? খানিক বাদে ঐ গাছের তলায় একটা মোটরগাড়ি এসে দাঁড়াল। সেই গাড়ি থেকে একটা পরিবার নামলেন। তাঁরা ঐ গাছের ছাওয়ায় বসে খাওয়া-দাওয়া করবেন। আমি শুয়েই আছি। কে কি তা দেখার মতো মন বা ইচ্ছাও নেই। হঠাৎ এক পরিচিত পুরুষকণ্ঠের আওয়াজ ঃ "সূর্যি মহারাজ না? কি ব্যাপার, এখানে?" তাকিয়ে দেখি মঠের এক পরিচিত ভক্ত। কাশী যাচ্ছি শুনে বললেন ঃ "চলুন আমাদের গাড়িতে। আমরা মধুপুর যাব। যতখানি সম্ভব এগিয়ে দেব।" আমি বললাম ঃ "ধন্যবাদ, কিন্তু আমি যে পদব্রজে যাব সঙ্কল্প করেছি।" তখন ভদ্রলোক তাঁদের সঙ্গে আনা খাবার থেকে আমাকে পরটা, ফল, মিষ্টি দিয়ে আগে খাওয়ালেন। কমণ্ডলুতে জল ভরে দিলেন। খেলাম, কিন্তু তাঁদের অনেক অনুরোধেও গাড়িতে উঠলাম না বা পয়সা নিলাম না। কিছুক্ষণ পর খাওয়া-দাওয়া করে ওঁরা চলে গেলেন। আবার আমার যাত্রা শুরু হলো। হাঁটছি তো হাঁটছি। খালি পায়ে হাঁটার জন্য পায়ে ফোস্কা পড়ে গিয়েছে, গায়ে ব্যথা। দিনে কষ্ট

হয় বলে রাত্রেই বেশি হাঁটি। এভাবে আরও তিনটে দিন গেল। এই তিনদিন কয়েকটা পেয়ারা ছাড়া পেটে আর কিছু পড়েনি। মনে হলো ঐ ভদ্রলোকরা তাঁদের সঙ্গে গাড়িতে করে আমাকে এগিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি তা শুনিনি। মা আমাকে বলেছিলেন ঃ "ইচ্ছা করে অনর্থক কঠোরতা করবে না।" ভক্তটির কথা না শুনে মায়ের কথার অবাধ্য হয়েছি, তাই বোধহয় এই কষ্ট। ভিক্ষে চাইতে গেলে লোকের উপহাসের পাত্র হয়েছি। সাদা কাপড়ে ব্রহ্মচারীর পোশাকও হয়তো ভিক্ষা না পাওয়ার একটা কারণ। যাইহোক প্রতিদিন মাইল বিশেক করে হাঁটতাম। এভাবে যাত্রার সপ্তম দিন সন্ধ্যায় বাংলা-বিহার বর্ডারে একটা গ্রামে গিয়ে পৌঁছালাম। জায়গাটা হাজারিবাগ জেলার একটি গ্রাম।

গ্রামটির নাম বীরপুর (?)। খোঁজাখুঁজির পর একটা শিবমন্দিরের সন্ধান পেলাম। সেখানেই রাতের মতো আশ্রয় নিলাম। প্রচণ্ড মশা। বুঝলাম, রাত্রে সেখানে থাকা অসম্ভব হবে। বসে বসে মশা তাড়াচ্ছি। আবার মায়ের আশীর্বাদের খেলা দেখলাম। প্রায় রাত্রি নটার সময়ে মন্দিরের পূজারী এলেন। আমাকে খুঁটিয়ে দেখলেন। বয়সে যুবক। আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। তারপর পূজায় বসলেন। পূজা শেষ হলে আমাকে বললেন ঃ "মেরে সাথ ঘরমে চলিয়ে। য়হাঁ রাতমে ভালূ ঔর জানোয়ার ভি আতা হ্যায়।" আমি "না" বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু মায়ের কথা মনে পড়ল—"ইচ্ছে করে কঠোরতা করবে না"। কাজেই বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁর সঙ্গ নিলাম। পূজারীর সঙ্গে তাঁদের বাড়িতে গেলাম। বেশ সম্পন্ন পরিবার। পূজারীর বিধবা বৃদ্ধা মা আমাকে দেখে খুব খুশি হলেন। জপ-আহ্নিক করার জন্য তাঁদের ঠাকুরঘরে আমাকে বৃদ্ধা নিয়ে গেলেন। ঠাকুরঘরে গিয়ে আমি তো চমকে উঠলাম। দেখি, দেবদেবীদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিও রয়েছে। অভিভূত হয়ে গেলাম। চোখে জল এসে গেছে নিজের অজান্তেই। বাংলা-বিহার সীমান্তে এই অজ পাড়াগাঁয়ে কিভাবে তিনি এলেন? মনে যে কী আনন্দ আর বিশ্বাস এল তা কি বলব!

বৃদ্ধার স্নেহে যত্নে তিনরাত্রি ওখানে আটকে থাকলাম। খিচুড়ি, মালপোয়া, কত কি নিজের হাতে বানিয়ে তিনি খাওয়ালেন আমাকে। পায়ের ফোস্কায় মলম লাগালেন। পায়ের মুচকে যাওয়া ব্যথায় চুন-হলুদ দিলেন। তিনদিন পরে মনে হলো, আমি বেশ সুস্থ হয়েছি। এবার আবার হাঁটা শুরু করতে পারি। কিন্তু সেই বৃদ্ধা বললেন : "না বাবা, তুমি এখনো দুর্বল। একা এতটা পথ হেঁটে কাশীতে গিয়ে তুমি আর তপস্যা করতে পারবে না। এই তোমার ট্রেনের টিকিট। তুমি ট্রেনে যাবে।" মায়ের কথা মনে পড়ল, কাজেই এবারও "না" বলতে পারলাম না। তাঁরা আমাকে কাছাকাছি একটা স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে তুলে দিলেন।

বৃদ্ধা এবং তাঁর ছেলের কাছে তাঁদের ঠাকুরঘরের ছবিটির ইতিহাস শুনেছিলাম। ছেলেটি একবার কাশী বেড়াতে যান। সেখানে একটা হোমিওপ্যাথি ওষুধের দোকানে ক্যালেন্ডারে ঠাকুরের ছবিটা দেখে চেয়ে নিয়ে আসেন। মনে হয় এম. (মহেশ) ভট্টাচার্যের দোকান থেকে। দোকানেই জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলেন ছবিটি শ্রীরামকৃষ্ণের : "রামকিসেন (রামকৃষ্ণ)—কোঈ বাঙ্গালী অবতার হোঙ্গে"। মা ও ছেলে দুজনেই বললেন : "লেকিন এ ফোটো ঘরমে লে আনেকে বাদ সব কুছ অচ্ছা চল রহা হ্যায় (কিন্তু এই ফোটোটি ঘরে আনার পর থেকে সংসারে সবকিছু ভালভাবে চলছে)।" ফোটোটি তিনি কেন দোকান থেকে চেয়েছিলেন জিজ্ঞাসা করায় তাঁর ছেলে বললেন : "রামকৃষ্ণের চোখদুটিতে যেন একটা যাদু আছে। এই চোখদুটি আমাকে বড় টানছিল। তাই ক্যালেন্ডারটি চেয়েছিলাম। পরে ফ্রেমে বাঁধিয়ে নিই।"

যাইহোক, ট্রেনে কাশী পৌঁছালাম। বৃদ্ধা এবং তাঁর ছেলে আমাকে আরও কয়েকটা দিন ওঁদের বাড়িতে রাখতে চেয়েছিলেন। শেষে অনেক করে বলে ওঁদের রাজি করিয়েছিলাম এবং চারদিনের দিন ওঁদের একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিদায় নিলাম। কাশী পৌঁছানো পর্যন্ত

আর কোন অসুবিধা হয়নি। দেখলাম মঠ থেকে বেরুনোর পর মা আমার সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন।

মা বলেছিলেন ঃ "সেবাশ্রমে থাকবে, আর খুব ইচ্ছে হলে বাইরে মাধুকরী করে খেতে পার।" কিন্তু তপস্যার প্রবল প্রেরণায় আমি ঠিক করলাম—যে-কটা দিন তপস্যা করব, বাইরেই থাকব। সেবাশ্রমে থাকলে বাসস্থানের নিশ্চিন্ততায় তপস্যার ক্ষতি হবে। সুতরাং বাইরে থাকব এবং ভিক্ষা করেই খাব। গঙ্গার কাছে একটা পুরনো বাগানবাড়িতে জায়গাও পেলাম এবং সত্যি সত্যিই কেবল ভিক্ষার ওপর নির্ভর করে ধ্যান-জপ-তপস্যায় দিন কাটাতে লাগলাম। যেখানে থাকতাম সে-জায়গাটা মোটেই স্বাস্থ্যকর ছিল না। নানারকম পোকামাকড় ও মশার উপদ্রবে অতিষ্ঠ হতে হতো। বুঝলাম, কেন মা সেবাশ্রমে থাকতে এবং "খুব ইচ্ছে হলে" মাধুকরী করে খেতে পারি বলেছিলেন। উত্তর ভারতের মাধুকরীর ডাল-রুটি আমার সহ্য হলো না। শীঘ্রই খুব দুর্বল বোধ করতে লাগলাম। মনে হলো, মনের উৎসাহ যেন কমে আসছে। মনে উদ্দীপনা আনার জন্য পূজ্যপাদ লাটু মহারাজের (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) কাছে গেলাম। তিনি তখন সেখানে গঙ্গার কাছে একটা ঘাটে থাকতেন। আমাকে দেখে তিনি পরম স্নেহে বললেন ঃ "সূয্যি, তোমার কি হয়েছে? এত দুর্বল দেখাচ্ছে? আমার মনে হচ্ছে, ভিক্ষা তোমার সহ্য হচ্ছে না। ঠিক আছে। এই দু-টাকা তুমি রাখ—মাস্টারমশাই আমাকে প্রতিমাসে পাঠান দুধ খাবার জন্য। এই টাকা দুটো নাও। এ দিয়ে আজ থেকে প্রতিদিন একটু দুধ খাবে।" কিন্তু তিনি নিজেই তো অত্যন্ত কৃচ্ছ্রতা করে থাকতেন। খুব খারাপ লাগছিল তাঁর কাছ থেকে টাকা নিতে। কিন্তু আবার মায়ের কথা মনে পড়ল—"ইচ্ছে করে কঠোরতা করবে না"। কাজেই নিতে বাধ্য হলাম। চোখে জল এসে গেল তাঁর ভালবাসা দেখে।

আমার শরীর সারল না। আরও খারাপ হলো। আমাশা দেখা দিল। ভিক্ষা করে খাওয়ার জন্য আমাশা বেড়েই চলল। একদিন

অবস্থা খুব খারাপ হলো। সেই বাগানবাড়িতে একা একা পড়ে আছি, পেটে কিছুই দিতে পারিনি—বারবার পায়খানা হচ্ছে। হঠাৎ শব্দ পেলাম, কারা যেন এসেছে। আমার ঘরের মধ্যে ঢুকলেন বাগানবাড়ির মালিক। তিনি একজন মহিলা। কয়েক বছর পরে সেদিনই এসেছেন বাগানবাড়িটা দেখতে। আমাকে সে-অবস্থাতে দেখেই তিনি সব বুঝে ফেললেন। হয়তো বাড়ির দেখাশোনা করে যে-লোকটি, তার কাছ থেকেও আমার কথা কিছু শুনেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমার জন্য ভাল ঘরের ব্যবস্থা করতে বললেন। আর বললেন—ভাত, তরকারি, দুধ প্রভৃতি যেমন পথ্য আমার দরকার, সেরকম ব্যবস্থা করতে। এবারও আমি বারণ করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু মায়ের কথা মনে করে সব মেনে নিতে হলো। মনে হলো, মা-ই যেন নিজে ওঁর মাধ্যমে এসে আমার আহার ও বাসস্থানের সব ব্যবস্থা করে দিয়ে গেলেন।

কয়েক দিনের মধ্যেই আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম। ততদিনে বুঝতে পেরেছি, তপস্যা করবার বদলে আমি এখন অন্যের সেবা নিচ্ছি। মায়ের নির্দেশ স্মরণ করে সেবাশ্রমে গিয়ে উঠলাম। এইভাবে মাস ছয়-সাত কেটে গেল। আমার সামান্য জিনিসপত্র যা ছিল গুটিয়ে নিয়ে কয়েক দিনের মধ্যেই মঠে ফিরে এলাম। বাবার মতো উৎকণ্ঠা নিয়ে মহারাজ আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমি তাঁর পায়ে গিয়ে পড়লাম। মঠ ছেড়ে তপস্যা করবার বাসনার সেই ইতি।

মঠে ফিরে এসে আবার মহারাজের সেবায় নিযুক্ত হলাম। মহাপুরুষ মহারাজ, বাবুরাম মহারাজও আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের সে যে কী স্নেহ তা বলে বোঝানো যাবে না! মা তখন দেশে। আমার সব খবর দিয়ে মঠ থেকে মাকে চিঠি দিলাম। তপস্যার সাধ মিটেছে এবং মঠে সুস্থ দেহে ফিরেছি জেনে খুশি হয়ে মা আশীর্বাদী পত্র দিয়েছিলেন। তাতে লিখেছিলেন : "তপস্যা তো খুব করে এলে বাবা, এবার প্রাণ ঢেলে রাখালের সেবায় লেগে

যাও। রাখালের সেবা করলেই তোমার সব হবে। তার চেয়ে বড় তপস্যা আর কিছু নেই জানবে।" সেবার দেশ থেকে মা ফিরলে উদ্বোধন-এ গিয়ে মায়ের চরণ দর্শন করে আসি। মা খুব আশীর্বাদ করেছিলেন। সেবার দুর্গাপূজায় মা মঠে এসেছিলেন এবং পূজার কয়দিন মঠেই ছিলেন। পূজার সময় খুব ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু "জ্যান্ত দুর্গা"র উপস্থিতিতে পূজা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছিল।

একবার আমার কালীঘাটে গিয়ে মা-কালীকে দর্শন করার ইচ্ছা হয়েছিল। বাবুরাম মহারাজকে সেকথা বলতে বললেন : "উদ্বোধন-এ মায়ের সঙ্গে দেখা করে যা, তিনিই সাক্ষাৎ মা-কালী। সেখান হয়ে তবে কালীঘাটে যাবি।" বাগবাজারে মায়ের বাড়ী গিয়ে মাকে প্রণাম করে বাবুরাম মহারাজের কথাটি মাকে বললাম। শুনে মা অল্প একটু হাসলেন। মায়ের সেই হাসির মধ্যে আমি যে কী দেখলাম তা এখনো চোখে ভাসে। সে যে কী দিব্য রূপ তা বুঝিয়ে বলতে পারব না! তারপর মা বললেন : "বাবুরাম ঠিকই বলেছে বাবা।"* □

সংগ্রহ : স্বামী প্রভাকরানন্দ।

---

* বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে স্বামী নির্বাণানন্দের একটি স্মৃতিকথা প্রকাশিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও বর্তমান স্মৃতিকথাটি প্রকাশের কারণ, একসময়ে পূজ্যপাদ স্বামী নির্বাণানন্দজীর অন্যতম সেবক স্বামী প্রভাকরানন্দ সংগৃহীত এই স্মৃতিকথাটিতে অনেক অতিরিক্ত তথ্য রয়েছে।—সম্পাদক

শ্রীশ্রীমায়ের চরণপ্রান্তে

প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা

'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'র দ্বিতীয় ভাগে এবং স্বামী চেতনানন্দ সঙ্কলিত 'মাতৃদর্শন'-এ প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণার দুটি মাতৃস্মৃতি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই দুটি স্মৃতিকথা যথাক্রমে শ্রীমতী সরলাবালা দেবী এবং শ্রীভারতী (সরলা দেবী) লিখিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণার পূর্বাশ্রমের নাম ছিল পারুল। সিস্টার নিবেদিতার সহকারিণী সুধীরা বসু তাঁর নাম বদলে রেখেছিলেন 'সরলা'। স্বামী সারদানন্দ তাঁকে গৈরিক দান করে নাম দিয়েছিলেন 'শ্রীভারতী'।

পরবর্তী কালে সরলা দেবী সারদা মঠের প্রথম অধ্যক্ষা হন এবং বেলুড় মঠের তদানীন্তন অধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দ তাঁকে যথারীতি বিরজা হোম পূর্বক সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করেন। সন্ন্যাসের পর তাঁর নাম হয় প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা। পূর্ব-উল্লিখিত দুটি স্মৃতি-নিবন্ধ ছাড়া সারদা মঠ প্রকাশিত ও প্রব্রাজিকা নির্ভয়প্রাণা সম্পাদিত 'ভারতীপ্রাণা স্মৃতিকথা' গ্রন্থে (১ম সং, ১৯৮৮) তাঁর একটি 'আত্মস্মৃতি' সঙ্কলিত হয়েছে। সেখানে শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি যা বলেছেন তাতে পূর্ব-প্রকাশিত স্মৃতি-নিবন্ধ দুটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি এমন কিছু উপাদান রয়েছে। এখানে সেই অতিরিক্ত অংশগুলি উক্ত গ্রন্থ থেকে সঙ্কলন করে উপস্থাপন করা হলো।—সম্পাদক

১৯০২ সালে সিস্টার নিবেদিতার স্কুলে ভর্তি হই। স্কুল তখন ১৭ বোসপাড়া লেনে। সিস্টারের স্কুলে স্বামীজী প্রায়ই আসতেন, কিন্তু আমরা তখন খুবই ছোট[1], তাই বেশি কিছু মনে নেই। শুধু খুব লম্বা-চওড়া চেহারা আর বড় বড় চোখ-দুটি বেশ মনে আছে। ঐ বছর বোধহয় ঠাকুরের তিথিপূজার দিন সিস্টার আমাদের দশ-বারজন ছোট মেয়েকে নিয়ে নৌকায় করে বেলুড় মঠে গিয়েছিলেন। আমরা সব্বাই স্বামীজীকে প্রণাম করি—এসব কথা খুবই অস্পষ্ট মনে আছে।

---

১ প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণার জন্ম ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে।—সম্পাদক

তখন স্কুলে সন্ধ্যার পর শরৎ মহারাজ এসে মেয়েদের কাছে গীতাপাঠ করতেন। শরৎ মহারাজের মুখে তখন লম্বা দাড়ি। পুরস্ত্রীদের দালানে চিকের আড়ালে বসবার ব্যবস্থা ছিল। আমরা ছোটরা উঠানে বসতুম, সিস্টার আমাদের কাছে বসতেন। সবাইকে ঘোড়ার গাড়ি করে সিস্টার নিয়ে আসতেন। সিঁড়ির গায়ে ছোট জায়গাটিতে শরৎ মহারাজ বসে পাঠ করতেন। আমরা তো ঘুমিয়ে পড়তুম, সিস্টার কোলে করে আবার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যেতেন।

যোগীন-মা, গোলাপ-মাকেও প্রায়ই স্কুলে দেখতে পেতুম। তাঁরা প্রায় রোজই বলরাম-মন্দিরে আসতেন আর ফেরার পথে সিস্টারকে দেখে যেতেন। সিস্টার সাষ্টাঙ্গে তাঁদের প্রণাম করতেন, তাঁরাও চিবুক ধরে সিস্টারকে আদর করতেন আর জিজ্ঞেস করতেন : "নিবেদিতা, তুমি কেমন আছ?"

একদিন সিস্টার আমাদের ক'জনকে নিয়ে শ্রীশ্রীমার কাছে গেলেন, সেই প্রথম মাকে দেখি। তিনি তখন বাগবাজার স্ট্রীটের ভাড়াবাড়িতে। আমরা প্রণাম করে বাইরে দাঁড়াই, সিস্টার মার কাছে বসে কথা কইতে লাগলেন। তারপর প্রসাদ নিয়ে ফিরে আসা।

১৯০৯ সালে মা উদ্বোধন-বাড়িতে আসেন, তখন সিস্টার একদিন মাকে স্কুলে নিয়ে এসেছিলেন। সেদিন সিস্টারকে কী আনন্দিতই না দেখেছিলুম! ছোট বালিকাটির মতো চারদিকে ছুটোছুটি করে স্কুলবাড়ি সাজিয়েছিলেন।

তখন মাঝে মাঝে আমাদের মার কাছে নিয়ে যেতেন। আমরা তখন কিছুই জানতুম না বা বুঝতুম না। তবু সিস্টারের সঙ্গে ঘোরা, মার কাছে যাওয়া এসব খুব ভাল লাগত।

স্কুলের ওপর ভীষণ টান হয়েছিল। স্কুল ছেড়ে বাড়ি যেতে ইচ্ছে করত না। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে টান যেন বাড়তে লাগল। যখন সুধীরা-দি এলেন তখন আমরা একটু ওপরের ক্লাসে। তিনি আমাদের খুব ভালবাসতেন। আমাদেরও তাঁর ওপর অদ্ভুত ভালবাসা পড়েছিল। সকলের মধ্যে ধর্মভাব জাগিয়ে দেবার চেষ্টাটা সুধীরা-দির খুব ছিল।

আমার বাড়ির নাম ছিল পারুল। সুধীরা-দি নাম বদলে 'সরলা' রাখলেন। মাঝে মাঝে সুধীরা-দি আমাকে শ্রীশ্রীমার কাছে নিয়ে যেতেন।

সেই বছর পুজোর ছুটিতে ১৯১১ সালের ১৩ অক্টোবর সিস্টার নিবেদিতা মারা যান। সুধীরা-দির ভীষণ লেগেছিল। তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

পূজনীয় স্বামী প্রজ্ঞানন্দ তখন উদ্বোধনে। একদিন আমাকে বললেন : "শ্রীশ্রীমাকে একদিন দেখে এসো।" তিনিই সব ব্যবস্থা করে দিলেন। ডাক্তার দুর্গাপদবাবুর স্ত্রী মাকে দেখতে যাবেন, তাঁকে বলে দিলেন তিনি যেন যাবার পথে তাঁদের গাড়িতে আমাকে তুলে নিয়ে যান। আমি তাঁদের সঙ্গে উদ্বোধনে গেলুম। কিন্তু সেদিন মার বলরাম-মন্দিরে নিমন্ত্রণ ছিল। তিনি যখন ফিরলেন তখনই আবার আমরা বাড়ি ফিরব, তাই কথাবার্তা কিছুই হলো না। মা-ও দুঃখ করে বলতে লাগলেন : "তাই তো মা, তুমি এলে আর বসে দুটি কথা কইতে পেলুম না।" খুব সস্নেহ আশীর্বাদ করলেন।

সেবার বেলুড় মঠে পুজোয় পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ মাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সুধীরা-দি পুজোর পর পুরী যাবেন ঠিক করলেন। পুজোর ক'দিন মার সঙ্গে মঠে ছিলেন, একাদশীর দিন ফিরে এসে ত্রয়োদশীর দিন পুরী রওনা হন।

স্বামী প্রজ্ঞানন্দ একদিন এসে বললেন : "মহাষ্টমীর দিন বেলুড় মঠে গিয়ে মাকে একবার নিশ্চয়ই প্রণাম করে এসো।" আমার ভাগ্য মন্দ। মনে মনে ঠিক করেছিলাম ঝিয়ের সঙ্গে যাব, কিন্তু তার সেদিন ভীষণ হাঁপানি হয়েছে। যাওয়া না হতে হাপুস নয়নে কাঁদছি—সেইদিনটি কেবল কেঁদেই কাটিয়েছিলুম। মহাষ্টমীর দিন মাকে দর্শন করতে পেলুম না! মনে বড্ড লেগেছিল। রাত্রে কিন্তু খুব সুন্দর স্বপ্ন দেখলাম, যেন মঠে গিয়েছি আর মাকে প্রণাম করছি।

পুজোর পরই কিন্তু আশাতীত আনন্দের সুযোগ এসে গেল। শ্রীমা কাশীতে গেছেন আর সুধীরা-দির তখনো ছুটি ছিল, উনি

আমাকে নিয়ে কাশী গেলেন ; সঙ্গে নরেশ-দি, প্রফুল্ল-মাসীমা আর বাণী ছিল। শ্রীমা লক্ষ্মী দত্তের বাড়িতে ছিলেন। আমরা রামাপুরার কাছে একটা বাড়িতে। সকাল-বিকাল মার কাছে যাওয়া হতো। কালীপুজোর সময় মা কাশী ছিলেন, আমরা জগদ্ধাত্রী-পুজোর পর গিয়েছিলুম। ওরা সব ঘুরে ঘুরে বেড়াত, আমি বেশিরভাগ সময় মার কাছে থাকতাম। ওর মধ্যে মার জন্মতিথি পড়েছিল। পৌষের শেষে আমরা কলকাতা ফিরলুম।

[জয়রামবাটী থেকে শেষবার উদ্বোধনে] শ্রীমা আসার দু-চার দিন পরেই শরৎ মহারাজ আমাকে মায়ের সেবার জন্য ডেকে পাঠালেন। শ্রীমার সেবার জন্য সেই ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি উদ্বোধনে চলে গেলুম। এরপরের শ্রাবণ মাসে শ্রীমার শরীর যায়। দিনের পর দিন মায়ের শরীর খারাপের দিকে যেতে দেখে খুব কষ্ট হতো, কান্না পেত। একদিন মাকে খুব কেঁদে বলেছিলুম ঃ "আপনি চলে গেলে কিছুতেই থাকতে পারব না।" মা বললেন ঃ "যাবেই তো মা, আমার কাছেই তো যাবে। তবে আমার কিছু কাজ আছে তা করে তারপর যাবে।"

শ্রীমার সঙ্গে তখন রাধু, তার ছেলে, নলিনী, ছোটমামী—এরা সব এসেছিল। ন্যাড়া[২] মারা গেছে, তার স্মৃতি মনে পড়ে মার কষ্ট হবে বলে মাকু ও নলিনী কিছুতেই উদ্বোধনে থাকতে চাইল না। তাদের বলরামবাবুর বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা হলো।

মার তখন রোজই জ্বর আসছে। পরে ঐ জ্বর কালাজ্বরে দাঁড়িয়ে গেল। আমি মাকে খাওয়ানো, তাঁর বিছানাপত্র করা, নিয়মিত ওষুধ দেওয়া ইত্যাদি সেবা করতুম। নবাসনের বৌ-ও সাহায্য করত। শরৎ মহারাজ বড় বড় ডাক্তার এনে দেখালেন। কত রকম চিকিৎসা, কত শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি করা হলো। শ্মশান-স্বস্ত্যয়ন, জপযজ্ঞ আদি

২ মাকু-দির শিশুপুত্র। মা তাকে খুব স্নেহ করতেন।—সম্পাদক

সবই করা গেল, কিন্তু মা দিন দিন আরও দুর্বল, আরও রোগা হয়ে যেতে লাগলেন। মুখে খুবই অরুচি, কিছুই খেতে পারেন না। আষাঢ় মাস থেকে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। এত শরীর খারাপ, তবু তখন একদিন আমার হাতের দিকে তাকিয়ে বললেন : "সুধীরা কি সরু সরু তিনগাছা চুড়ি করে দিয়েছে! ভাল লাগছে না। আমি ভাল হয়ে তোমার হাতে চারগাছা করে মোটা চুড়ি গড়িয়ে দেব।" আমি বললুম : "সে সব হবে মা, আপনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুন, তবেই আমাদের আনন্দ।"

কলঘরে যেতেন। একদিন বলছেন : "যদি একটা ছোট লাঠি পেতুম তাইতে ভর দিয়ে বেশ চলতুম।" পরদিন দেখা গেল ঘরের কোণে কে একখানি ছোট লাঠি রেখে গেছে, বেশ মাপমতো। সেই লাঠিখানা নিয়ে মা কলঘরে যেতেন।

জ্বর আরও বাড়তে লাগল। দিনের মধ্যে দু-তিনবার কেঁপে জ্বর আসত। শরীর একেবারে দুর্বল, একদিন নিজেই বলছেন : "এখন থেকে দেখছি আমাকে ঘরেই সব করতে হবে, আর উঠতে পারছি না। ঠাকুরকে এ-ঘর থেকে অন্যত্র নিয়ে যাও। আর খাটখানা সরিয়ে ফেলে আমাকে মেঝেতে বিছানা করে দাও।"

ঠাকুরকে তিনতলায় নিয়ে যাওয়া হলো। মায়ের তখন শরীরে খুব জ্বালা। সুধীরা-দির ব্যবস্থামতো নিবেদিতা স্কুল থেকে পালা করে মেয়েরা এসে মাকে বাতাস করত। বাণী, গীতা, কনক, শিবা এরা—পালা করে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত, আর রাত্রিবেলা প্রফুল্ল-মাসীমা ও চপলা-দি আসত। তারাও সারারাত পালা করে মাকে বাতাস করত। ঐ সময় প্রফুল্ল-মাসীমাকে কুমিল্লায় কাজের জন্য যেতে হয়েছিল।

শ্রীমা তখন রাধু, মাকু বা তাদের ছেলেদের কাছে আসতে দিতেন না। রাধুর কথায় কেবলই বলতেন : "ওকে দেশে পাঠিয়ে দাও।" আমি একদিন বললুম : "পাঠিয়ে দাও, পাঠিয়ে দাও বলছেন। রাধুকে ছেড়ে কি আপনি থাকতে পারবেন?" খুব জোরের সঙ্গে বলে উঠলেন :

"খুব পারব, মায়া কাটিয়ে দিয়েছি।" আমি কোন সময় রাধু-মাকুর ছেলেদের কাছে নিয়ে গেলে বলতেন : "সরলা, ওদের সরিয়ে নিয়ে যাও। ওদের এনেছ কেন?" একদিন শরৎ মহারাজকে ডেকে রাধু-মাকুকে দেশে পাঠিয়ে দিতে বললেন। মহারাজ বললেন : "মা, আপনার এই অসুখের সময় ওদের পাঠিয়ে দিলে ওদের মনে খুব কষ্ট হবে। আর কিছুদিন দেখি।" মা শুধু বললেন : "পাঠিয়ে দিলে ভাল করতে, আর কিছু নয়।" ওরা শেষ পর্যন্ত উদ্বোধনে ছিল, কিন্তু মায়ের ঘরে আর যেত না।

তখন মায়ের কবিরাজী চিকিৎসা চলছে। তাঁর রান্না সব কাঠের জ্বালে হতো। মার মুখে তো কোনও রুচি ছিল না, পোস্ত রোজ একটু খেতেন, আমরুল শাক পছন্দ করতেন। বেলুড় মঠ থেকে রোজ আমরুল শাক আনা হতো। সামান্য কটি ভাত খেতেন। কবিরাজ বলেছিলেন মায়ের যা মুখে ভাল লাগে তাই খেতে পারেন। দুধটা যত বেশি খান, ততই ভাল। যতটা দুধ তাতে ততটা জল মেশাতে হবে। তারপর কাঠের জ্বালে জল সব মরে যাবে। সেই দুধটা মাকে খাওয়ানো হতো। হাত-পা ফুলছিল বলে রান্নায় নুন দেওয়া নিষেধ ছিল। একটু সৈন্ধব লবণ উনুনের ওপর নেড়ে গুঁড়ো করে শিশিতে রেখে, খাওয়ার সময় একটু মিশিয়ে দেওয়া হতো। বিছানার ওপর বালিশ উঁচু করে, তাতে হেলান দিয়ে বসিয়ে কোলের ওপর একখানা তোয়ালে দেওয়া হতো। আমি মাটিতে থালা রেখে একটু একটু করে খাইয়ে দিতুম। কখনো বা মা একটি ছোট বাটি করে নিজের হাতে তুলে খেতেন। কিন্তু দুর্বল বলে তা বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারতেন না।

আমি মাকে দুধ খাওয়াতুম আর থার্মোমিটারও দিতুম। মাঝে মাঝে দুধ কিছুতেই খেতে চাইতেন না। আমি "তবে মহারাজকে ডাকি" বলাতে ছেলেমানুষের মতো চুপ করে খেয়ে নিতেন। রাত এগারটায় শেষ দুধ খেতেন। একদিন রাত্রে দুধ খাওয়াতে গেছি। মা বেঁকে বসলেন : "আমি দুধ খাব না।" কিছুতেই খাবেন না দেখে আমি

বললুম : "তবে কি মা মহারাজকে ডাকব?" মা বললেন : "ডাক তোর মহারাজকে, আমি খাব না।" তখন সবাই শুয়ে পড়েছেন। মহারাজ তাঁর ঘরের এক পাশে মাটিতে বিছানায় শুয়ে আছেন। আমি আর তাঁকে ডাকলুম না। কিন্তু মায়ের ঘরে ঢুকতেই মা বলছেন : "কি, ডাকলি না?" তখন আমি আবার যাই। মহারাজের মাথার কাছে গিয়ে একটু খস খস শব্দ করতে তিনি ধড়মড় করে উঠে বসেছেন। আমার কাছে সব শুনে তিনি উঠে এসে মায়ের মাথার কাছটিতে দাঁড়ালেন। মায়ের ঘরের মধ্যে প্রদীপ জ্বলছিল। বাইরে একটি হ্যারিকেন। মা বলছেন : "কি শরৎ এল?"

আমি—"হ্যাঁ মা, ঐ তো আপনার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন।"

মা—"কৈ? এস বাবা, কাছে এসো, বোসো" বলে নিজের খুব কাছটিতে বসতে বললেন। "দেখ তো বাবা, এত রাতে তোমাকে ডেকে তুলে কষ্ট দিলে!"

মহারাজ মায়ের গায়ে মাথায় কিছুক্ষণ হাত বুলিয়ে দেবার পর খুব আস্তে আস্তে বললেন : "মা, এবার একটু খাবেন?" মা, 'খাব' বলাতে বললেন : "সরলা তবে খাইয়ে দিক একটু?"

মা—"না, ও খাওয়াবে না। ও খালি রাতদিন বলবে, 'মা খাও' 'মা খাও' আর বগলে কাঠি দাও। ঐ দুটোই শিখেছে। আমি ওর হাতে খাব না, তুমি আমাকে খাইয়ে দাও।"

মহারাজের হাতদুটো তখন ঠক ঠক করে কাঁপছে, খাওয়াবেন কি! খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন। আমি তখন ঠিক করেছি, যাই হোক, আমি খাওয়াবো না। মা যখন বলছেন মহারাজই খাওয়াবেন। মা মহারাজের সামনে আমাকে এরকম বলাতে আমার মনে খুব দুঃখ হয়, মুখে যদিও হাসি ছিল। আমি হ্যারিকেনটা কাছে এনে ফিডিং কাপে দুধ ঢেলে দিলুম। মহারাজ একটু একটু করে মায়ের মুখে ঢেলে দিতে লাগলেন। তারপর বলছেন : "মা, একটু জিরিয়ে খান।"

মা—"দেখ দিকিনি কি সুন্দর কথা! 'মা একটু জিরিয়ে খান।' এই কথাটি আর ওরা বলতে জানে না!"

মায়ের খাওয়া হলে মহারাজ মায়ের বিছানা ঠিক করে আস্তে আস্তে মশারি ফেলে গুঁজে দিয়ে বললেন : "তবে মা আমি আসি?"

মা—"এসো বাবা, এসো। আহা, বাছার আমার কত কষ্ট হলো! ও-ই তো ডেকে আনলে। এস বাবা, দুর্গা! দুর্গা!"

আগে মা মহারাজের সামনে একগলা ঘোমটা দিতেন, কখনো সামনে কথা বলতেন না। মহারাজের মনে এজন্য দুঃখ ছিল, উনি হেসে বলতেন : "আমি যেন বেটির শ্বশুর!" তখনকার দিনে বৌরা শ্বশুরকে মুখ দেখাত না, ঘোমটা দিয়ে থাকত। তাই মহারাজ বলতেন : "মা আমার মনের ঐ ক্ষোভটুকু মুছে দেবার জন্য আমার হাতে এভাবে সেবা নিলেন।"

পরদিন আমি মহারাজকে বললুম : "মা মনে হচ্ছে আমার ওপর একটু বিরক্ত হয়েছেন। আমি আর ওঁকে দুধ খাওয়াব না বা থার্মোমিটার দেব না। আড়াল থেকে সব গুছিয়ে দেব।"

মহারাজ—"ভাত তো তোমাকেই খাওয়াতে হবে?"

আমি—"হ্যাঁ, ভাত আমি খাওয়াব। আর সব করব। শুধু দুধ খাওয়ানো আর থার্মোমিটার দেওয়াটা অন্যরা কেউ করুক।"

সেই দিনটা ঐভাবে গেল। মা কিন্তু সব লক্ষ্য করলেন। পরদিন সকালে আমি মায়ের অন্য সব কাজ করে দিয়ে নবাসনের বৌকে বললুম : "কাপড়গুলো বড় ময়লা হয়েছে। আমি বোর্ডিং বাড়ি[৩] এগুলো দিয়ে আসি, ফিরে এসে মাকে ভাত খাওয়াবো।" এদিকে আমি চলে যাবার পরই মা নবাসনের বৌকে জিগ্যেস করেছেন : "সরলা কোথায় গেল?"

আমি বোর্ডিংয়ে গেছি শুনে বলেছেন : "সরলা কি আমার ওপর রাগ করে চলে গেল?"

---

৩ ভগিনী নিবেদিতার স্কুল।—সম্পাদক

বৌ—"না মা। সরলা-দি রাগ করবে কেন? সে তো কাপড় দিতে গেছে, ফিরে এসে আপনাকে ভাত খাওয়াবে বলেছে।"

মা—"না, সে আমার ওপর রাগ করে চলে গেছে।"

আমি যেতেই বৌ আমাকে সব বললে। মায়ের ঘরে ঢুকতেই মা আমাকে কাছে ডেকে বলছেন: "তুমি মা, আমার ওপর রাগ করেছ?" "রাগ করব কেন মা" বলতেই বলছেন: "তবে কেন আমাকে দুধ খাওয়াচ্ছ না? বগলে কাঠি লাগাচ্ছ না? আমি মা, অসুখে ভুগে ভুগে কেমন হয়ে গেছি, কখন কি বলে ফেলি ঠিক নেই। আমার কথায় রাগ করো না, মা"—বলে উনি আমার মাথাটা বুকের উপর নিয়ে আদর করছেন। আমি তখন খুব কাঁদছি।

মা যে আর বেশিদিন নেই সেটা আমরা সকলেই বুঝতে পেরেছিলুম। গোলাপ-মা, যোগীন-মা চোখের জল ফেলেন আর বলেন: "শান্তি স্বস্ত্যয়ন সবই তো করা গেল মা, কোনও ত্রুটিই তো রইল না, কিন্তু কিছুই হলো না।" চিন্তা করে করে গোলাপ-মার হার্টের অসুখ বেড়ে গেল। মা একদিন মহারাজকে কাছে ডেকে বললেন: "শরৎ, গোলাপ, যোগীন আর এরা সব রইল, এদের দেখো।"

শেষের দিকে একদিন হরিপ্রেম মহারাজ (স্বামী হরিপ্রেমানন্দ) মায়ের জন্য জয়রামবাটীর নতুন কুয়োর জল এনেছেন। সেই জল মার মুখে একটু দেওয়া হলো। হরিপ্রেম মহারাজ বললেন: "মা, কিশোরী-দা আপনার ঘরের মেঝে সব সিমেন্ট করে দিয়েছেন। এরপর আপনি দেশে গেলে আর কোনও কষ্ট হবে না।"

মা বললেন: "কেন কিশোরী (স্বামী পরমেশ্বরানন্দ) মাটি তুলে সিমেন্ট করতে গেল? মাটিই ভাল। এসব করবার কি দরকার ছিল? কিশোরী কি মনে করেছে আমি আর সেখানে যাব? আমার যাওয়া হবে না।"

শরীর যাবার আগের দিন সকাল থেকেই মায়ের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। আমার আবার তার আগের দিন পেট খুব খারাপ হওয়াতে শরীর এত দুর্বল যে নড়বার শক্তি নেই। মহারাজ আমাকে তাঁর

ঘরে বসেই মাছের ঝোলভাত খেয়ে নিতে বললেন। এদিকে মার শ্বাসকষ্ট এত বাড়ছে যে তাঁর সে কষ্ট যেন চোখে দেখা যায় না। একতলা থেকে তিনতলা—সারাবাড়ি সেই শব্দ শোনা যাচ্ছে। চোখদুটি যেন বেরিয়ে আসছে। মা তো কোনও বাছ-বিচার করেননি। যত পাপী-তাপীকে বুকে নিয়েছেন বলে তাঁর এই কষ্ট! সাধু-ভক্তে বাড়ি ভরে গেল। সারারাত্রি আমি আর সুধীরা-দি মায়ের পায়ের কাছটিতে বসেছিলুম। যোগীন-মা আমাকে একঘটি জলে মায়ের পায়ের বুড়ো আঙুল দুটি ডুবিয়ে চরণামৃত করে নিতে বললেন। শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে মায়ের মুখে ফোঁটা ফোঁটা গঙ্গাজল দিতে লাগলুম। ধীরে ধীরে শব্দ কমে আসতে লাগল, ক্রমে সব শান্ত। তখন রাত একটা বেজে গেছে। সেদিন চৌঠা শ্রাবণ (১৩২৭)।

যে মায়ের মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছিল না, এখন সেই মায়ের রূপ আর ধরছে না—একেবারে দুর্গা-প্রতিমার মতো!

মাকে সরু লালপেড়ে গরদের কাপড় পরিয়ে দেওয়া হলো। পরদিন বেলা এগারটায় মায়ের খাট মাথায় করে কাশীপুর হয়ে বরানগর কুঠিঘাট অবধি নিয়ে আসা হলো। আমাকে গোলাপ-মা, যোগীন-মা সঙ্গে যেতে বারণ করেছিলেন : "আর কী দেখতে যাবে?" সুধীরা-দি জোর করে আমার হাত ধরে বের করে নিয়ে এলেন। তখন খুব ভগবানের নাম, হরি-সঙ্কীর্তন হচ্ছে। আমার তখন কিছুই মনে হচ্ছিল না। ওদের সঙ্গে সঙ্গে কুঠিঘাট পর্যন্ত গেলুম। সেখান থেকে মহারাজেরা ও ভক্তেরা মাকে নিয়ে একটা বড় নৌকায় উঠলেন। আমরা মেয়েরা পাশে পাশে একটা ছোট নৌকায়। বেলা দুটোয় বেলুড়ের ঘাটে পৌঁছে মাকে আমতলায় নিয়ে যাওয়া হলো। তারপর সেখানে পূজা ও ভোগ নিবেদন। পরে গঙ্গার ঘাটে মাকে স্নান করানো হবে। কাপড় দিয়ে আড়াল করা হলো। আমি আর সুধীরা-দি মায়ের শরীর তুলে নিয়ে গঙ্গার জলে রেখে তাঁকে স্নান করালুম। ইদানীং অসহ্য গায়ের জ্বালায় মা প্রায়ই বলতেন : "গঙ্গায় নিয়ে চল, গঙ্গায়

নিয়ে চল।" তখন মায়ের শরীর যে কী হালকা ও নরম লাগছিল! ঐ কাপড়খানা বদল করে তাঁকে আর-একটা নতুন সরু লালপেড়ে গরদ পরানো হলো। এবার সাধুরা তাঁকে আবার আমতলায় নিয়ে গেলেন। সেখানে দ্বিতীয়বার মাকে আরতি করা হয়। আমি সব দেখলুম, মনে কিছুই হলো না। তারপর যেখানে বর্তমানে মায়ের মন্দির সেখানে চিতা সাজানো হলো। আমি আর সে দৃশ্য দেখতে পারছি না, কী দেখব? সুধীরা-দির পিছনটিতে শুয়ে পড়লুম। চন্দনকাঠের চিতায় মাকে শুইয়ে দিয়ে শরৎ মহারাজ ও অন্যসব মহারাজরা বেলপাতা, ধুনো ও গুগগুল প্রদক্ষিণ করে করে আহুতি দিতে লাগলেন। প্রবোধ-দি জোর করে আমার হাত ধরে টেনে তুলে বললেন : "একবার দেখ না কী সুন্দর দেখাচ্ছে!" দেখলুম আগুনের শিখা আকাশ ছুঁয়ে কত উঁচুতে উঠেছে। তখন তো এখনকার মতো ট্রাম-বাসের অত সুবিধা ছিল না, তাই খুব বেশি ভিড় হয়নি। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। ওপারে তখন বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু এপারে বৃষ্টি নেই।

মায়ের শরীরের কিছুই চোখে পড়ল না, কি জানি কী দেখব ভেবে এতক্ষণ চোখ তুলে তাকাইনি। এখন আমরাও প্রদক্ষিণ করে তিনবার আহুতি দিলুম।

ফিরে আসার পর সেদিন সুধীরা-দি আমাকে বোর্ডিংয়ে নিয়ে এলেন। সেখানেই রইলুম। দু-তিনদিন আর উদ্বোধনে যাইনি, মন সরছিল না। ফাঁকা বাড়ি, কী দেখতে যাব? যোগীন-মা ডেকে পাঠালেন। মায়ের ঘর তখনও খালি পড়ে ছিল। সেদিকে আর তাকানো গেল না, কেবলই চোখ ফেটে জল আসছে। যোগীন-মা কাঁদছেন আর বলছেন : "তোরাও যদি না আসবি, আমরা কি করে থাকব? মা চলে গেলেন, সব শূন্য লাগছে।"

নলিনী-দি, মাকু সব পরদিনই জয়রামবাটী চলে যাবে শুনলুম। ওরা কাঁদতে লাগল, বললে : "সরলা-দি আমরা চলে যাচ্ছি, আবার

কবে দেখা হবে কে জানে!” মহারাজের সঙ্গে সেদিন আর দেখা হলো না। তারপর মাঝে মাঝে যেতুম। তের দিনের দিন ভাণ্ডারা হলো। বেলুড় মঠে ভাণ্ডারা হলো ছেলেদের জন্য, আর উদ্বোধনে হলো মেয়েদের জন্য। শরৎ মহারাজ এদিকে (উদ্বোধনে) ভার নিয়ে আছেন। সেদিনই মায়ের ঘরে তাঁর ছবি বসানো হলো যে-ছবিখানা এখনো আছে। ওখানা এতদিন মা থাকতে দেওয়ালে টাঙানো ছিল।[৪] রাসবিহারী মহারাজ ওটি নামিয়ে বললেন : “মায়ের এই ছবিখানাই বসানো হোক।” শরৎ মহারাজ কোন আপত্তি করলেন না। বললেন : “রাসবিহারী মায়ের অনেক সেবা করেছে, ও যখন আবদার ধরেছে, বেশ তো, ওখানাই বসানো হবে।” সেদিন থেকেই মায়ের নিত্য ভোগ রাগ ও পুজো শুরু হয়। ঐদিন চণ্ডীর গান হয়েছিল, আর ভক্তদের ভাল করে প্রসাদ দেওয়াও হয়। □

---

৪ কিছুদিন আগে ছবিটির ফ্রেমটি বিশেষ কারণে খুলতে হয়েছিল। তখন দেখেছিলাম ছবিটির পিছনে লেখা রয়েছে—‘১৯১০’। অর্থাৎ ছবিটির প্রিন্ট ১৯১০ খ্রীস্টাব্দের।—সম্পাদক

মাতৃসান্নিধ্যের স্মৃতিসৌরভ

স্বামী রাঘবানন্দ

আমি কলকাতায় ইডেন হোস্টেলে থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তাম। ঐ সময় নির্মলকুমার বসু (পরবর্তী কালে স্বামী মাধবানন্দ) এবং অনুকূল সান্যালও সেই কলেজের ছাত্র ছিলেন, তাঁরাও ঐ হোস্টেলে থাকতেন। আমাদের তিনজনের মধ্যে বেশ সৌহার্দ ছিল। আমি ওপরের শ্রেণীতে পড়তাম। আমিই তখন ছিলাম ঐ হোস্টেলের মনিটার। আমি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' পড়ে পরমহংসদেবের অভিনব জীবন-সাধনা, শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হই। আমার পরামর্শে উক্ত দুই বন্ধুও 'কথামৃত' পড়েন ও পরম আনন্দ লাভ করেন। তারপর আমরা তিনজন প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ঐ গ্রন্থ পাঠ ও ঠাকুরের বিষয়ে আলোচনা করতাম। ঐ সময় আমি একদিন কথামৃতকার শ্রীম-র (মাস্টার মহাশয়ের) দর্শনলাভ করি। তিনি আমাকে বিশেষ স্নেহ প্রদর্শন করেন ও আধ্যাত্মিক জীবনযাপনে উৎসাহ দেন। শ্রীম-র সপ্রেম সঙ্গ, উদ্দীপনাপূর্ণ প্রসঙ্গ ও জ্ঞান-ভক্তি-স্নাত বিশুদ্ধ জীবন আমাকে মোহিত করে। তার ফলে আমি মাস্টার মহাশয়ের কাছে ঘন ঘন যাতায়াত শুরু করি এবং ঐ বন্ধুদেরও তাঁর কাছে মাঝে মাঝে নিয়ে যেতে থাকি। তার ফলে তাঁরাও শ্রীম-র অনুরাগী হয়ে ওঠেন। মাস্টার মহাশয়ের উপদেশে আমি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশিষ্ট ত্যাগিপার্ষদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ (রাখাল মহারাজ), স্বামী প্রেমানন্দ (বাবুরাম মহারাজ), স্বামী তুরীয়ানন্দ (হরি মহারাজ) প্রমুখের সঙ্গেও ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ হই। তাঁরাও আমাকে যথেষ্ট স্নেহ-সমাদর করেন ও উৎসাহ দেন।

আমি একদিন কথাপ্রসঙ্গে মাস্টার মহাশয়ের কাছে শ্রীমা সারদাদেবীর কথা শুনি। ঐ সংবাদ আমি আমার বন্ধুদেরও জানাই। তিনি আমাদের

বলেন ঃ "পরমহংসদেবের সহধর্মিণী জীবিত আছেন। বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটী গ্রামে নিজ পিত্রালয়ে তিনি থাকেন এবং অনুরাগী ভক্তদের দীক্ষাও দেন।" সেখানে কিভাবে যেতে হয়, তাও তিনি বলেন।

ঐ সংবাদ শুনে আমরা খুব আনন্দিত হই এবং শ্রীমাকে দর্শন করার জন্য আমাদের আগ্রহ জাগে। তারপর কলেজে ছুটি পড়ে। ঐ ছুটিতে নির্মল বোলপুরে যান তাঁর মা-বাবার কাছে। সেসময় তাঁদের কুলগুরু ভট্টাচার্য মহাশয় একদিন বাড়িতে আসেন। নির্মল গুরুদেবকে প্রণাম করে কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর বলেন ঃ "শুনেছি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহধর্মিণী জীবিত আছেন এবং ভক্তদের দীক্ষাও দেন। আমি তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণের বাসনা করেছি। আপনি যদি অনুগ্রহ করে অনুমতি দেন ও আশীর্বাদ করেন, তাহলে আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়।"

নির্মলের কথা শুনে গুরুদেব আহ্লাদিত হন এবং সানন্দে তাঁকে ঐ বিষয়ে অনুমতি দেন ও অভীষ্টসিদ্ধির জন্য আশীর্বাদ করেন। নির্মল তাঁকে বলেন ঃ "পরমহংসদেবের জীবনী ও 'কথামৃত' প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর বিষয়ে নানা প্রবন্ধ-নিবন্ধও ছাপা হচ্ছে। এর ফলে তাঁর মহিমা জানা যাচ্ছে। কিন্তু তাঁর সহধর্মিণীর সম্বন্ধে তো কিছুই জানতে পারিনি। এজন্য আমার মন কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত। এবিষয়ে আপনার উপদেশ ও অভিমত কি? অনুগ্রহ করে বলুন।"

তার উত্তরে ভট্টাচার্য মহাশয় বলেন ঃ "দেখ বাবা, তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র। কলকাতায় থাক। সেখানে কত বড় বড় জ্ঞানি-গুণী ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা করছ। আর আমি একজন গেঁয়ো লোক। আমি পণ্ডিতও নই। তবে একথা সহজেই বুঝি, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যদি ঈশ্বরের অবতার হন অথবা ভগবৎ-প্রেরিত বিশিষ্ট মহাত্মা হন কিংবা উচ্চকোটির সাধকপুরুষ হন, তাহলে তাঁর সহধর্মিণী কি কখনো সাধারণ হতে পারেন? জানবে, সেই সতী-সাধ্বী ব্রাহ্মণী পরমহংসদেবের সাধন-সিদ্ধির পূর্ণ

অধিকারিণী। এবিষয়ে আমার কোন সংশয় নেই এবং তোমারও কোন সংশয় থাকা উচিত নয়।"

শ্রীমায়ের বিষয়ে একজন গ্রাম্য ব্রাহ্মণের এই সহজ উদার ও সুস্পষ্ট অভিমত শুনে নির্মল চমৎকৃত হন ও ভক্তিভরে পুনরায় তাঁর পাদবন্দনা করেন। নির্মল হোস্টেলে ফিরে এলে তাঁর কাছে ঐ প্রসঙ্গ শুনি। তাঁর কথাগুলি আমাদের অন্তরে উজ্জ্বল আলোক-সম্পাত করে ও নিরন্তর আন্দোলিত হতে থাকে। কত শীঘ্র শ্রীমাকে দর্শন করব সেজন্য আমি ও অনুকূল ব্যাকুল হয়ে উঠি।

একদিন আমরা তিন বন্ধু মাস্টার মহাশয়ের পত্র ও আশীর্বাদ নিয়ে মাতৃদর্শনে জয়রামবাটী গমন করি। সেখানে উপস্থিত হয়ে আমরা শ্রীমায়ের শ্রীচরণ দর্শন করে ধন্য হই। আমরা মাস্টার মহাশয়ের পরম স্নেহভাজন ও তাঁরই প্রেরণায় এসেছি জেনে শ্রীমা আমাদের বিশেষভাবে স্নেহ-সমাদর করেন। বললেন : "বাবা, তোমরা কাল সকালে স্নান করে আমার কাছে আসবে।" পরদিন আমরা তিন বন্ধু যথাসময়ে শ্রীমার নিকট উপস্থিত হই। আমরা দেখি, তিনি নিজ ঘরে পূজার্চনার উপচারসামগ্রী সাজিয়ে আসনে বসে আছেন এবং সেখানে তিনটি আসন পাতা রয়েছে। আমাদের দেখে শ্রীমা সস্নেহে বলেন : "বাবা, তোমরা ভিতরে এসে আসনে বস।" তখন নির্মল ও অনুকূল ঘরের ভিতরে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে আসনে বসেন। কিন্তু আমি দ্বারদেশে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকি। শ্রীমা আমাকে আবার ডাকেন ও ভিতরে এসে আসনে বসতে বলেন।

তখন আমি তাঁকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করি : "মা, আপনি আমাকে আসনে বসতে বলছেন কেন?" শ্রীমা বলেন : "দীক্ষা দেব।" আমি বলি : "আমি আপনার শ্রীচরণ দর্শন করতে এসেছি।"

শ্রীমা—বাবা, তুমি মন্ত্র নেবে না?

আমি—আজ্ঞে মা, নেব, রাখাল মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দের) কাছ থেকে।

শ্রীমা—রাখাল মহারাজের সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছে?

আমি—আজ্ঞে মা, তা হয়েছে।

শ্রীমা তখন বললেন ঃ "রাখাল তো আমাদেরই ছেলে। বেশ তো, তাঁর কাছ থেকেই তাহলে তুমি মন্ত্র নিও।"

নির্মল ও অনুকূলকে শ্রীমা সেদিন শুভক্ষণে দীক্ষাদান করে তাঁদের মনোরথ পূর্ণ করেন। জগদম্বার অপার অনুকম্পালাভে উভয়ে চরিতার্থ হন।[১]

পরিশেষে, আমরা তিন বন্ধু শ্রীমাকে প্রণাম করে ও তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসি। তারপর আমি একদিন পূজ্যপাদ রাখাল মহারাজের পদপ্রান্তে উপনীত হই ও তাঁকে নিজ অন্তরের আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করি। রাজা মহারাজ আমাকে দীক্ষাদানে সম্মত হন এবং তারপর এক শুভদিনে তিনি আমার অভীষ্ট পূর্ণ করেন। তার ফলে আমারও সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়।

অতঃপর আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগ দিই এবং রাখাল মহারাজের কাছ থেকেই ক্রমান্বয়ে ব্রহ্মচর্য-সংস্কার ও সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করি। নির্মলও সঙ্ঘে যোগ দেন এবং যথাসময়ে মহারাজের কাছে ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস প্রাপ্ত হন।

বেশ কিছুদিন পরে আমি একদিন গঙ্গাস্নানকালে শ্রীমার দীক্ষিত জনৈক সাধুকে বলি ঃ "মা-ঠাকরুন তোমাকে যে-মন্ত্র দিয়েছেন, আমাকে তা বল। না বললে তোমাকে গঙ্গায় চুবিয়ে মারব।"

সাধুটি আমাকে ঐ মন্ত্র বলতে চান না। তখন আমি সত্যিই তাঁকে জলে চুবানোর উপক্রম করি। তাতে সাধুটি ভয় পেয়ে যান।

---

১ স্বামী রাঘবানন্দের স্মৃতি এক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেনি। কারণ, স্বামী মাধবানন্দ পরবর্তী কালে জানিয়েছেন যে, শ্রীশ্রীমায়ের কাছে তাঁর মন্ত্রদীক্ষা লাভ হয় কলকাতায় 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'তে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের প্রেরণায় ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে। স্বামী রাঘবানন্দ এবং অনুকূল সান্যালের সঙ্গে তিনি জয়রামবাটী গিয়েছিলেন ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের শেষে। অনুকূল সান্যালের প্রকাশিত স্মৃতিকথা থেকেও বোঝা যায় যে, জয়রামবাটিতে সেবার শুধু তিনিই (অনুকূল সান্যাল) শ্রীশ্রীমায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেছিলেন। (দ্রঃ মাতৃদর্শন—স্বামী চেতনানন্দ সঙ্কলিত, ২য় সং, ১৯৯০, পৃঃ ২৫১)—সম্পাদক

অবশেষে আমি তাঁকে আশ্বস্ত করে বলি : "রামানুজ তাঁর গুরুর কাছ থেকে মহামন্ত্র পেয়ে সমষ্টির কল্যাণের জন্য উচ্চকণ্ঠে তা বারবার ঘোষণা করে শুনিয়েছিলেন। তুমি আমাকে বললে তোমার কোন অপরাধ হবে না।"

সাধুটি তবুও ঐ মন্ত্র ব্যক্ত করতে চান না। তখন আমি তাঁকে বলি : "তুমি মা-ঠাকরুনকে বলবে, আমি তোমার কাছে শুনতে চেয়েছি।" তারপর তিনি বলেন, শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করে পরদিন আমাকে জানাবেন।

শ্রীমা তখন বাগবাজারে উদ্বোধনের বাড়িতে ছিলেন। ঐ সাধুটি সেইদিনই তাঁর কাছে উপস্থিত হন ও তাঁকে প্রণাম করে এই ঘটনাটি আদ্যোপান্ত নিবেদন করেন। শ্রীমার কাছে তখন গোলাপ-মা, যোগীন-মা এবং আরও কয়েকজন স্ত্রীভক্ত বসেছিলেন। আমার ঐ কাণ্ড শুনে শ্রীমা মৃদু হাসেন এবং উপস্থিত ভক্তেরা অবাক হন। তারপর শ্রীমা গম্ভীরভাবে তাঁদের বলেন : "সীতাপতিকে (আমার পূর্বাশ্রমের নাম) সদরদ্বার দিয়ে অন্দরমহলে আসার জন্য আমি সাধাসাধি করেছিলাম। তখন সে আমার ডাকে আসেনি। এখন খিড়কি-দ্বার দিয়ে অন্তঃপুরে আসতে চাইছে।"

অবশেষে, শ্রীমা সাধুটিকে স্নেহভরে বলেন : "সীতাপতি তোমাদের দাদা হন। কাল গঙ্গায় স্নান করার সময় তাঁকে মন্ত্রটি তিনবার শুনিয়ে দেবে। তোমার কোন অপরাধ হবে না।"

পরদিন আমি গঙ্গাস্নানকালে সেই সাধুটিকে জিজ্ঞাসা করি : "মা-ঠাকরুন তোমাকে কি বলেছেন?" উত্তরে তিনি বলেন : "আপনাকে মন্ত্রটি তিনবার শুনিয়ে দিতে বলেছেন।" তারপর তিনি আমাকে ঐ মন্ত্রটি তিনবার শুনিয়ে দেন এবং গোলাপ-মা প্রভৃতিকে মা-ঠাকরুন যা বলেছিলেন, তাও বিবৃত করেন। * □

অনুলিখন : সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

---

* উদ্বোধন, ৯৬তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ ১৪০১, পৃঃ ১৭৭-১৭৮

মাতৃস্মৃতিসুধা

স্বামী বাসুদেবানন্দ

১৯১২ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল-মে (বৈশাখ) মাস নাগাদ একবার মঠে এসেছি, গঙ্গারাম মহারাজের[১] সঙ্গে দেখা। তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় কটকে ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে। তিনি বললেন : "আমি উদ্বোধনে যাচ্ছি, যাবে?" আমি আর দ্বিরুক্তি না করে তাঁর সঙ্গে চললাম। একজন মহারাজ—'বুড়োবাবা'[২]—বললেন : "গঙ্গারাম চেলা বাগিয়েছে ভাল। তবে আরেকদিন এসে মঠে প্রসাদ পেও।" আমি "যে আজ্ঞে" বলে রওনা হলাম। উদ্বোধনে এসে মায়ের দর্শন পেলাম। মাকে আমার সেই প্রথম দর্শন।

মাকে দেখলাম সর্বাঙ্গে সাদা চাদর জড়ানো। প্রণাম করলাম। তাঁর চরণ স্পর্শ করতে পারব—তাঁর পায়ের ধুলো নিতে পারব, এ ছিল আমার স্বপ্নাতীত। গঙ্গারাম মহারাজকে দিয়ে মা নিচে প্রসাদ পাঠিয়ে দিলেন। তারপর বাড়ি[৩] ফিরব বলে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। গঙ্গারাম মহারাজ ও কপিল মহারাজ[৪] সঙ্গে সঙ্গে এলেন। উভয়েই বললেন : "তোমার মহাসৌভাগ্য!" গঙ্গারাম মহারাজ সেদিন সেখানেই রইলেন দুপুরে প্রসাদ পাবার জন্য।

---

১ স্বামী গঙ্গানন্দ। স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্ত্রশিষ্য। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে সঙ্ঘে যোগ দেন। তীর্থাদি ভ্রমণ এবং তপস্যার প্রতি ছিল তাঁর প্রবল আকর্ষণ। ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দের ৬ জুন বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে তাঁর দেহত্যাগ হয়।—সম্পাদক

২ সন্ন্যাসনাম—স্বামী সচ্চিদানন্দ। পূর্বনাম দীননাথ সেন—'দীন মহারাজ' নামেও সঙ্ঘে পরিচিত ছিলেন। স্বামী সারদানন্দের কাছে তিনি সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। বয়সে তিনি শুধু যে স্বামী সারদানন্দের চেয়েও বড় ছিলেন তাই নয়, স্বামী অদ্বৈতানন্দ ভিন্ন শ্রীরামকৃষ্ণের সকল সন্ন্যাসি-শিষ্য অপেক্ষাও বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। সেজন্য রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে তিনি 'বুড়োবাবা' নামে পরিচিত ছিলেন। ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দের ২২ জুন কাশী সেবাশ্রমে ৮৬ বছর বয়সে তাঁর দেহত্যাগ হয়।—সম্পাদক

৩ কলকাতায় তাঁদের নিজেদের বাড়ি পূর্বতন আমহার্স্ট স্ট্রীট (বর্তমানে রাজা রামমোহন সরণি) এবং হ্যারিসন রোডের (বর্তমানে মহাত্মা গান্ধী রোড) সংযোগস্থলের কাছেই।—সম্পাদক

৪ স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ—সম্পাদক

তারপর অবশ্য শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী উদ্বোধনে আছেন জানলেই আমি, পরেশ[৫], নগেন[৬] মাকে দর্শন করতে যেতাম। মঠে ও বলরাম-মন্দিরে যাতায়াত করতে করতে বুড়োবাবার সঙ্গে খুব আলাপ হলো। তিনি আমাকে সাধু হবার জন্য খুব উৎসাহিত করতেন।

অন্তরঙ্গ অনুভূতির কথা কাউকে বলতে ইচ্ছে হয় না, কারণ আমি নিজেই এর কোন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে পারি না। ছেলেবেলা থেকে, মাথা খারাপ কি কী—কিছুই বুঝতে পারি না। অন্ধকার ঘরে গেলেই জ্যোতির্ময় রাধাকৃষ্ণ-মূর্তি দেখতাম। স্বপ্নে দেখেছি, মহাজ্যোতির্ময় ওঁকার—আকাশ ছেয়ে! আবার ঠিক সত্যিকারের ষাঁড়ে-চড়া হরগৌরী দিনকতক চোখ বুজলেই দেখতে পেতাম। তখন মির্জাপুর স্ট্রীটে (বর্তমানে সূর্য সেন স্ট্রীট) রিপন স্কুলে (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজিয়েট স্কুল) থার্ড ক্লাসে (বর্তমানের অষ্টম শ্রেণী) পড়ি।

মঠে যোগ দেবার আগেই একদিন স্বপ্নে দেখলাম—মঠে উৎসব হচ্ছে। একজন একটা সোনার পাতে সিঁদুরমাখানো লাল পতাকা হাতে করে এসে বললেন : "এই তোর ইষ্টমন্ত্র।" দেখি একটা মন্ত্র সেই পতাকায় লেখা। দিনকতক তাই জপ করলাম কিন্তু প্রত্যয় হলো না, ছেড়ে দিলাম। কিছুদিন বাদে মঠে এসে বাবুরাম মহারাজকে আমার দীক্ষা নেবার কথা বললাম। তিনি কৃষ্ণলাল মহারাজের (স্বামী ধীরানন্দ) সঙ্গে আমাকে উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। দীক্ষাকালে মার বাঁপাশে বসলাম। তিনি ধ্যানস্থ হলেন। অতি গম্ভীর!

---

৫ পরবর্তী কালে স্বামী অমৃতেশ্বরানন্দ। স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্ত্রশিষ্য। ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে সঙ্ঘে যোগদান করেন। পরে মঠ ও মিশনের অন্যতম সহকারী সম্পাদক হয়েছিলেন। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ২৬ মার্চ তিনি লাহোর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে দেহত্যাগ করেন।—সম্পাদক

৬ স্বামী সহজানন্দ। সঙ্ঘে যোগদানের আগে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে সঙ্ঘে যোগদান করেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর কাশী সেবাশ্রমে দেহত্যাগ করেন।—সম্পাদক

পরে বললেন : “তোমার দীক্ষা তো আগেই ঠাকুর দিয়েছেন।” আমি বললাম : “আমার স্বপ্নে ঠিক বিশ্বাস হয় না, আপনিই আবার আমাকে বলে দিন।” তিনি হেসে বললেন : “এই তোমার মন্ত্র, এবার জপ কোরো।” বলে স্বপ্নপ্রাপ্ত পূর্বমন্ত্রই উচ্চারণ করলেন। আমি তাঁর নির্দেশমত জপ করতে লাগলাম। জপের সময় আঙুল ফাঁক হচ্ছে দেখে বললেন : “আঙুল ফাঁক রাখতে নেই, জপ স্খলন হয়।” তারপর বললেন : “আমি বলাও যা, তিনি বলাও তাই।” একটু থেমে আবার বললেন : “গুরু ও ইষ্ট একই। ঐ তোমার ইষ্ট এবং উনিই আবার রামকৃষ্ণ।” আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বললাম : “মা, আমার যেন ভক্তি হয়।” মা আমার ভ্রূদ্বয়ের মাঝখানে আঙুল দিয়ে বললেন : “ঠাকুরের কৃপায় জ্ঞানচক্ষু ফুটবে, ঠাকুর তোমার এই তৃতীয় চক্ষু খুলে দেবেন, অজ্ঞান অন্ধকার দূর হবে, দেখবে কত কী অনুভূতি হবে! খুব ধৈর্য ধরে থেক।”

১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে জগদ্ধাত্রীপুজোর সময় আমরা বাঁকুড়া থেকে শ্রীশ্রীমাকে দর্শনের জন্য জয়রামবাটী যাই। এইসময় বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষের সেবাকার্য চলছে। আমরা সেখান থেকে একসঙ্গে জয়রামবাটী গিয়েছিলাম—ভবানী, বীরেন, শৈলানন্দ স্বামী, গিরিজানন্দ স্বামী, বিভূতি (ঘোষ)। মার কাছে তখন রাসবিহারী মহারাজ ছিলেন। অরূপচৈতন্যও (হেমেন্দ্র) ছিল। এই দুর্ভিক্ষের সময় মায়ের মন্ত্রশিষ্য বৈকুণ্ঠ ডাক্তার (পরবর্তী কালে স্বামী মহেশ্বরানন্দ) হঠাৎ একদিন মার কাছে গিয়ে সঙ্ঘে যোগ দিয়ে এল।...

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে আত্মারামের কৌটায় কালীপুজো ও জগদ্ধাত্রীপুজো হয়। এবার (১৯১৫) জয়রামবাটীতে জগদ্ধাত্রীপুজোর সময় মাকে জিজ্ঞাসা করলাম : “আত্মারামের কৌটায় এঁদের পুজো হয়? ‘গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্।/ সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি তৎপ্রসাদাৎ মহেশ্বরি।।’ বলে ঐ কৌটাতেই জপ সমর্পণ করি, তাতে দোষ হয় না?” মা বললেন : “তা হবে কেন? তুমি কী বেদান্ত পড়? ঠাকুরই মহেশ্বর, ঠাকুরই মহেশ্বরী। শুদ্ধসত্ত্ব যোগমায়া তাঁর

শরীর—তিনি সশক্তিক ব্রহ্ম। শিব ও শক্তি এক। ঠাকুরের অসুখের সময় একদিন দেখলাম, মা-কালী ঘাড় বেঁকিয়ে রয়েছেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'মা, অমন করে রয়েছ কেন?' বললেন, 'ওর ঐটের (গলায় ঘার) জন্য। আমারও গলায় বড় ব্যথা'।"

বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষের সময় কিছুতেই আর বৃষ্টি হয় না। বাঁকুড়ার কালো বিভূতির (ঘোষ) মারফৎ মাকে বলে পাঠানো হলো : "প্রায় দু-বছর (১৯১৫-১৯১৬) বৃষ্টি নেই, সমস্ত দেশ জ্বলে গেল; ভাল ভাল কুয়োর জল সব ফুরিয়ে আসছে। বাঁধগুলোর জলও হুহু করে কমতে আরম্ভ হয়েছে। রাস্তার দুধারে গাছগুলোয় পাতা নেই; এখন একটু ব্যবস্থা করুন!" মা শুনে গম্ভীর হয়ে বলেন : "তাই তো, ঠাকুর এ কী করলেন!" তারপর কিছুক্ষণ মৌন থেকে বললেন : "ওদের পদ্মফুল দিয়ে ঠাকুরের পুজো করতে বল, বৃষ্টি হবে'খন।" তারপর হেসে বললেন : "মা সিংহবাহিনীর কৃপায় এ-দেশটুকুতে কিন্তু অনাবৃষ্টি নেই।" বাস্তবিকই সেই মরুভূমির মধ্যে জয়রামবাটী-কামারপুকুর যেন একটা মরূদ্যান। চারপাশে কেমন সবুজ, কুয়ো জলে ভর্তি, পুকুরগুলো টলমল করছে, আমোদরেও জল সর্বদাই।

আমরা পুরুলিয়া থেকে প্রায় সহস্রাধিক পদ্ম এনে শ্রীশ্রীঠাকুরের পুজো করলাম। আর সেইসঙ্গে বাণেশ্বর শিব এনে তাঁর মাথায় জল ঢালা হতে লাগল। সকালে বহু লোক একত্রিত হয়ে দারকেশ্বর নদীর ধারে একতেশ্বর শিবের মাথায় জল দিয়ে আসতে লাগল। দুপুর অতিক্রান্ত হওয়ার কিছু পরেই আকাশে কালো কালো মেঘের আনাগোনা আরম্ভ হলো। তারপর প্রায় বিকেল সাড়ে চারটেয় প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হলো, ক্রমাগত প্রায় চার-পাঁচ ঘণ্টা; পরের দিন সকালে দেখা গেল কুয়ো, খাল, নদী, নালা, বিল সব জলপূর্ণ; মাঠে যে বিরাট বিরাট ফাটল ধরেছিল, সেগুলো সব জোড়া লেগে গেছে।

এই খবর চারপাশে ব্যাপ্ত হলো। দূর দূর থেকে, যেখানে বৃষ্টি হয়নি, লোক আসতে লাগল সেখানে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের পুজো

করবার জন্য। আমরা যথাসাধ্য সাইকেল করে গিয়ে অনেক জায়গায় ঐভাবে পুজো করতে লাগলাম। আর সেইভাবেই বৃষ্টি হতে লাগল। অনেক জায়গায় লোকেরা ঠাকুরের ছবি কিনে নিয়ে গিয়ে বামুন দিয়ে পুজো করালে এবং সেই একই ফল হলো।

একদিন জয়রামবাটীতে ললিত চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে কথাবার্তা হচ্ছে। মার এত কৃপা তবুও মদ ছাড়তে পারল না, অথচ মার প্রতি অসাধারণ ভক্তি। এইসব কথাবার্তা শুনে মা বলেছিলেন ঃ "নাটাইতে লাল নীল সুতো গোটায়। গোটাবার সময় যেমন লাল নীল সুতো ক্রমে ক্রমে জড়ায়, আবার খোলবার সময়ও সেইসব লাল নীল সুতো পর পর খুলবে। তবে দুটোতে প্রভেদ অনেক—একটায় কর্মবন্ধন জড়াচ্ছে, আরেকটায় কর্মবন্ধন খুলছে—দেখতে কিন্তু একরকম।"

উদ্বোধনে পুজোর বেদিতে অনেক ঠাকুর—মাকুর রাধাকৃষ্ণ, মার গোপাল, জগদ্ধাত্রী-কবচ, যোগেন-মার দুটি গোপাল, বাণেশ্বর, দুটি গোবর্ধন-শিলা ও ঠাকুরের পট, কপিল মহারাজের মা-কালী ইত্যাদি। কপিল মহারাজের অসুখ করায় (বৈশাখ ১৩২৫) মঠ থেকে আমাকে উদ্বোধনে পুজো করতে পাঠানো হলো, বলরাম-মন্দিরে বাবুরাম মহারাজের দেহরক্ষার (১৪ শ্রাবণ ১৩২৫) কিছুদিন পূর্বে। বাড়িতে থাকাকালীন বাণেশ্বর, শালগ্রাম, শিব, গোপালকে যেভাবে পুজো করতাম, এখানেও সেইভাবেই করতাম। মা জয়রামবাটী থেকে এলে জিজ্ঞেস করলাম ঃ "এসব ঠাকুর-দেবতা কিভাবে পুজো করব?" জিজ্ঞেস করলেন ঃ "এখন কিভাবে কর?" আমি পূর্বাশ্রমে আমার ঠাকুমার কাছে যেসব মন্ত্র শিখেছিলাম সেইগুলি বললাম। তিনি বললেন ঃ "নিজ ইষ্টবীজে সব পুজো করবে। ইষ্টই তো সব হয়ে রয়েছেন।" বলে ইষ্টবীজের সহিত এক-একটি দেবতার নাম 'নমঃ' শব্দ যোগে বসিয়ে দেখিয়ে দিতে লাগলেন। আবার বললেন ঃ "কখনো যদি অন্য দেবদেবীর পুজো করবার ইচ্ছা হয় তো ঠাকুরের মূর্তিতে করলেই চলবে। কারণ, ইষ্ট ও তিনি এক এবং তিনিই সর্বদেবদেবীস্বরূপ হয়ে আছেন।"

একদিন দ্বিজেন (স্বামী গঙ্গেশানন্দ) প্রভৃতি আমরা সকলেই চা খাওয়ার পর 'খিদে পেয়েছে', 'খিদে পেয়েছে' করছি। অর্থাৎ সকালবেলায় ঠাকুরের যে প্রসাদ বিতরণ করা হয় সেটা করতে দেরি হচ্ছে। গোলাপ-মাই বিতরণ করেন। আমি ন'টার সময় স্নান করে সাড়ে ন'টায় পুজোয় বসি। পুজো সারতে প্রায় সাড়ে দশটা হয়ে যায়। পুজোর নৈবেদ্য সাজিয়ে রেখে গোলাপ-মা স্নান করতে গঙ্গায় গেছেন, ফিরতে খুব দেরি হচ্ছে। দেরি দেখে মা ঠাকুরের নৈবেদ্য দুভাগ করে একভাগ ঠাকুরের জন্য আগে তুলে রেখে বাকিটা নিবেদন করে ছেলেদের জন্য পাঠালেন। মহাপুরুষ মহারাজ শুনে বলেছিলেন : "এ সকলে করতে পারে না, মা-ই করতে পারেন।"

একদিন উদ্বোধনে চন্দন ঘষছি, মা উত্তরদিকের দরজার ধারে দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে মুখ করে মালাজপ করতে বসছেন। কেউ নেই দেখে জিজ্ঞাসা করলাম : "মা, মাঝে মাঝে মন দুর্বল হয়ে পড়ে কেন?" তিনি শুনেই মালা রেখে বললেন : "ওদিকে নজর দিও না, কার মনে দুর্বলতা না আসে এক ঠাকুর ছাড়া? আজ পর্যন্ত এমন কোন মহাপুরুষ জন্মেছেন কি, যাঁর মনে কখনো কোন দুর্বলতা ওঠেনি? যদি শুধরোবার চেষ্টা থাকে, যদি মানুষ বুঝতে পারে যে, আমার মনে দুর্বলতা উঠেছে—তাহলে ঐ জিনিসটাই একটা মস্ত শিক্ষা; মহামায়া খুশি হয়ে তখন তাকে পথ ছেড়ে দেন। মানুষ কিছুদিন ভাল থাকলেই মনে করে 'আমার সব হয়ে গেছে', আরও উঁচুতে ওঠবার চেষ্টা ছেড়ে দেয়। কিন্তু বিবেকীর মনেও মাঝে মাঝে দুর্বলতা দিয়েই ঠাকুর স্মরণ করিয়ে দেন যে, এখনো সাধনা শেষ হয়নি, ভূত-প্রেত সব ওত পেতে চারপাশে বসে আছে, সুবিধে পেলেই ঘাড়ে চেপে বসবে। এতে হয় কি—অহঙ্কার নষ্ট হয়। যতদিন বাঁচবে সাবধানে ঠাকুরের শরণাগত হয়ে থাকবে, অহঙ্কার হলেই ঐসব হিজিবিজি মনে উপস্থিত হবে। শেষপর্যন্ত শরণাগতির ভাব নিয়ে থাকতে হয়। ঠাকুর একবার নিজের শরীরে কামের বেগ ধারণ করে দেখালেন, জীবের অহঙ্কার করবার কিছুই নেই।"

উদ্বোধনে একদিন বিকেলে ঠাকুর তুলছি—মা খাটে বসে। যোগেন-মা আমাকে জিজ্ঞেস করছেন ঃ "কেমন গা, এখানে কেমন লাগছে?" আমি বললাম ঃ "এখানকার কাজ বড় একঘেয়ে; সেইজন্য মা এখানে না থাকলে অনেকসময় বড় শুকনো বোধ হয়। এখানে শাস্ত্রটাস্ত্র পড়াবার লোক-টোক নেই।" মা বললেন ঃ "ঠাকুরের সেবা শুকনো হবে কেন? মনে বিচার করে দেখতে হয়, কেন শুকনো লাগছে? মানুষের মন এক-একটা অবস্থায় থেকে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তখন অন্য অবস্থায় গেলে ভাল লাগে না, দেহ মন ঠিক আগের মতনই চায়। তখন ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে হয়, দেখবে তিনি কেমন মন সরস করে দেন। আর সাধনার প্রথমজীবনে দিনরাত জ্ঞানচর্চা ভাল নয়, মনটা শুকিয়ে ওঠে। ঠাকুরের লীলাচর্চা করলেই দেখবে, আবার মন কেমন সরস হয়ে উঠেছে। শরৎ কেমন সুন্দর 'লীলাপ্রসঙ্গ' লিখেছে, মাস্টারের লেখা 'কথামৃত' শুনলে প্রাণ শীতল হয়ে যায়। অক্ষয়মাস্টারের 'পুঁথি' রোজ একটু করে পোড়ো। সময় করতে পারলে রোজ আমিই একটু করে শুনতাম।"

কিছুক্ষণ বাদে নিচে এসে দেখলাম, কে একখানা বাইবেল রেখে কোথায় গেছে। সেখানা খুলতেই প্রথমে চোখে পড়ল—"And the LORD shall guide thee continually, and satisfy thy soul in drought, and make fat thy bones: and thou shalt be like a watered garden, and like a spring of water, whose waters fail not."[৭]

উদ্বোধনে একদিন পুজোয় বসে বাণেশ্বর শিবকে স্নান করাবার সময় আমার হাত পিছলে পড়ে গিয়ে গড়গড় করে গড়িয়ে গেলেন। আমি আতঙ্কিত হয়ে উঠে দৌড়ে গিয়ে তাঁকে তুলে এনে যথাস্থানে গৌরীপট্টে স্থাপন করলাম। পরদিন সকালে রামকৃষ্ণপুর থেকে নীরদ মহারাজের (স্বামী অম্বিকানন্দ) মা[৮] এসে বললেন ঃ "বাবা, কাল

৭ Isaiah, 58.11

৮ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম গৃহি-পার্ষদ নবগোপাল ঘোষের স্ত্রী নিস্তারিণী ঘোষ।—সম্পাদক

তুমি মহাদেব স্নান করাবার সময় হাত থেকে ফেলে দিয়েছ?" আমি লজ্জিত হয়ে বললাম ঃ "মা, আপনি জানলেন কেমন করে?" তিনি বললেন ঃ "কাল স্বপ্নে দেখি, একটি পাঁচ বছরের ধবধবে ছেলে, মাথায় ছোট ছোট জটা, ন্যাংটো, নাচতে নাচতে এসে বলছে, 'আমায় ফেলে দিয়েছে!'" মা সামনে পা ছড়িয়ে বসে—কার সঙ্গে কথা বলছেন। কিন্তু সব শুনছেন। ভয়ে আমি তখন 'গুরু কৃপাহি কেবলম্' জপ করছি—বুকের ধকধকানি নিজেই শুনতে পাচ্ছি! মা নীরদ মহারাজের মার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ "ছোট ছেলেরা অমন কত পড়ে খেলতে গিয়ে।" তারপর হেসে বাণেশ্বরের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ "তুমি বাবা অষ্টমূর্তিতে জগৎ ছেয়ে রয়েছ, ও অতটুকু ছেলে তোমায় ধরে রাখবে কেমন করে?" আমি মনে মনে বুঝলাম ঃ "শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।" যোগেন-মা বললেন ঃ "এবার থেকে সাবধান হবে।" আমি তিনজনকেই নমস্কার করলাম। নীরদ মহারাজের মা আমাকে বললেন ঃ "[আমার অপরাধের জন্য] আমার বামুন বৃন্দাবনে চামরবীজন, চণ্ডীপাঠ করবে।"

আরেকদিন মার মিশি ফুরিয়ে গেছে। নীরদ মহারাজের মা সকালে মিশি নিয়ে হাজির। বললেন ঃ "কাল স্বপ্নে দেখি মা মিশি চাইছেন।" বাড়ির সকলকে বলতে সকলে হেসে উঠল ঃ "এত জিনিস থাকতে মা মিশি চাইছেন!" মা বললেন ঃ "হ্যাঁ-গো, আমার মিশি ফুরিয়ে গেছে।"

উদ্বোধনে আমরা একবার নিচে খুব হট্টগোল করছি। তাতে গোলাপ-মা মাকে বলছেন ঃ "তোমার ছেলেদের ওপর কোন শাসন নেই। পরমহংস মশাই ছেলেদের কেমন শাসনে রাখতেন। কারুর একচুল এদিক-ওদিক হবার জো ছিল না।" মা বললেন ঃ "কি জানি মা, আমি কারুর কিছু খারাপই দেখতে পাইনে, তা শাসন করব কি? আমি যে মা! আমি শাসন করব কি করে? আমি ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার-ঝরিষ্কার করে নিই। এরা ঠাকুরের ছেলে, শাসন করব বললেই হলো! তিনি কেমন সব ঠিক করে নেন। তাঁর

আপনভোলা ভালবাসায় সব সোজা হয়ে যায়। আমাদের প্রেমের ঠাকুর, তাঁতে কোন কঠোর, রূঢ় ভাব নেই। যখন লোকে বলে— 'আচ্ছা, এর ফল ভগবান দেবেন।', আমি কিন্তু তখন ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি— 'ঠাকুর, নির্বোধ সুবোধ সকলেরই মঙ্গল কর।' আমি ছেলেদের বলি—কাউকেও হিংসা করো না, ভগবানকেও বিচার করতে বোলো না। বরং যাতে অত্যাচারীর ভাল হয় তার সম্বন্ধে প্রার্থনা কোরো। ভগবানের বিচার নিক্তিধরা, একচুল এদিক-ওদিক হবার জো নেই। কিন্তু তাঁর দয়ারও আবার শেষ নেই।"

মার এই উপদেশটুকুর সঙ্গে তুলনা করলে বাইবেলে আমাদের পড়া কথাগুলো ছোট বলে বোধ হয়।—"Vengeance is mine; I will repay, saith the Lord." (Romans, 12.19) "Say not, I will do so to him as he hath done to me." (Proverbs, 24.29) ভগবান যীশু কিন্তু বলেছিলেন : "Father, forgive them; for they know not what they do." (St. Luke, 23.34) "For the Son of man is not come to destroy men's lives, but to save them." (Ibid., 9.56)

একবার কয়েকজন একজনের সম্বন্ধে মিথ্যাকথা প্রচার করে। মা শুনে রাসবিহারী-দাকে বললেন : "ওকে চৌবাচ্চা থেকে জল ছুঁড়ে ওদের মারতে বল, নইলে তারা দগ্ধ হয়ে যাবে!"

একজন খুব ছটফটে। মা তাকে একটু স্থির হয়ে ধ্যানজপ করতে বলেন। সে বলে : "মা, মন বসে না তো কি করব?" মা বললেন : "ধ্যান না হয় কঠিন, আমরা মেয়েমানুষ জপেতেই আমাদের সব হয়, নয় তোমরা তাই কর। একটু স্থির হয়ে বসে জপ করতে হয়। দশ-বিশ হাজার জপ রোজ করে দেখ কেমন মন আপনি নুইয়ে না আসে; যদি না আসে তখন বোলো। সাধু-সন্ন্যাসী ছাড়া ধ্যান হওয়া বড় কঠিন। তবে পুরুষমানুষ হলেই হয় না, মনে জোর চাই, বৈরাগ্য হওয়া চাই; নির্বাসনা এবং ভগবানে ভালবাসা না হলে ধ্যান হওয়া বড় কঠিন। চাররকম ধ্যানসিদ্ধ আছে—(১) যারা

জন্ম থেকেই সুকৃতি নিয়ে এসেছে, (২) যারা গুরুর শিক্ষা স্বীকার করে নানান রকমে অভ্যাস করতে করতে ধ্যানসিদ্ধ হয়েছে, (৩) আবার ঠাকুর বলতেন—'কৃপাসিদ্ধ'। গুরু কৃপা করে তাদের মনকে সংসার থেকে তুলে ধরেছেন। তাদের মনটা জলের ওপর পদ্মফুলের মতো ভাসে। এরা কৃপাসিদ্ধ। আর (৪) ঠাকুর বলতেন—'হঠাৎ সিদ্ধ'। যেমন, লোকে যেকোন কারণে হোক অপরের সম্পত্তি পেয়েছে। এদেরও পূর্বের তপস্যা আছে, কিন্তু কোন মোহে পড়ে বহুদিন ধরে প্রারব্ধ ভোগ করছিল, যেই প্রারব্ধ কেটে গেল, আর যেন রাস্তায় যেতে যেতে বহুমূল্য মানিক পড়ে পেল।

"ঠাকুর তো এবার দয়া করে লোকের মঙ্গলের জন্য কঠোর তপস্যা করে গেলেন। ছিল শুধু হাড় আর চামড়া, তার ওপর আবার লোকের পাপ নিয়ে রোগভোগ। তাঁতে ভক্তি শ্রদ্ধা বিশ্বাস করলেই, তাঁর নামজপ, তাঁর লীলাধ্যান করলেই কুণ্ডলিনী আনন্দে আপনি জেগে উঠবেন, এতটুকুও কঠোরতা করতে হবে না। কলিকাল, এখন কি আর লোকে সত্য-ত্রেতার মতো তপস্যা করতে পারে? এখন অন্নগত প্রাণ। ঠাকুরের নাম কর, দেখো তিনি খাওয়া-পরার সব ব্যবস্থা করে দেবেন। ঠাকুরের নাম করলে এবার কেউ কখনো অন্নকষ্ট পাবে না। মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা তিনি করে গেছেন। গুরু-ঈশ্বরের সাহায্য না পেলে কি কেউ আপনি বন্ধন খুলতে পারে? তাই ঠাকুর অতি কঠোর তপস্যা করে তার ফল যেসব ভক্তেরা আসবে তাদের জন্য সঞ্চয় করে রেখে গেলেন। তিনি তো কৃপা করে দরজায় দাঁড়িয়ে, এখন তুমি দরজা খুললেই হয়!"

লোকটি ভাবতে লাগল, একবার শ্রীভগবান এলেন এবং সত্যের জন্য অক্লেশে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে জীবের পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সেই ত্যাগের ফলটি রেখে গেলেন বিশ্বাসী ভক্তদের জন্য। যারাই যীশুতে বিশ্বাসী হবে, সেই মুহূর্তেই তারা শ্রীভগবানের ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে এবং পাপমুক্ত হবে। আর এবার তাঁর কঠোর তপস্যা, কৃচ্ছ্রব্রত, সাধন-ভজন

সব ভক্ত ও অনুরাগী জ্ঞানপিপাসুদের জন্য। তাঁর কথা এখনো প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বিশ্বাসী ভক্তদের সামান্য সাধন-ভজনে, 'রামকৃষ্ণ'-নাম শ্রবণে কুণ্ডলিনী আনন্দে আপনি জেগে উঠবেন। ভোর হয়েছে; ওঠো, দরজা খুলে দেখ সামনেই সূর্য দাঁড়িয়ে আছেন!

একবার আমার ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে। মাকে বললাম ঃ "এমনিই মন স্থির হয় না, তাতে আবার শরীরে অস্বস্তি থাকলে মনটা বসতেই চায় না।" মা বললেন ঃ "দেখ, মনটাকে দুভাগ করতে হয়; একটা যেন বিবেকী, আরেকটা যেন অবিবেকী—ছেলেমানুষের মতো। বিবেকী মনটা বাপ-মার মতো সর্বদা অবিবেকী মনটার পিছনে লেগে থাকবে। একটা কিছু আবোল-তাবোল করলেই তাকে শাসন করবে, গালমন্দ করবে; দেখনি, বাপ-মা যেমন দুষ্টুছেলেটাকে বকে-ঝকে। দেখবে, এইরকম কিছুদিন অভ্যাস করলেই মনটা শায়েস্তা হয়ে আসবে। কিন্তু অবিবেকী মনে যদি একটা বিষয়ে বহুদিনের অভ্যাসের ফলে দৃঢ়সংস্কার জন্মে যায়, তাহলে শত তিরস্কারেও সেটা যেতে চায় না। তখন ঐ দুর্বল মনের জন্য ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করবে, নইলে আর কোন উপায় নেই। তিনি ঈশ্বর—সব করতে পারেন; তিনি একটা ছাঁচ ভেঙে আবার নতুন ছাঁচে তৈরি করতে পারেন। ঠাকুরের ইচ্ছের কাছে দেখেছি মানুষের মনগুলো যেন কাঁচামাটির তালের মতো হয়ে যেত; আর তিনি যাকে যেমন ইচ্ছে তাকে তেমনি করে গড়ে তুলতেন।"

একদিন উদ্বোধনে শক্তিতত্ত্ব আলোচনা হচ্ছিল। একজন এসে বলল ঃ "ওসব মশাই রেখে দিন, ঠাকুরের কথা কিছু বলুন, শোনা যাক।" যোগেন-মা স্নান করে সেই সময় ঘরে ঢুকলেন। বললেন ঃ "ঠাকুরের কথা বলতে গেলেই তো শক্তিতত্ত্ব আগে ওঠে। যখন তীব্র ব্যাকুলতায় কালীঘরের খাঁড়া গলায় বসাতে গেলেন—'দেখা দিবি তো দে নয় এই গলায় দিলুম', তখন মা দপ করে আবির্ভূত হলেন... জগতের আবরণ উঠে গেল—সব চিন্ময়! শুধু মূর্তিই নয়, কোশা-কুশি পর্যন্ত।" আমি বললাম ঃ "মহাপুরুষ মহারাজ একদিন

বলেছিলেন, একদিন তিনি ও মহারাজ ঠাকুরের ঘরে বসে আছেন; ঠাকুর খাটে, তাঁরা মেঝেয়—মাদুরে। সন্ধ্যা হতেই মন্দিরে আরতির ঝাঁজ-ঘণ্টা বেজে উঠল। তাঁরা আরতি দেখবার জন্য উসখুস করতে লাগলেন। তখন দেখেন, সামনে মা-কালী। মহারাজকে বলছেন, 'তুই ব্রজের রাখাল, তোর প্রতি আমার বাৎসল্যভাব।' " যোগেন-মা বললেন : "মথুরবাবু দেখলেন, ঠাকুর নিজের ঘরের উত্তর-পূর্ব দিকের রোয়াকে পায়চারি করছেন। যখন সামনের দিকে তখন দেখছেন শিব, আর যখন পিছনে ফিরছেন তখন দেখছেন কালী—এলোচুল। 'যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ'। ভগবান যোগমায়া সমাবৃত-হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আয়ান ঘোষকে তার বোন কুটিলা খবর দিল যে, তার স্ত্রী রাধা কৃষ্ণের সঙ্গে বনে বেরিয়ে গেছে। আয়ান শুনে হাতে তলোয়ার নিয়ে দেখতে গেল, যদি সত্য হয় তো রাধাকে কেটে ফেলবে। গিয়ে দেখে রাধারানী খড়্গ-মুণ্ডধারী মার পুজো করছেন। তখন বলল, 'কই গো কুটিলে কুটিলকালা, এ যে হেরি কপালিনী।' শ্রীকৃষ্ণতে নিজের ইষ্টমূর্তি দেখে খুশি হয়ে আয়ান ফিরে এল।

"যোগমায়া-সমাবৃত রূপ এক শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া অন্য অবতারে কোন উল্লেখ নেই। চন্দ্রশেখরের বাটীতে শ্রীচৈতন্য চণ্ডীরূপ ধরলেন—

> 'ক্ষণেকে ঠাকুর গোপীনাথ কোলে করি।
> মহালক্ষ্মীভাবে উঠে খট্টার উপরি॥
> সম্মুখে বসিয়া সবে জোড়হস্ত করি।
> মোর স্তব পড় বলে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
> জননী আবেশ বুঝিলেন সর্বজনে।
> সেইরূপ পড়ে স্তুতি মহাপ্রভু শুনে॥
> কেহ পড়ে লক্ষ্মীস্তব কেহ চণ্ডীস্তুতি।
> সবে স্তুতি পড়ে যাহার যেমন মতি॥'

(শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্যলীলা, ১৮ অঃ)

"এজন্য ভক্তেরা এঁদের সাক্ষাৎ ভগবান বলেন। ঠাকুর বলেছিলেন, 'চৈতন্য ও কালী এক বোধ হলে, তবে তার জ্ঞান হয়েছে।' গোপালের মা আমাদের ঠাকুরকে গোপালরূপেই দেখতেন। নীরদ মহারাজের মার রামকৃষ্ণপুরের বাড়িতে ইষ্টদর্শন হলো—রামচন্দ্র! সাষ্টাঙ্গে নমস্কার করে পায়ের ধুলো নিলেন, মাথা তুলে দেখেন ঠাকুর! হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি বৌমা, এবার বিশ্বাস হলো?' ঠাকুরকে বাদ দিয়ে কোন দেবদেবীর চিন্তা করতে পারি না। তাঁদের চিন্তা করতে গেলেই ঠাকুরের কথা মনে পড়ে। নীরদ মহারাজের মার ঐরূপ দর্শনের আগে ছিন্নমস্তার ভাব হয়, দিনরাত হাতে মাথাটা ধরে রাখতেন। ঠাকুর যে সর্বদেবদেবীস্বরূপ। কলির জীবের পুজো নেবার জন্য সর্বদেবদেবী তাঁকে আশ্রয় করে রয়েছেন। ঠাকুর বলেছিলেন, 'বৌমার (নীরদ মহারাজের মার) ছিন্নমস্তার অংশে জন্ম।' " এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঠাকুর ও সিদ্ধেশ্বরীর চরণামৃত দুটি পৃথক পাত্রে নিয়ে মাকে একদিন দিতে গেলে তিনি বলেছিলেন ঃ "ও একই, মিশিয়ে দাও, এখুনি মেশাও, আমার সামনে মেশাও।" দুই-ই এক করে মেশানোর পর তিনি শান্ত হয়েছিলেন।

গোলাপ-মা বলতেন ঃ "কোন একটা বিপদ-আপদ বা শক্ত অবস্থা এলে মা খুব জ্ঞানীর মতো ব্যবহার করতেন। যখন ঠাকুরের অসুখের সময় তারকেশ্বরে ধরনা দিলেন, শুনতে পেলেন কতকগুলো হাঁড়িভাঙার শব্দ; অর্থাৎ দেহ যাওয়া মানে পঞ্চকোষরূপ হাঁড়ি ভেঙে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। তার মধ্যে যা ছিল তা তেমনি রইল। কেবল ভক্তদের জন্য একটা দিব্যশরীর নির্মাণ করে কিছুদিন খেলা করেন। ঐ শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের মনে হলো—কে কার স্বামী, কে কার স্ত্রী? সেই সময় একদিন মা স্বপ্ন দেখলেন, মা-কালী ঘাড় বেঁকিয়ে আছেন। মা জিজ্ঞেস করলেন, "মা, ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে কেন?" মা-কালী বললেন, 'ওর (ঠাকুরের) ঐটের (গলার ঘার) জন্য। আমারও (গলায়) বড় ব্যথা তাই।' ঠাকুর দেহ রাখলে মা কেঁদেছিলেন, 'আমার মা-কালী গো, আমায় একলা রেখে তুমি কোথায় গেলে!' "

রাসবিহারী মহারাজকে[৯] একবার মা বললেন ঃ "এ দুনিয়া স্বপ্নবৎ। ভাব, লীল-টীলা সব স্বপ্নবৎ। আমার সঙ্গে কথা বলছ—এও স্বপ্নে। একমাত্র ঠাকুরই সত্য।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ "পঞ্চকোষ ভেঙে গেলে তো তিনি ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হলেন, তাহলে 'লীলাশরীর'-এর কথা যে শোনা যায়, সেটা কি?" মা বললেন ঃ "সচ্চিদানন্দই তাঁর স্বরূপ, তবে কখনো কখনো দিব্যশরীর নির্মাণ করে তিনি ভক্তসঙ্গে লীলা করেন।" এই প্রসঙ্গে গোলাপ-মা বললেন ঃ "যে যেমন ঘরের—তাকে মা তেমনি কথা বলতেন। আমাকে (গোলাপ-মাকে) ঠাকুর বলতেন, 'শ্যাম-জ্ঞানই জ্ঞান, আর সব অজ্ঞান। জগৎ, খেলা, লীলা—সব সত্য।' "

আমি রাসবিহারী মহারাজের কাছে শুনেছি, তিনি একদিন (কাশীতে) মাকে বলেছিলেন ঃ "নির্বাণ চাই না মা, তাহলে তোমায় পাব না।" মা শুনে বললেন ঃ "বোকা ছেলে! নির্বাণই যে তাঁর স্বরূপ!"

গোলাপ-মা বললেন ঃ "ঠাকুরের দেহরক্ষার পর অস্থি রাখা নিয়ে ভক্তদের মধ্যে গোল বাধল। মা বললেন, 'দেখ গোলাপ কী কাণ্ড! অমন সোনার মানুষই চলে গেল, তার সঙ্গে খোঁজ নেই, ছাই নিয়ে ঝগড়া করছে!' "

উদ্বোধনে দেহরক্ষার কিছুদিন পূর্বে গোলাপ-মা একদিন আমাকে ডেকে বললেন ঃ "দেখ হরিহর[১০], আমার বোধ হয় দেহ আর থাকবে না; কেবলই দেখছি—একটা গৈরিকধারিণী রুদ্রাক্ষ-পরা, ত্রিশূলধরা মেয়ে আমার শরীর থেকে বেরিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আর তখন যেন দেহটা মড়ার মতো পড়ে থাকে।"

✦

মায়ের শরীররক্ষার অনেক পরের কথা। একবার মনটা বড় চঞ্চল। ধ্যান, জপ-টপ যেন সব যান্ত্রিক (mechanical) হয়ে পড়েছে, করতে হয়, সময়মাফিক করে যাচ্ছি। 'দেখি মা যদি কিছু বলেন' বলে 'মায়ের কথা' খুললাম। খুলতেই যেখানে চোখ পড়ল, দেখি লেখা—"রোজ কি কারুর ঈশ্বরদর্শন হয়? ঠাকুর বলতেন, 'ছিপ ফেললে কোনদিন পেল,

৯ শ্রীশ্রীমায়ের অন্যতম সেবক—স্বামী অরূপানন্দ।—সম্পাদক

১০ লেখকের পূর্বাশ্রমের নাম—হরিহর মুখোপাধ্যায়।—সম্পাদক

কোনদিন পেল না, তা বলে কি চেষ্টা ছাড়তে আছে?'...এত চঞ্চল হলে চলবে কেন। যা পেয়েছ তাতেই লেগে থাকো। আর কেউ তোমার থাক না থাক, আমি তো তোমার মা আছি। ঠাকুরের কথা মনে নেই?—যারা তাঁর আশ্রয় নিয়েছে, তাদের কাছে তিনি প্রকাশ হবেনই, অন্ততঃপক্ষে শেষের দিন তিনি নিজে এসে সকলকে নিয়ে যাবেন।"

গদাধর আশ্রম। একজন ভক্ত একদিন প্রশ্ন করল ঃ "মা কি এখনো আপনাকে উপদেশ করেন?" আমি ঘাড় নেড়ে বললাম ঃ "করেন।"

"কিন্তু এখন তো তিনি স্থূলশরীরে নেই?"

"স্থূলশরীরে যেসব উপদেশ, সেসব তো বইতে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু এখন যে-উপদেশ করেন তা অনেকটা প্রতীকোপদেশ—symbolic spiritual Instructions. প্রতীকটার আচ্ছাদন ভেঙে ফেললেই একটা মস্ত সত্য তা থেকে আত্মপ্রকাশ করে।"

"সে কেমন?"

"যখন চাটগাঁ থেকে কলকাতায় বোমা পড়া আরম্ভ হলো, কলকাতায় জিনিসপত্র খুব আক্রা বা পাওয়াই যায় না। মাঝে মাঝে কলের জল পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। মনে হতে লাগল, কি করে আশ্রম চলবে? তার ওপর এই পুরনো বাড়ি (গদাধর আশ্রম)! স্বপ্নে দেখি শ্রীশ্রীমা—গণেশ-কোলে! তখন বুঝলাম ভয় নেই, মা কোলে করে আছেন।

"একবার কৃষ্ণপুজো করতে গিয়ে মনে হলো, মার পুজোটা আগে করে নিলাম না! কিন্তু তারপর যতবারই ধ্যান করি, দেখি শিবের বুকে কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে! একবার শিবকে মায়ের একটা বিভূতি বলে বোধ হলো। কিন্তু সেইদিনই মধ্যরাত্রে ধ্যানের সময় প্রথমেই দেখি। শিবের বুকে শিব দাঁড়িয়ে—বাঘছাল-পরা, কিন্তু হাতে খড়্গ-মুণ্ড! বুঝলাম কালী-কৃষ্ণ এক এবং শিব-শক্তিও এক।*□

---

* উদ্বোধন, ৯৮তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৌষ ১৪০৩, পৃঃ ৬৫৯-৬৬৬; এই স্মৃতিকথাটি আমরা পেয়েছি স্বামী বাসুদেবানন্দের বিশেষ স্নেহভাজন স্বামী বেদান্তানন্দের সৌজন্যে। স্বামী বেদান্তানন্দ কৃষ্ণনগর (উকিলপাড়া) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের (জেলা—নদীয়া) অধ্যক্ষ। —সম্পাদক

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী ও বাবুরাম মহারাজ ঃ একদিনের কথা

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ

১৩২১ সনের (১৯১৪ খ্রীস্টাব্দ) এপ্রিলের মাঝামাঝি বা বৈশাখের প্রারম্ভে একদিন সকালবেলা আমি আমার এক সহপাঠী গোপীনাথ দাশকে সঙ্গে নিয়ে বাবুরাম মহারাজের (স্বামী প্রেমানন্দের) সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই। বাবুরাম মহারাজ তার কিছুদিন আগে ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থান ঘুরে এসেছেন এবং তখন বাগবাজারে বলরাম-মন্দিরে অবস্থান করছেন। বাবুরাম মহারাজ আমাকে আগে থেকেই চিনতেন। উভয়ে মহারাজের পদধূলি গ্রহণ করলাম। তারপর বন্ধুকে দেখিয়ে বললাম ঃ "মহারাজ, আমার এই বন্ধুর বাড়ি মালদায়। বেলুড় মঠের উৎসবাদি এর এত ভাল লেগেছে যে, ইচ্ছা হয়েছে এদের ওখানে ঠাকুরের একটি বিরাট উৎসবের অনুষ্ঠান করে। এদের সকলের আন্তরিক ইচ্ছা—আপনি উৎসবকালে মালদায় শুভ পদার্পণ করুন।"

বাবুরাম মহারাজ—বটে? সত্যি উৎসব করবে? কবে?

আমি—আজ্ঞে হ্যাঁ, জ্যৈষ্ঠ মাসে।

বাবুরাম মহারাজ—পূর্ববঙ্গ থেকে ফিরে আসার পর থেকে বারবারই আমার মনে হচ্ছিল যে, রাজসাহীর [তৎকালীন উত্তরবঙ্গ] ওদিকে কি কেউ আমাদের ডাকবে না? এখন দেখছি, ভাবতে না ভাবতেই মালদা থেকে ডাক এসেছে। ঠাকুরের উৎসব করবে, তা বেশ। দেখবে, তিনিই কৃপা করে সকল রকমে সহায় হবেন।

গোপীনাথ—মহারাজ, আমরা ধীরেনকে[1] নিয়ে যাচ্ছি। ধীরেন ওখানে থাকলে আমাদের সকল রকমের সুবিধা হবে।

---

১ লেখকের পূর্বাশ্রমের নাম ধীরেন—ধীরেন্দ্র দাশগুপ্ত।—সম্পাদক

বাবুরাম মহারাজ—হ্যাঁ, নেবে বইকি। ও সব দেখিয়ে দিতে পারবে। (আমার দিকে ফিরে) হ্যাঁরে, তুই তবে যাচ্ছিস?

আমি—এরা সকলে ধরেছে, যেতেই হবে। আপনি কি আদেশ করেন?

বাবুরাম মহারাজ—তা বেশ, আয় গে, সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিস।

আমি—ওখানকার উৎসবের সব ব্যবস্থা এবং দিন ঠিক হলে আমি যথাসময়ে আপনাকে জানাব। আপনি প্রস্তুত হয়ে থাকবেন। আমরা আপনাদের নিয়ে যেতে আসব।

এভাবে কিছুক্ষণ আলাপের পর আমরা বাবুরাম মহারাজকে প্রণাম করে বিদায় নিলাম।

পুরনো মালদার উত্তর প্রান্তে কাটারাবাজার নামে এক প্রশস্ত খোলা মাঠে উৎসবক্ষেত্র নির্বাচিত হলো। প্রধান প্রধান নগরবাসীরা সমবেত হয়ে ১৬,১৭ ও ১৮ জ্যৈষ্ঠ উৎসবের দিন ধার্য করলেন। মালদার সর্বত্র সর্বশ্রেণীর লোকের কাছে উৎসবের নিমন্ত্রণ গেল। সুদূর পূর্ববঙ্গেও বিশিষ্ট ভক্তদের কাছে নিমন্ত্রণ পাঠানো হলো।

উৎসবের তারিখ নির্ধারিত হওয়ার কিছু পরেই আমি স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজকে উৎসবের সংবাদাদি জানিয়ে দু-একখানা চিঠি লিখলাম। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, উত্তর আসছে না দেখে আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম। আর দু-একদিনের মধ্যে উত্তর না এলে 'তার' করব কিনা ভাবছি। এমন সময় বাবুরাম মহারাজের উত্তর এল। পত্রের মর্ম এই ঃ তোমার পত্রাদি যথাসময়ে পেয়েছি। ইতিমধ্যে আমি একটু ব্যস্ত ছিলাম বলে উত্তর দিতে কিছু দেরি হয়ে গেল। আশা করি কিছু মনে করবে না। মালদার ভক্তেরা শ্রীশ্রীপ্রভুর নামে বিরাট উৎসব করছেন জেনে যারপরনাই আনন্দিত হলাম। শ্রীশ্রীপ্রভুর কৃপায় ওখানকার উৎসব নির্বিঘ্নে ও মহানন্দে সম্পন্ন হোক। বর্তমানে স্বামী সারদানন্দ অত্যন্ত অসুস্থ। এ-অবস্থায় আমার ওখানে উৎসবে যোগদান করা সম্ভব হবে না। তোমরা এজন্য মোটেই নিরুৎসাহ হয়ো না।

শ্রীশ্রীপ্রভুই তোমাদের সকল রকমে সহায় হবেন জানবে। সকলে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জেনো।

আমি বাবুরাম মহারাজের পত্র পাঠ করে নিরুৎসাহ হলাম বটে, কিন্তু একেবারে নিরাশ হইনি। উদ্যোক্তারা এই সংবাদ শুনে একেবারে উদ্যমহীন হয়ে পড়লেন। তখন উৎসবের মাত্র ১২।১৩ দিন বাকি—সময়ও কম। উৎসবের তারিখ পরিবর্তিত হবে কিনা—এ-সম্বন্ধে বেলুড় মঠে গিয়ে বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অবস্থা না বুঝলে কিছুই স্থির করা যায় না। উদ্যোক্তাদের পরামর্শ অনুসারে স্থির হলো, আমি দুজন যুবক কর্মিসহ ৯ জ্যৈষ্ঠ বেলুড় মঠে রওনা হব এবং বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পত্র না দেওয়া পর্যন্ত উৎসবের তারিখ পরিবর্তনের কোন আলোচনা বা প্রস্তাব হবে না।

আমি দুজন কর্মিসহ ৯ জ্যৈষ্ঠ কলকাতায় রওনা হলাম। পরদিন সকালে শিয়ালদায় পৌঁছেই প্রথমে আমি আমহার্স্ট স্ট্রীটে পূজনীয় শ্রীমর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম, কারণ মাস্টার মশাইয়ের কাছে স্বামী সারদানন্দ মহারাজের শারীরিক অবস্থা জানতে পারব। মাস্টার মশাইয়ের মুখে স্বামী সারদানন্দ মহারাজের শারীরিক সুস্থতার সংবাদ পেয়ে আমাদের নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হলো। আমরা সেখান থেকে বরাবর বাগবাজারে উদ্বোধন কার্যালয়ে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে এলাম। স্বামী সারদানন্দ মহারাজ অন্নপথ্য করছেন জেনে আমরা নিশ্চিন্ত হলাম। বাগবাজার ঘাট থেকে আমরা তখনই একটি নৌকা ভাড়া করে বেলুড় মঠে ছুটলাম। মঠের ঘাট থেকে নৌকা অনতিদূরে থাকাকালেই আমি দেখলাম, বাবুরাম মহারাজ মঠবাড়ির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে রোয়াকে দাঁড়িয়ে স্নানের উদ্যোগ করছেন। আমাদের আনন্দ ও উৎসাহের সীমা রইল না। আমরা 'জয় শ্রীগুরুমহারাজজী কি জয়', 'জয় মহামায়ী কি জয়' বলে ধ্বনি দিতে লাগলাম। বাবুরাম মহারাজ জয়ধ্বনি শুনে নৌকার দিকে তাকালেন এবং একজন ব্রহ্মচারীকে বললেন : "দ্যাখ দেখি কারা এসেছে।" কেউ কেউ

ঘাটে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখলেন এবং স্বামী প্রেমানন্দজীকে আমাদের পরিচয় দিলেন। আমরা তিনজন নৌকা থেকে নেমে গঙ্গাজলে হাত-পা ধুয়ে প্রথমে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে প্রবেশ করলাম এবং তারপর বাবুরাম মহারাজের পদধূলি নিতে নিচে এলাম। বাবুরাম মহারাজ আমাদের দেখেই বললেন ঃ "তোরা এসেছিস? ভাবছিলাম, তোরা বুঝি আমায় আর ডাকলিই না।" আরও দু-একটি কথা জিজ্ঞাসা করে মহারাজ আমাদের স্নানাদি করতে বললেন।

যথাসময়ে স্নানাহার সেরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে বিকালবেলা আমি বাবুরাম মহারাজের সঙ্গেই ঘোরাফেরা করছিলাম, আর যাওয়ার দিন কবে হতে পারে তা জিজ্ঞাসা করার সুযোগ খুঁজছিলাম। অনেকক্ষণ পরে বাবুরাম মহারাজ ঘুরে ফিরে নানা কাজ দেখে ও দেখিয়ে যখন পূর্বদিকের বারান্দায় বড় বেঞ্চের ওপর বসলেন, তখন এই বিষয়ে আলাপের সুযোগ মনে করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ "মহারাজ, কবে এখান থেকে রওনা হলে আপনার পক্ষে সুবিধা হয় তা জানতে পারলে ভাল হয়।"

বাবুরাম মহারাজ—এই তো এলি, এখনই রওনা হবার কথা? এসেছিস, দু-একদিন বিশ্রাম করনা রে!

আমি—দু-একদিন এমনি কেটে যাবে। ওখানে ওঁরা সব উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন। মালদায় আমাদের যাবার তারিখটা জানিয়ে দিলে ওঁরা নিশ্চিন্ত হতেন।

বাবুরাম মহারাজ—যাওয়া কি আমার ইচ্ছায় হয়?

আমি—তবে কার ইচ্ছায় হয়, মহারাজ?

বাবুরাম মহারাজ—ঠাকুরের ইচ্ছা যদি হয় তবে যাওয়া হবে। আমরা তো কত কি ইচ্ছা করি, কিন্তু কয়টা কাজ নিজেদের ইচ্ছামত করতে পারি?

আমি—ঠাকুরের ইচ্ছা কি করে বুঝবেন, মহারাজ?

বাবুরাম মহারাজ—কেন, সাক্ষাৎ মা জগদম্বা রয়েছেন বাগবাজারে!

তাঁকে জিজ্ঞেস করলেই হবে। তিনি যদি অনুমতি দেন তবে যাওয়া হবে।

আমি—মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে কবে যেতে চান?

বাবুরাম মহারাজ—চল না, কাল সকালেই যাওয়া যাবে। সকালবেলা দেখবি এখান দিয়ে অনেক নৌকা কলকাতার দিকে যায়। একখানাকে ডাকলে এখানে লাগিয়ে আমাদের নিয়ে যাবে।

আমি যেন আশা ও নিরাশার ঢেউয়ের মধ্যে পড়ে কেবল উঠছি আর পড়ছি। মন খুবই উদ্বিগ্ন। পরদিন ভোরে উঠে গঙ্গার ঘাটে দাঁড়ালাম। একখানা নৌকা ডাকলাম। নৌকা ঘাটে লাগলে বাবুরাম মহারাজকে ডাকব ভাবছি, এমন সময় দেখলাম মহারাজ নিজেই বরাবর নৌকায় গিয়ে উঠলেন।

অল্প সময়ের মধ্যে নৌকা বাগবাজার ঘাটে পৌঁছাল। আমরাও মাতৃমন্দিরে পৌঁছালাম। স্বামী সারদানন্দ মহারাজ নিচের ছোট ঘরটিতে বসেছিলেন। সেখানে বাবুরাম মহারাজ তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরেই বাবুরাম মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারেন—খবর এল। বাবুরাম মহারাজ ওপরে গেলেন। আমিও পিছনে পিছনে গেলাম। বাবুরাম মহারাজ শ্রীশ্রীমাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে হাঁটু গেড়ে জোড়হাতে বসলেন। আমিও মাকে প্রণাম করে একপাশে বসলাম। শ্রীশ্রীমা খাটের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে পা-দুটি ঝুলিয়ে বসেছিলেন. মাথায় অর্ধ-ললাট পর্যন্ত ঘোমটা, মুখ অর্ধাবৃত। জনৈক ব্রহ্মচারী একখানা পাখা-হাতে শ্রীশ্রীমার একপাশে দাঁড়িয়ে আছেন।

শ্রীশ্রীমা—বাবুরাম, কেমন আছ?

বাবুরাম মহারাজ—এখন ভালই আছি, মা।

শ্রীশ্রীমা—মঠের সব ভাল তো?

বাবুরাম মহারাজ—মঠের সব ভাল আছে, মা।

শ্রীশ্রীমা—আর খবর কি?

বাবুরাম মহারাজ—মা, আমি তো মূর্খ মানুষ। আমাকে নিয়ে সবাই টানাটানি করে। (আমাকে দেখিয়ে) এরা এসেছে মালদা থেকে। সেখানে ঠাকুরের উৎসব হবে, এরা চায় আমি সেখানে যাই।

শ্রীশ্রীমা—সে তো অনেক দূর। তোমার না এর মধ্যে অসুখ হয়েছিল ?

বাবুরাম মহারাজ—হ্যাঁ, বারো-চোদ্দ দিন আগে একবার জ্বর হয়ে গেছে।

শ্রীশ্রীমা—তবে এই গরমের মধ্যে, একবার অসুখও হয়ে গেছে, এত দূর নাই গেলে।

বাবুরাম মহারাজ—আচ্ছা মা, বেশ বেশ, তাই হবে।

বাবুরাম মহারাজ এই কথা বলে ধীরে ধীরে নিচে চলে গেলেন। মহারাজকে দেখে মনে হলো, যেন মা তাঁর অভীপ্সিত আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন। নিচে স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে আমার তাঁর নানা কথাবার্তা হতে লাগল।

এদিকে আমার মনের অবস্থা যে কি হলো, তা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। আমি কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইলাম এবং পরে শ্রীশ্রীমাকে সকল কথা নিবেদন করে বললাম : "মা, আজ মাস দেড়-দুই যাবৎ মালদায় শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবের আয়োজন হচ্ছে। সকলেরই বহুদিন থেকে সঙ্কল্প—বাবুরাম মহারাজকে নিয়ে এই উৎসব করেন। সকলেই আশা করে রয়েছেন। তিনি না গেলে হাজার হাজার লোক নিরাশ হবে, উদ্যোক্তারা মর্মাহত হবেন। মালদা তো বেশি দূরে নয়, মা। আজ রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করে রওনা হলে কাল দুপুরেই সেখানে পৌঁছে আহারাদি করা যায়। রাস্তায় কোন কষ্ট হবে না। প্রথম শ্রেণী বা দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িতে ভাল বন্দোবস্ত করে নিয়ে যাব স্থির করেছি। আপনি অনুমতি না দিলে উৎসবই পণ্ড হয়ে যাবে। বেশিদিন নাই বা রইলেন, অন্ততঃ কয়েকদিনের জন্য বাবুরাম মহারাজকে যেতে অনুমতি না দিলে সবাই হতাশ হবে। সকলে কত আশা করে বসে আছে!"

শ্রীশ্রীমা—সে দূর নয় বলছ! এত কাছে কি?

জনৈক ব্রহ্মচারী—মালদা, যেখান থেকে বড় বড় ফজলি আম আসে, মা।

শ্রীশ্রীমা—সে তো খুব দূর নয়ই বটে।

আমি—হ্যাঁ মা, মোটেই দূর নয়। আজ রাত দশটায় রওনা হলে কাল দুপুর হতে না হতেই সেখানে পৌঁছানো যায়। বাবুরাম মহারাজের যাতে কোনরকম অসুবিধা না হয় সেভাবেই তাঁকে নিয়ে যাব, মা। আপনি অনুমতি করুন।

শ্রীশ্রীমা—আচ্ছা বাবা, তোমরা সকলে একটু যাও। আমায় কিছুক্ষণ ভেবে দেখতে দাও।

শ্রীশ্রীমা একা মন্দিরে রইলেন। আমি নিচে এসে দেখলাম, বাবুরাম মহারাজ শরৎ মহারাজের সঙ্গে বেশ আলাপাদি করছেন। আমি ভাবতে লাগলাম—মালদায় যাওয়ার ব্যাপারে বাবুরাম মহারাজ তো কখনো কোন অমত দেননি অথচ শ্রীশ্রীমা যখন অমত প্রকাশ করলেন তখন তিনি একটি কথাও বললেন না! তিনি মায়ের আদেশে যেন মহা আনন্দিত হয়েই নিচে নেমে এলেন। অপরদিকে এও ভেবে আমি স্তম্ভিত হলাম যে, সাধু-মহাপুরুষদের চরিত্রে বিপরীত ভাবের কী অদ্ভুত সামঞ্জস্য! কোথায় মহারাজের এই কথা—"তোরা বুঝি আমায় আর ডাকলিই না", আর কোথায় শ্রীশ্রীমার "নাই গেলে" কথায়—"আচ্ছা, বেশ বেশ, তাই হবে"!

কিছুক্ষণ পরে ব্রহ্মচারী ওপর থেকে বললেন : "বাবুরাম মহারাজকে মা ডাকছেন, বল।" বাবুরাম মহারাজকে খবর দিলে তিনি তৎক্ষণাৎ মার সঙ্গে পুনরায় দেখা করতে চললেন। আমিও পিছনে পিছনে গেলাম। বাবুরাম মহারাজ ঘরে প্রবেশ করেই দাঁড়ালেন।

শ্রীশ্রীমা—হ্যাঁ বাবুরাম, এরা এত করে বলছে, তবে কি তুমি যাবে?

বাবুরাম মহারাজ—আমি কী জানি, মা? আমি কী জানি? আমাকে যা আদেশ করবেন তাই করব। জলে ঝাঁপ দিতে বলেন, জলে ঝাঁপ দেব; আগুনে ঝাঁপ দিতে বলেন, আগুনে ঝাঁপ দেব; পাতালে প্রবেশ করতে বলেন তো পাতালে প্রবেশ করব। আমি কী জানি? আপনার যা আদেশ।

কথাগুলো বাবুরাম মহারাজ এত ভাবাবেগে বললেন যে, কিছুক্ষণ পর্যন্ত সকলে নীরব নিস্তব্ধ। বাবুরাম মহারাজের চোখ-মুখ আরক্তিম হয়ে গেল। সকলেই যেন কি এক অদ্ভুত ভাবে কিছুক্ষণ বিমুগ্ধ হয়ে রইল। শ্রীশ্রীমাও কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য—ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, "বোঝে প্রাণ বোঝে যার"। কিছুক্ষণ পর শ্রীশ্রীমার অমৃতময়ী বাণীতে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হলো।

শ্রীশ্রীমা—এরা ঠাকুরের উৎসব করছে, এত করে বলছে, যাও একবার এসো গিয়ে। তবে বেশিদিন থেকো না।

বাবুরাম মহারাজ কিছুক্ষণ পরই শ্রীশ্রীমায়ের চরণধূলি গ্রহণ করে নিচে নামলেন। ব্রহ্মচারী তখন আমাকে ডেকে বললেন ঃ "ওহে, তোমাকে মা ডাকছেন, শুনে যাও।" আমি ঘরে প্রবেশ করে দাঁড়ালে শ্রীশ্রীমা আমাকে বললেন ঃ "দেখ, এরা সব মহাপুরুষ। এদের শরীর জগতের কল্যাণের জন্য। দেখো, এদের শরীরের ওপর যেন কোন অত্যাচার না হয়।" আমি বললাম ঃ "মা, এখান থেকে প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে বার্থ রিজার্ভ করে বাবুরাম মহারাজকে নিয়ে যাব। সঙ্গে নানারকম খাবার থাকবে। সেখানেও ভাল বন্দোবস্ত করা হয়েছে। আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করব যাতে মহারাজের কোন অসুবিধা না হয়। আপনি ভাববেন না, মা। এবিষয়ে আমি বিশেষ লক্ষ্য রাখবই।" শ্রীশ্রীমা আশীর্বাদ করে বললেন ঃ "আচ্ছা বাবা, এসো গিয়ে।"

শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে আমি নিচে এসে দেখলাম, বাবুরাম মহারাজ

ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক বিশিষ্ট ভক্ত ও কর্মী প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন : "প্রফুল্ল, তুমি যাবে মালদায়? অনেক নতুন ভক্ত দেখতে পাবে, কত আনন্দ হবে।" প্রফুল্লবাবুও সাগ্রহেই যেতে রাজি হলেন। বাবুরাম মহারাজ পরে আমাকে বললেন : "চল, গঙ্গাধর মহারাজ বলরাম-মন্দিরে আছেন, তাঁকে সেখানে দেখে যাই।" মহারাজ আমাকে সঙ্গে নিয়ে বলরাম-মন্দিরে গেলেন। গঙ্গাধর মহারাজ যে-ঘরটিতে ছিলেন, সেখানে গিয়ে বাবুরাম মহারাজ গঙ্গাধর মহারাজকে জিজ্ঞেস করলেন : "কেমন আছ?"

গঙ্গাধর মহারাজ—কেমন আর থাকব, দাদা। ওষুধপথ্যি করছি, এই একরকম কাটিয়ে দেওয়া যাচ্ছে।

বাবুরাম মহারাজ—তুমি এতদিন হলো এখানে এসেছ, একবার মঠে গেলে না? স্বামীজী মঠ করে গেলেন, আর তুমি কলকাতায় এসে মঠে গেলে না?

গঙ্গাধর মহারাজ—মা জোর করে সারগাছি থেকে আমাকে চিকিৎসার জন্য এনেছেন। কবিরাজ লাগিয়েছেন। এখানে নিয়মমত ওষুধ খাচ্ছি, পথ্যি করছি। এখন কোথাও গেলে মা বকবেন। আর তোমরা তো বৈরাগী, তোমরা ওখানে মাছের ঝোল পথ্যি দেবে কি? (হাস্য)

বাবুরাম মহারাজ—আচ্ছা চল, দেখবে তোমার পথ্যি দিতে পারি কিনা।

গঙ্গাধর মহারাজ—এখন কোথাও গিয়েছি জানলে মা বকবেন। শরীরটা ঠিক হতে দাও না।

বাবুরাম মহারাজ কিছুতেই ছাড়লেন না। গাড়ি আনতে লোক পাঠানো হলো। গঙ্গাধর মহারাজকে সঙ্গে করে আমরা গাড়িতে উঠলাম। এরপর বরানগর ঘাট থেকে নৌকায় বেলুড় মঠে পৌঁছালাম। পরদিন

বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে কে কে মালদার উৎসবে যাবেন তার আলোচনা হতে লাগল। স্বামী ধীরানন্দ, ব্রহ্মচারী চারুচন্দ্র, এন্টালীর কেষ্টবাবু, দুর্গানাথবাবু এবং আরও কিছু ভক্ত সঙ্গে যাবেন স্থির হলো। রওনা হওয়ার তারিখ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় আমাকে বাবুরাম মহারাজ বললেন : "কেন, আজই (বৃহস্পতিবার) চল না।" আমি বললাম : "আজ যেতে হলে বৃহস্পতিবারের বারবেলাতে মঠ থেকে রওনা হতে হয়।"

বাবুরাম মহারাজ—মা অনুমতি দিয়েছেন, আবার বৃহস্পতিবারের বারবেলা কিরে?

স্থির হলো, বাবুরাম মহারাজ ও সাধুরা বিকালবেলা বলরাম-মন্দিরে গিয়ে উঠবেন, সেখান থেকে রাত্রে আহার শেষ করে শিয়ালদায় গিয়ে ট্রেন ধরা যাবে।* □

* স্বামী প্রেমানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেমানন্দ আশ্রম, আঁটপুর, হুগলী, ১৩৭২, পৃঃ ৬১-৭৬ (পুনর্মুদ্রিত : উদ্বোধন, ৯৬তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, চৈত্র ১৪০০, পৃঃ ১৩০-১৩৩)

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকণিকা

স্বামী ভূতেশানন্দ

মাকে প্রথম দেখি যখন আমার ছাত্র অবস্থা। বাগবাজারে গঙ্গার ধারে বেড়াতে যেতাম। একদিন সেখানে কয়েকটি কিশোর গান করছে। বিদ্যাসাগর স্কুলের একজন শিক্ষকও সেখানে ছিলেন। তিনি বসতে বললেন। বসলাম। খুব ভাল লাগল। সেখানেই পরে জ্ঞান মহারাজের (ব্রহ্মচারী জ্ঞান) সংস্পর্শে আসি। বন্ধুদের সঙ্গে বাগবাজারে গঙ্গার ধারে একটি ছোট শিবমন্দিরে যেতাম। তখন আমাদের পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে। আমাদের সকলেরই পরিচালক ও উপদেষ্টা ছিলেন জ্ঞান মহারাজ। তিনি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য। স্বামীজী তাঁকে আজীবন ব্রহ্মচারী থাকতে আদেশ করেছিলেন। জ্ঞান মহারাজ আমাদের মতো অল্পবয়স্ক বালকদের অধ্যাত্মপথে পরিচালনার চেষ্টা করতেন ও নানাভাবে এবিষয়ে উৎসাহ দিতেন।

১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মায়ের জন্মতিথিতে[১] জ্ঞান মহারাজ আমাদের বাগবাজারে 'মায়ের বাড়ী' বা উদ্বোধনে নিয়ে গেলেন। উদ্দেশ্য—সেই পবিত্র দিনে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন ও প্রণাম করা। সমস্ত দিনের উৎসব তখন শেষ হয়েছে। মায়ের সেবক রাসবিহারী মহারাজ (স্বামী অরূপানন্দ) দোতলায় মায়ের ঘরের বারান্দা থেকে বললেন : "সমস্ত দিন ভক্তদের দর্শন দিয়ে মা এখন ক্লান্ত। জ্ঞান মহারাজ একা মাকে প্রণাম করে যেতে পারেন।" জ্ঞান মহারাজ উত্তরে জানালেন, তাঁর সঙ্গের বালকদের যদি মাকে দর্শনের ও প্রণামের সুযোগ না হয় তাহলে তিনিও মাকে নিচের থেকেই প্রণাম

---

১ বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার সম্পাদক অরুণকুমার লাহিড়ী আমাদের জানিয়েছেন যে, তারিখটি ছিল ২৪ ডিসেম্বর (১৯১৮), মঙ্গলবার—৯ পৌষ, ১৩২৫। উল্লেখ্য যে, ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে মায়ের জন্মতিথি দুবার পড়েছিল—প্রথমবার ৪ জানুয়ারি, শুক্রবার—২০ পৌষ, ১৩২৪।—সম্পাদক

করে যাবেন। সম্ভবতঃ মাকে জিজ্ঞাসা করায় এবং মায়ের আদেশে রাসবিহারী মহারাজ আমাদের সকলকেই ওপরে গিয়ে মাকে দর্শন ও প্রণাম করার সুযোগ দিলেন। আমরা এক-একজন করে গেলাম। মা তখন তাঁর ঘরের দরজার সামনে স্বীয় স্বভাবসুলভভাবে আপাদমস্তক কাপড়ে ঢাকা অবস্থায় একটি চেয়ারে শুধু পা-দুখানি বের করে রেখে বসেছিলেন। সুতরাং মায়ের মুখ দেখার সুযোগ আমাদের কারো হলো না। আমরা তাঁর চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করে এলাম। তখন সেখানে গোলাপ-মা, যোগীন-মা ও মায়ের সেবক রাসবিহারী মহারাজ উপস্থিত ছিলেন। ঐ একবার মাত্রই মাকে স্থূলশরীরে দর্শন করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এর পরে মা দেশে চলে যান। একবছরেরও বেশি দেশে থেকে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারির শেষে মাকে উদ্বোধনে আনা হয় স্বামী সারদানন্দ মহারাজের ব্যবস্থায়। মা তখন খুবই অসুস্থ ছিলেন। পরে মায়ের শরীর ক্রমশঃ আরও খারাপ হতে থাকে। ফলে তাঁকে আর দর্শন করা হয়নি। অবশেষে ঐ বছরেই ২১ জুলাই তাঁর মহাসমাধি হয়। মহাসমাধির পর তাঁর দেহ উদ্বোধনে নিচের উঠানে সকল ভক্তদের দর্শনের জন্য রাখা ছিল। সেই অবস্থায় দ্বিতীয়বার দর্শন।

তাঁর মরদেহ যখন উদ্বোধন থেকে বেলুড় মঠে সৎকারের জন্য আনা হয় তখন যে শোভাযাত্রা হয়েছিল তাতেও আমরা যোগ দিয়েছিলাম। স্বামী সারদানন্দ মহারাজের নেতৃত্বে আমরা সকলে পদব্রজে উদ্বোধন থেকে বরানগর কুঠিঘাটে আসি। সেখানে মঠেরই একটি নৌকায় মায়ের দেহ মঠে নিয়ে আসা হয়। নৌকার মাঝি ও দাঁড়ী ছিলেন সাধুরাই। আরও কয়েকটি নৌকা সকলের জন্য ভাড়া করে রাখা ছিল। সেগুলির একটাতে গঙ্গা পার হয়ে আমরা মঠে এলাম। খালিপায়ে বাগবাজার থেকে কুঠিঘাটে আসতে প্রচণ্ড রোদের জন্য অনেকেরই পায়ে ফোস্কা পড়েছিল। তবে শোভাযাত্রায় যোগ দিতে

পেরে এবং অত সাধু-ব্রহ্মচারী ভক্তদের শোভাযাত্রায় দেখে মনে একটা অবর্ণনীয় অনুভূতি হয়েছিল।

স্বামীজীর ঘরের দক্ষিণে স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিজের হাতে লাগানো নাগলিঙ্গম গাছের ধার বরাবর তখন গঙ্গা ছিল। সেখানটায় গঙ্গার ধারটা ছিল ঢালু। মাকে সেখানেই নামানো হলো। সেখান থেকে মঠবাড়ির উঠানে আমতলায় নিয়ে যাওয়া হলো যাতে সাধু ও ভক্তরা মাকে দর্শন করতে পারেন। তারপর মায়ের বর্তমান মন্দিরের সামনে গঙ্গার ঘাটে মাকে নিয়ে যাওয়া হলো। ঘাট ঠিক নয়, তবে ওখানে গঙ্গার পাড়টা সমান ও সমান্তরাল ছিল। সেখানে মাকে স্নান করানো হলো। মঠে বর্তমানে যেখানে মায়ের মন্দির সেই জায়গাতেই কেবল চন্দনকাঠ দিয়ে চিতা সাজানো হয়েছিল। মুখাগ্নির জন্য ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল-দাদাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁকে পাওয়া যায়নি। সেজন্য শিবু-দাদাকে (রামলাল-দাদার ভাই) দিয়ে মুখাগ্নি ও চিতায় প্রথম অগ্নি-সংযোগ করা হয়।[২]

দাহের পরে চিতাধৌত করার জন্য সাধুদের সঙ্গে ভক্তরাও গঙ্গাজল ঢেলেছিলেন। আমিও ঢেলেছিলাম। তারপর সাধুদের মধ্যে কেউ কেউ মায়ের দেহাবশেষ সংগ্রহ করেছিলেন। সাধুদের পর ভক্তরাও অনেকে সংগ্রহ করতে আরম্ভ করল। তখন স্বামী সারদানন্দ মহারাজ তাঁর স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য ত্যাগ করে উচ্চৈঃস্বরে বললেন : "যাঁরা এই পবিত্র চিতাভস্ম সংগ্রহ করছে তারা যেন মনে রাখে যে, এর পবিত্রতা রক্ষা করে নিত্য পূজাদির ব্যবস্থা না করলে সর্বনাশ

---

২ স্বামী গম্ভীরানন্দের 'শ্রীমা সারদা দেবী' গ্রন্থে এসম্পর্কে কোন উল্লেখ না থাকলেও দুর্গাপুরী দেবীর 'সারদা-রামকৃষ্ণ' গ্রন্থে রামলাল-দাদার দ্বারা 'শিরাগ্নিকার্য' সম্পন্ন হওয়ার কথা বলা হয়েছে। পূজ্যপাদ মহারাজজীর স্মৃতিকথা এই সম্পর্কে নতুন আলোকপাত করছে।—সম্পাদক

হবে।” তাঁর সেই গম্ভীর স্বরে উচ্চারিত সতর্কবাণীতে আতঙ্কিত হয়ে ভক্তরা তাঁদের সংগৃহীত চিতাভস্ম পুনরায় চিতাস্থলে রেখে দেন। সাধুরা কেউ কেউ বোধহয় নিজেদের কাছে চিতাভস্ম রেখেছিলেন। অন্ততঃ একজনকে জানি—তাঁর কাছে মায়ের চিতাভস্ম ছিল। তিনি গিরিজা মহারাজ (স্বামী গিরিজানন্দ)। তিনি মায়ের পূতাস্থির নিত্য পূজা করতেন, বাইরে কোথাও গেলে যেখানে পূজার উপকরণ পাওয়া যেত না সেখানে তুলসীপাতা দিতেন।* ☐

* উদ্বোধন, ৯৮তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৌষ ১৪০৩, পৃঃ ৬৫৭-৬৫৮

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি

স্বামী আদিনাথানন্দ

১৯১৯ সালের ডিসেম্বরে আমি শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা লাভ করি। ঘটনাটি অবশ্য সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবেই ঘটেছিল। রামকৃষ্ণ মিশনের কলকাতা 'স্টুডেন্টস হোম'-এর কাছেই ছিল বঙ্গ ছাত্রাবাস, যেখানে আমি থাকতাম। স্টুডেন্টস হোমে আমি প্রায়ই যেতাম। সেখানকার অধ্যক্ষ ছিলেন অনাদি মহারাজ (স্বামী নির্বেদানন্দ)। তিনি ছাত্রদের সঙ্গে খুব স্নেহভরে কথা বলতেন। পরবর্তী কালে আমি কিছুদিনের জন্য স্টুডেন্টস হোমে কর্মী হিসাবে ছিলাম এবং পরে সেখানেই মঠে যোগ দিই। প্রায় প্রতি রবিবারে আমি এবং আমার মতো বেশ কিছু ছাত্র, যারা হয় স্টুডেন্টস হোমের ছাত্র অথবা আমার মতো সেখানকার ছাত্র না হয়েও অনাদি মহারাজের ভক্ত, বেলুড় মঠে যেতাম। আমরা প্রায়ই দেখতাম যে, রাজা মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ওপরের বারান্দায় গঙ্গার দিকে মুখ করে বসে আছেন। তাঁর সান্নিধ্য ছিল সবসময় আনন্দময়। বড় রসিক ছিলেন তিনি। তিনি আমাদের স্নেহভরে 'সুরেনের দল' বলে অভিহিত করতেন। কারণ, অনাদি মহারাজের ডাকনাম ছিল 'সুরেন'।

১৯১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে শ্রীহট্টের এক যুবক, নাম হরসুন্দর (পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ মঠে যোগদান করেন এবং নাম হয়—স্বামী সাধনানন্দ), শ্রীশ্রীমায়ের কাছে দীক্ষা নিতে কলকাতায় এসেছিলেন। মা তখন জয়রামবাটীতে। হরসুন্দরের সঙ্গে শ্রীহট্টের ভক্ত এবং শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্যের (পরবর্তী কালে স্বামী প্রেমেশানন্দ) লেখা একটি পরিচয়পত্র ছিল। হরসুন্দর জয়রামবাটী যাবার রাস্তা চিনতেন না, তাই আমি তাঁর সঙ্গী হয়ে সেখানে তাঁকে

নিয়ে যাই। জয়রামবাটীতে গিয়ে তিনি শ্রীশ্রীমাকে বললেন : "আমরা আপনার কাছে দীক্ষা নিতে চাই।" তাঁকে "আমরা" বলতে শুনে আমি চমকে গেলাম। কারণ, আমার দীক্ষা সম্পর্কে কোন পরিকল্পনাই ছিল না। যাই হোক, আমি কিন্তু চুপ করে রইলাম। ইন্দ্রদয়ালবাবুর পরিচিত জেনে মা সানন্দে দীক্ষা দিতে রাজি হলেন। মায়ের সেবকরা অবশ্য এই প্রস্তাবে মোটেই খুশি হলেন না; কারণ, এই সময় মায়ের শরীর ভাল যাচ্ছিল না। অবশ্য পরে যখন তাঁরা জানলেন যে, আমরা ইন্দ্রদয়ালবাবুর পরিচিত, তখন তাঁরা আর আপত্তি করলেন না। পরের দিন আমাদের দীক্ষা হবে জানানো হলো। রাসবিহারী মহারাজকে (স্বামী অরূপানন্দ) মা আমাদের সম্পর্কে পরে বলেছিলেন : "ছেলেদুটির সংস্কার বেশ ভাল। এদের ভিতর ভক্তি-বিশ্বাস, ত্যাগ-বৈরাগ্য আছে। দেখবে, এরা দুজনেই সাধু হবে।"

পরদিন সকালে মায়ের একজন সেবক মায়ের ঠাকুরঘরে আমাদের নিয়ে গেলেন। দেখলাম, মা আগে থেকেই সেখানে পূজার আসনে বসে। সাধারণতঃ তাঁর মুখ ঘোমটায় ঢাকা থাকত, কিন্তু গিয়ে দেখলাম তাঁর মুখ সম্পূর্ণ অনাবৃত। দীক্ষা হয়ে যাবার পর তিনি সোজা রান্নাঘরে চলে গেলেন আমাদের জন্য রান্না করতে। নিজের অসুস্থ শরীরের কথা এতটুকুও ভাবলেন না। আমি মনে মনে ভাবলাম, গুরুর কী চমৎকার সেবাই না করছি! আমার জন্য তাঁকে কষ্ট করে রান্না করতে হচ্ছে। দীক্ষার পর থেকে আমার সমস্ত দিনটা যেন এক অন্য জগতে কাটল, এমন এক জগৎ যেখানে শুধু স্নেহ-ভালবাসা আর আনন্দ।

পরদিন সকালে আমরা কলকাতা রওনা হলাম। মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিতে খুব কষ্ট হয়েছিল। রাস্তায় খাওয়ার জন্য মা আমাদের সঙ্গে মুড়ি আর গুড় পুঁটলিতে বেঁধে দিলেন। বিদায় নেবার সময় আমরা যখন তাঁকে প্রণাম করলাম, তখন তিনি আমাদের প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন। কিন্তু তাঁর দুচোখ জলে ভরা। আমরাও

কাঁদছিলাম। চাঁপাডাঙা হয়ে দুদিন পর আমরা কলকাতায় ফিরলাম। তখন ছেলেদের আসা-যাওয়ায় ঐরকম সময় লাগত, মেয়েরা গেলে লাগত আরও একদিন কি দেড়দিন বেশি।

বিদায় নেওয়ার সময় আমার সঙ্গী মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : "মা, মন্ত্রটি কতবার জপ করব?—হাজার, দশ হাজার, নাকি তারও বেশি?" মা বলেছিলেন : "বাবা, তোমরা এখন ছাত্র। (হরসুন্দর তখন দশম শ্রেণীর ছাত্র, আমি ইন্টার মিডিয়েট প্রথম বর্ষের। বয়সে অবশ্য হরসুন্দর আমার চেয়ে একটু বড়ই ছিল।) অনেক পড়াশুনো করতে হবে। পরীক্ষা দিতে হবে। বেশি জপ করতে পারবে না এখন। পরে সময় সুযোগ পেলে ধীরে ধীরে বাড়াবে। তবে ঠাকুর স্বয়ং আমায় বলেছেন, 'রামকৃষ্ণ নাম দশবার জপলেই হবে। তা-ই যথেষ্ট।' ঠাকুর জগতের আধ্যাত্মিক কল্যাণসাধনের জন্য স্বয়ং কঠোর তপস্যা করে ভগবদ্‌ভাব জাগিয়ে দিয়ে গেছেন। আন্তরিকতা, ব্যাকুলতা, অনুরাগ, প্রীতি নিয়ে সাধন-ভজন করলে এখন অল্পেতেই সুফল পাবে।" এই সামান্য বিধান শুনে আমরা পুলকিত হলাম। কলকাতায় যখন আমরা স্বামী সারদানন্দ মহারাজকে এই কথা বললাম, তিনি বললেন : "হ্যাঁ, মনকে স্থির করতে পারলে এবং মনকে বশে আনতে পারলে দশবার জপই যথেষ্ট।"

স্বামী নির্বেদানন্দকে যখন আমাদের দীক্ষার কথা বললাম, খুব খুশি হলেন তিনি। আমি তাঁকে বললাম যে, রাজা মহারাজ আমাকে বলেছিলেন পৌষ মাসে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করে আসতে। যখন আমি জয়রামবাটী থেকে কলকাতায় ফিরে এলাম, তখন মহারাজের কথা আমার মনে পড়ল। কিন্তু কি আনন্দের কথা, আমি দেখলাম যে তখন পৌষ মাসই চলছে। সুতরাং, আমি মহারাজের কথা ঠিক ঠিক মেনেছি—তবে মেনেছি আমার অজ্ঞাতসারেই। স্বামী নির্বেদানন্দ বললেন : "তুমি কি জান, কেন তোমাকে মহারাজ পৌষ মাসে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করার কথা বলেছিলেন? কারণ, একটি কথা চালু

আছে, পৌষ মাসে মা কালীকে দর্শন করতে হয়। আর শ্রীশ্রীমা-ই তো স্বয়ং মা কালী।" আমার জীবনের সর্বোত্তম আশীর্বাদ ঐরকম অদ্ভুত এবং অপ্রত্যাশিতভাবে শ্রীশ্রীমায়ের কৃপালাভ।

এর মাস দুয়েকের মধ্যে ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য মাকে কলকাতায় আনা হলো। শুনেছিলাম, আমাদের দীক্ষার পর আর মাত্র দুজনের সৌভাগ্য হয়েছে মায়ের কাছে দীক্ষালাভ করার। আমি যখন কলকাতায় উদ্বোধনে মাকে দর্শন করতে গেলাম তখন কোন দর্শনার্থীকেই মায়ের দোতলার ঘরে যেতে দেওয়া হচ্ছিল না। স্বামী সারদানন্দ মহারাজ আমাকে একতলার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে মাকে প্রণাম জানাতে বললেন।

কয়েক দিনের মধ্যে কলেজে আমার এক বন্ধুর কাছে খবর পেলাম, মা ইহলোক ত্যাগ করেছেন। কলেজ থেকে আমি তক্ষুণি বেলুড় মঠে ছুটলাম। মঠে গঙ্গাতীরে শ্রীশ্রীমায়ের পবিত্র দেহ যেখানে রাখা ছিল সেখানে ভক্তদের বেশ ভিড়। দাহকার্য সম্পন্ন হবার পর মায়ের পবিত্র চিতাভস্ম সংগ্রহ করার জন্য অনেক ভক্ত ব্যগ্র হয়েছিলেন, কিন্তু স্বামী সারদানন্দ তা করতে তাঁদের নিষেধ করলেন।

পরমা প্রকৃতি আদ্যাশক্তি আবার তাঁর স্বরূপে লীন হয়ে গেলেন।* □

---

* উদ্বোধন, ৯৬তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৌষ ১৪০১, পৃঃ ৬৬১-৬৬২

মাতৃপদাশ্রয়

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য

অন্তরে বাহিরে সমতা রক্ষা করিয়া লক্ষ্যপথে আগাইয়া যাওয়া যে কত কঠিন, বুদ্ধির বিকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া বরাবরই তাহা অনুভব করিয়াছি। অবাঞ্ছিত পারিপার্শ্বিক ও অশুভ সংস্কার অসহায় অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে, দৈবশক্তির অলক্ষিত প্রভাব 'মহতী বিনষ্টি' হইতে রক্ষাও করিয়াছে।

বয়স ১৮ বৎসর পূর্ণ হইয়া আসিবামাত্র, সংগ্রামপূর্ণ জীবনের প্রতিক্রিয়াতেই সম্ভবতঃ, সাঙ্ঘাতিক ব্যাধি আক্রমণ করিল— সান্নিপাতিক জ্বর ও অতিসার। দেখিতে দেখিতে শরীর অস্থিচর্মসার হইয়া গেল। একদিন পড়িয়া গিয়া মূর্ছিত হইলে মরিয়া গিয়াছে মনে করিয়া সকলে কান্নাকাটিও করিল। পরদিন সকালে ভিক্ষাজীবী এক ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিলেন : "তোমার ভয় নাই বাবা। তোমাকে এই অবস্থায় দেখে গেছিলাম, আমার মেয়েও শয্যাশায়ী ছিল। জানতে পেরেছিলাম, দুইজনের একজন মারা যাবে। কাল আমার মেয়ে মরে গেছে।" দেড়মাস শয্যাশায়ী থাকিয়া, লাঠিতে ভর দিয়া হাঁটিতে শিখি।

ব্যাধি বন্ধুর কাজ করিল। মৃত্যুভয় দেখা দিল ও জগদ্গুরুর আশ্রয়লাভের জন্য মন ব্যাকুল হইল। আমাদের গ্রামের যতীন্দ্র দত্ত শ্রীশ্রীসারদামাতার কাছে মন্ত্রদীক্ষা পাইয়াছিলেন, তাঁহার কথা আমাদিগকে শুনাইয়াছিলেন। স্থির করিলাম, মায়ের কৃপাপ্রার্থী হইব। স্কুলের শিক্ষক অতুলচন্দ্র চৌধুরীকে সেকথা জানাইতেই তিনি কিছু টাকা পাঠাইলেন ও কলিকাতায় যাইয়া পটলডাঙ্গার এক মেসে যশোদাকুমার মোদকের কাছে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অতুলবাবু ও যশোদাবাবু উভয়েই মায়ের কৃপাপ্রাপ্ত।

বড়দিনের ছুটিতে কলিকাতা যাত্রা করি। হবিগঞ্জ হইতে কয়েক ব্যক্তি কলিকাতায় যাইতেছিলেন, স্টীমারে তাঁহাদের একজনের সঙ্গে এইরূপ কথাবার্তা হয়—"আপনি কলকাতা যাচ্ছেন কেন, দীক্ষা নিতে?" "এরূপ তো ইচ্ছা।" "আপনার অনুমতিপত্র আছে?" "না।" "আপনার দীক্ষা হবে না, আমার হবে। এই দেখুন মার কাছে দীক্ষা নেবার অনুমতি দিয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দ আমাকে পত্র লিখেছেন।" ঐ ভদ্রলোক (অবিনাশ দেব) ও আমরা তিনজন (শ্রীবাস দাস, মানগোবিন্দ চৌধুরী, আমি) যশোদাবাবুর কাছে চার-পাঁচ দিন থাকি। শ্রীশ্রীমার কাছে আমাদের তিনজনেরই দীক্ষা হয়, ঐ ভদ্রলোকের হয় নাই। মা তাঁহাকে দীক্ষা দিতে অমত করেন নাই, পাকচক্রে তিনি নিজেই দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন।

বাগবাজারে 'মায়ের বাড়ী'তে আমার দীক্ষা হয়—১৪ পৌষ ১৩২৫ সাল, রবিবার, কৃষ্ণাদ্বাদশী (২৯ ডিসেম্বর ১৯১৮)। সেদিন সন্ধ্যায় আবার শ্রীশ্রীমার কাছে যাই। সকলের শেষে প্রণাম করিয়া— মা খাটে বসিয়াছিলেন পা ঝুলাইয়া, মুখে ঘোমটা—আমি নিজের মাথাটি তাঁহার শ্রীচরণে রাখি ও তিনি তাঁহার বাম পদাঙ্গুষ্ঠ মৃদুভাবে ঊর্ধ্বমুখে আমার কপালে সঞ্চালিত করেন।

শ্রীশ্রীমাকে তাঁহার বাগবাজারের আবাসে তিনদিনে চারবার দর্শন করি। পূজনীয় শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ), মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ), মহাপুরুষ মহারাজ (স্বামী শিবানন্দ)—এই তিনজনকেও দর্শন করি মায়ের বাড়ীতে, বসু-ভবনে (বলরাম-মন্দিরে), বেলুড় মঠে। মহারাজ আমাকে চাহিয়া দেখিয়াছিলেন।

শ্রীগুরুর দর্শন-স্পর্শনে যে-শক্তি সঞ্চার হয় তাহার ফলে একটি বৎসর মনের সাম্যভাব নষ্ট হইতে পারে নাই, শরীরটিও পুনর্গঠিত হইয়া যায়। করিমগঞ্জের নিকট আকবরপুর কৃষি কোম্পানীতে গুরুভ্রাতা সুরেন্দ্র গুপ্তের কাছে মাঝে মাঝে গিয়া থাকিতাম। সুরেন-দা পরে মঠে সন্ন্যাসী হইয়া স্বামী সৎসঙ্গানন্দ নামে পরিচিত হন। আমার প্রতি তিনি আজীবন স্নেহপরায়ণ ছিলেন।

অসুখ হইতে উঠিবার পর পূজনীয় হরি মহারাজকে (স্বামী তুরীয়ানন্দ) পত্র লিখিয়াছিলাম। দীক্ষালাভের কিছুদিন পরে পরে তাঁহাকে আরও তিনখানা পত্র লিখি। চারখানি পত্রেরই বিস্তৃত উত্তর তিনি দিয়াছিলেন। জনৈক সাধু এই মূল্যবান পত্রগুলি লইয়া যান নকল রাখিয়া ফিরাইয়া দিবেন বলিয়া, কিন্তু কথা রাখিতে পারেন নাই। অনেক বৎসর পরে দেখা গেল, পত্রগুলি 'স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র' গ্রন্থে ছাপা হইয়াছে। পত্রগুলিতে 'শ্রীমান রমেশ', 'প্রিয় রমেশ' ও 'শ্রীমান রমেশচন্দ্র' সম্বোধন আছে।

হরি মহারাজের দ্বিতীয় পত্র

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

কাশীধাম
১৮।৬।(১৯)১৯

প্রিয় রমেশ,

তোমার তারিখহীন একখানি পত্র কয়েকদিন হইল হস্তগত হইয়াছে। উহা বাগবাজার হইতে এখানে পুনঃপ্রেরিত হইয়াছিল।...

তোমার শরীর ও মন পূর্বাপেক্ষা ভাল আছে জানিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। পূর্বে তোমাকে কি পত্র লিখিয়াছি, এখন আর তাহা মনে নাই; যাহা হউক, তাহাতে যে তোমার প্রভূত উপকার হইয়াছে ইহাতে প্রভুর নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ, জানিবে। তাঁহার কৃপায় তোমার সমূহ উন্নতি হউক এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা। মঠে আসিয়াছিলে, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার কৃপালাভ করিয়াছ—জানিয়া বিশেষ সুখী হইলাম। তাঁহার কৃপায় সকল বিষয়ই জানিতে পারিবে। গুরু ইষ্ট অভেদ—এ-তত্ত্ব তিনিই কৃপা করিয়া জানাইয়া দেন। গুরুই ইষ্টরূপে প্রতীত হন, অর্থাৎ গুরুর মধ্যেই ইষ্টদর্শন হয়। শক্তি হিসাবে উভয়েই এক—এভাব ক্রমে উপাসনা

করিতে করিতে লাভ হইয়া থাকে। "গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।/গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"— ইহা হইতেই মর্ম বুঝিয়া লইবে। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবুদ্ধি কর, সকল বন্ধন ছুটিয়া যাইবে। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও ভালবাসা জানিবে।

ইতি
শুভানুধ্যায়ী
শ্রীতুরীয়ানন্দ

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলাম; কিন্তু কলেজে পড়া হইল না। মনে প্রার্থনা জাগিল—মহামায়া, আমাকে পথ করিয়া দাও। সঙ্কল্প করিলাম, গৃহত্যাগ করিব।

১৩২৯ সাল, বৈশাখের শেষভাগে বাবার অনুপস্থিতির সুযোগে বাড়ি হইতে বাহির হই। শিয়ালদহ স্টেশনে রাত্রি কাটাইয়া সকালে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে গিয়া শরৎ মহারাজের সঙ্গে দেখা করি। তিনি মঠে যাইতে বলেন ও তখনই মঠে যাই। বলা বাহুল্য, শ্রীমা তখন আর স্থূলদেহে নাই। মঠের 'ভিজিটার্স রুম'-এ উপুড় হইয়া পড়িয়া আছি একাকী। মঠে আসিয়া অবধি একবারও শ্রীশ্রীমাকে স্মরণ করি নাই, হঠাৎ তাঁহাকে মনে পড়িতেই বোধ হইল আমার পিছনে মহাশক্তি দাঁড়াইয়া। আবছা দর্শন হইল, মা দীর্ঘাঙ্গী, আলুলায়িতকেশা—বিস্তৃত বিপুল কেশভার তাঁহার শ্রীপদ প্রায় স্পর্শ করিতেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শ্রীমুখের বাণী স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। আমার অন্তরে থাকিয়া মা বলিতেছেন—"কাশী যা, কাশী যা, কাশী যা।" মায়ের দৈব প্রত্যাদেশ পাইয়া মন তখন একটা অসাধারণ শক্তিতে পূর্ণ হইয়াছে। বেলা দুইটা হইবে।

৪ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার সকালে কাশীতে পৌঁছি ও বিকালে শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে যাইয়া সেখানকার মহন্তের সঙ্গে দেখা করি। মহন্ত

চন্দ্র মহরাজ (স্বামী নির্ভরানন্দ) আমাকে আশ্রমে স্থান দিতে সম্মত হন এবং তখন বারবেলা থাকায় একটা রাত বাহিরে কাটাইয়া আসিতে বলেন।

কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে যোগদান : ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯ সাল, ১৯ মে ১৯২২ খ্রীস্টাব্দ। উপুদা (স্বামী যোগীশ্বরানন্দ) সঙ্গে নিয়া গঙ্গাস্নান এবং শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা দর্শন করাইলেন। মায়ের আদেশে কাশী আসা হইল এবং সঙ্ঘে যোগদানও হইল।

বিধির বিধানে ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাস হইতে আমার সঙ্ঘজীবনের উপসংহার হইয়া যায়। তাহার পর হইতে আজ পর্যন্ত আমার জীবন-পরিক্রমা বিঘ্নবহুল, দ্বন্দ্বসমাকুল বৈচিত্র্যময় পথে চলিয়াছে। কিন্তু অজস্রবার অনুভব করিয়াছি, আমার বিপর্যস্ত জীবনকে ইচ্ছাময়ী মা অসীম করুণায় স্বাভীষ্ট কর্মে পরিচালিত করিয়াছেন। পূজনীয় শরৎ মহারাজ ২৮ ডিসেম্বর ১৯২৫ তারিখে এক পত্রে আমাকে লিখিয়াছিলেন :

কল্যাণবরেষু,

... শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী যখন তোমাকে কৃপা করিয়াছেন তখন তোমার জীবন ধন্য হইয়াছে—সর্বদা এই ধারণা রাখিবে এবং... এইভাবে সর্বদা উল্লসিত থাকিবে।...

ইতি
শুভানুধ্যায়ী
সারদানন্দ

মায়ের 'ভারী' এবং 'দ্বারী'র এই কথাকটি আমার সমগ্র জীবনের দিগ্‌দর্শন হইয়া রহিয়াছে।* □

* উদ্বোধন, ৯৭তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৌষ ১৪০২, পৃঃ ৬৭৩-৬৭৪

ষষ্ঠ পর্ব

"তোমার লিখিবার শক্তি আছে। কিন্তু কোন্ বিষয়ে কিরূপে লিখিলে লোকে ঠিক ঠিক [শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষত্ব, বক্তব্য, আচরণ এবং বাণীর তাৎপর্য] বুঝিতে পারিবে এবং কোন্ ঘটনার কতদূর প্রকাশ করা কর্তব্য—এই সকল বিষয়ে শিক্ষা করিতে হইবে। লেখনী অনেকস্থলে সংযত রাখিতে হয়।" —স্বামী সারদানন্দ

"শ্রীশ্রীমায়ের কথা যদি উদ্ধৃত কর, তবে খুব হিসাব করে করবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা উল্লেখ করতে পার, কিন্তু তাও খুব সতর্কতার সঙ্গে করবে।" —স্বামী সারদানন্দ

মাতৃদর্শনের স্মৃতি

স্বামী প্রভবানন্দ

আমি যেখানে জন্মেছিলাম সেখান থেকে মায়ের গ্রাম জয়রামবাটীর দূরত্ব প্রায় ২০ মাইল। কলকাতা থেকে জয়রামবাটী যেতে হলে তাঁকে আমাদের ছোট্ট শহরটির [বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর] মধ্য দিয়ে যেতে হতো। একদিন বিকেলে আমরা দুই বন্ধু বেড়াতে বেরিয়েছি। তখন আমাদের বয়স ১৪।১৫ বছর। একটি সরাইখানার কাছে দেখি, একজন গেরুয়া-পরা সাধু দাঁড়িয়ে আছেন আর তাঁর আশপাশে কয়েকজন মহিলা। অতগুলি মহিলাকে তাঁর চারপাশে দেখে আমরা নিজেদের মধ্যে সাধুটির সমালোচনা করতে করতে এগিয়ে গেলাম।

আমার কিন্তু কৌতূহল হলো সাধুটির সম্বন্ধে আরও কিছু জানবার। তাই আমার বন্ধু বাড়ি চলে যাবার পর আমি ফিরে গিয়ে সাধুটিকে প্রণাম করলাম। তিনি প্রশ্ন করলেন : "তুমি কি শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন পেতে চাও?" আমি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' পড়েছিলাম, তাই একথা শুনেই আমি খুব উৎসাহ বোধ করলাম। বললাম : "তার মানে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্ত্রী?" শ্রীশ্রীমা কয়েক ফুট দূরেই বসেছিলেন। সাধুটি হেসে বললেন : "ঐ যে মা বসে আছেন, প্রণাম কর!" আমি মায়ের সামনে প্রণত হয়ে তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম। তিনি আমার চিবুকে হাত দিয়ে চুমু খেয়ে বললেন : "বাবা, তোমাকে কি আগে দেখিনি?" আমি বললাম : "না মা।" সেই ছিল মাকে আমার প্রথম দর্শন। তখন কে জানত যে, তিনি জগতের মা এবং তাঁর সব সন্তানকেই তিনি জানেন!

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে যখন কলকাতায় যাই তখন প্রতি শনিবার যেসময়ে পুরুষরা মাকে প্রণাম করতেন, সেসময়ে আমি শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করতে যেতাম। মাকে শুধু প্রণাম করার

জন্যই লম্বা লাইন পড়ে যেত। মায়ের প্রতি আমার তেমন কিছু শ্রদ্ধার ভাব তখনো পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি এবং তাঁর মহত্ত্বও বুঝতাম না। কিন্তু তাও যেতাম, কারণ যতবারই আমি আমার দুটি আঙুল দিয়ে তাঁর চরণ স্পর্শ করতাম, ততবারই অবধারিতভাবে আমার এক অদ্ভুত অনুভূতি হতো—যেন ইলেকট্রিক শক লাগত। বিদ্যুদ্বাহী তারে হাত লাগলে অবশ্য আমরা শক খেয়ে ছিটকে আসি, কিন্তু এটি ছিল অতি মধুর এক অনুভূতি এবং এর পরেই আমার মনে আসত এক পরম শান্তি। তখন আমার মাত্র ১৬।১৭ বছর বয়স এবং তখন ঐ শান্ত ভাবটি যে ঠিক কী তা বুঝতে পারতাম না।

শুনেছিলাম, শ্রীশ্রীমায়ের দেশের বাড়িতে গেলে তাঁর সঙ্গে অনেক সহজভাবে কথাবার্তা বলা যায়। স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে দীক্ষা পাওয়ার পর একদিন আমার এক বন্ধুর সঙ্গে জয়রামবাটী গেলাম। বন্ধুটিও পরে সন্ন্যাসী হয়েছিল। আমাদের তখন ১৯।২০ বছর বয়স। আমাদের একবারও মনে হয়নি যে, আগে থেকে শ্রীশ্রীমাকে একটা খবর দিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু গিয়ে দেখলাম, তাঁকে চিঠি দেওয়ার দরকারই ছিল না। আমরা পৌঁছালে তাঁর সেবক জানালেন, মা তাঁকে বলে রেখেছেন—রাখালের (স্বামী ব্রহ্মানন্দের) দুটি ছেলে আসছে, তাদের থাকার ব্যবস্থা যেন করে রাখা হয়। আমরা যখন জয়রামবাটী পৌঁছালাম তখন সবে দুপুরের খাওয়া শেষ হয়েছে। কিন্তু শ্রীশ্রীমা আমাদের জন্য কিছু খাবার রেখে দিয়েছিলেন। কলাপাতায় আমাদের খেতে দেওয়া হলো। মা সারাক্ষণ পাশে বসে রইলেন। খেতে খেতে আমরা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম। খাওয়া শেষ করে এঁটো তুলতে যাচ্ছি, মা বললেন : "ও কী করছ?" আমার বন্ধুটি লজ্জায় চুপ করে রইল, কিন্তু আমি সাহস করে বললাম : "এই এঁটো পাতাগুলো আমরা এখানে ফেলে রেখে যেতে পারি না মা!" তিনি সহজভাবে বললেন : "বাড়িতে তোমাদের নিজের মা পাশে বসে থাকলে তোমরা কি করতে?" সমাধান হয়ে গেল। আমরা উঠে গেলে মা জায়গাটা পরিষ্কার করে ফেললেন।

শ্রীশ্রীমায়ের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁর সান্নিধ্যে এসে অনেকেরই মনে হতো যে, তিনি হুবহু তাদের নিজের মায়েরই মতো। আমারও ঐরকম মনে হতো এবং আমি অনেককে জিজ্ঞাসা করে দেখেছি, তাদেরও ঐ একই অনুভূতি। আমার মনে হতো, শ্রীশ্রীমা ঠিক আমার নিজের মায়ের মতো—সহজ, সরল, স্বাভাবিক এক গাঁয়ের মেয়ে। যদিও তখন তাঁর সম্বন্ধে আমার এরকমই ধারণা ছিল এবং তাঁর আধ্যাত্মিক মহত্ত্ব সম্বন্ধে আমি পুরোপুরি অজ্ঞ ছিলাম, তবুও তখন আমার মধ্যে কিছু একটা ঘটেছিল যা তখনো আমি বুঝতে পারিনি। এখন বলতে পারি, আগে মায়ের কৃপা পেয়েছিলাম বলেই আমি স্বামী ব্রহ্মানন্দের কৃপা পেয়েছি এবং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করতে পেরেছি।

শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে কোন বাহ্য ঐশ্বর্যের প্রকাশ বা চটক ছিল না। অবশ্য চটক একটা ছিলই, তবে তা তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী ছিলেন বলেই নয়—শতসহস্র মানুষ মন্দিরে গিয়ে দেবতাকে যেমনভাবে পূজা করেন, আক্ষরিক অর্থে তেমন পূজা মা ছাড়া আর কেউ—বুদ্ধ, যীশুখ্রীস্ট অথবা রামকৃষ্ণ—তাঁদের জীবনকালে পাননি। অথচ আমি দেখেছি, শতসহস্র মানুষ শ্রীশ্রীমাকে জগন্মাতাজ্ঞানে পূজা করছেন আর মা এসম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ও নির্লিপ্ত। তাঁর অসীম ক্ষমতার প্রকাশ ঘটেছে বহু মানুষের জীবনে এবং তারা তাঁর স্পর্শমাত্রেই মুক্ত হয়ে গেছে। আমাদের মা ছিলেন সাক্ষাৎ জগন্মাতা।* □

---

* *Sri Sarada Devi* : The Great Wonder, Ed.—Swami Budhananda, Ramakrishna Mission, New Delhi, 1984, pp. 158-160 থেকে সঙ্কলিত ও অনূদিত। অনুবাদ : কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, (পাইকপাড়া, কলকাতা-৭০০ ০০২)—সম্পাদক

মাতৃদর্শন

স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ

আমি [ঢাকা থেকে] কলকাতায় প্রথম যাই ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে। সেবার মাস্টার মশায়ের সঙ্গে দেখা করার পর ঠিক করেছিলাম শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে যাব, কিন্তু নানা কারণে তা হয়ে ওঠেনি। সম্ভবতঃ সেসময়ে শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটীতে ছিলেন, কলকাতায় ছিলেন না।

আমি দ্বিতীয়বার কলকাতায় যাই ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। সেবার শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করার পরম সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সেদিন ছিল বুধবার। বিকেলে বাগবাজারের উদ্বোধন কার্যালয়ে পৌঁছেছিলাম। শ্রীশ্রীমা সেই বাড়ির দোতলায় থাকতেন। সদর দরজা দিয়ে ঢুকে গিয়ে পৌঁছালাম বাড়ির ভিতরের একটি ছোট্ট উঠানে। সেখানে একজন সন্ন্যাসীকে দেখলাম, যাঁকে আমি ঢাকা থেকেই চিনতাম। তাঁর নাম কপিল মহারাজ[১]। তাঁকে আমি বললাম যে, আমি শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে এসেছি।

তিনি আমাকে বললেন, [পুরুষ] ভক্তরা শুধু মঙ্গলবার ও শনিবার শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন পেতে পারে। আমি বললাম ঃ "আমি অল্পদিনের জন্য কলকাতায় এসেছি। আমি যে শনিবার পর্যন্ত থাকতে পারব না।" তিনি তখন এক অল্পবয়সী সাধুকে [মায়ের এক সেবককে] বললেন মাকে গিয়ে জানাতে যে, একটি ভক্ত ছেলে ঢাকা থেকে এসেছে তাঁকে দর্শন করতে এবং সে আগামী শনিবার পর্যন্ত কলকাতায়

---

১ সন্ন্যাস-নাম স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য। ১৩১৮ সালের মাঘ থেকে ১৩২৭ সালের পৌষ পর্যন্ত তিনি ছিলেন উদ্বোধন কার্যালয়ের কার্যাধ্যক্ষ। ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের ১৯ আগস্ট তিনি দেহত্যাগ করেন।—সম্পাদক

থাকতে পারছে না। শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতি নিয়ে সেই অল্পবয়সী সাধুটি আমাকে শ্রীশ্রীমায়ের দোতলার ঘরে নিয়ে গেলেন।

ঘরের এক প্রান্তে এখনকার মতোই একটি বেদি ছিল। অপর প্রান্তে এক কোণে তক্তপোশের ওপর ছিল শ্রীশ্রীমায়ের বিছানা। তিনি ঐ তক্তপোশের ওপর বসতেন, মাটিতে পা রেখে। ঘরে ঢুকে দেখলাম, মেঝেতে কয়েকজন মহিলা ভক্ত শ্রীশ্রীমায়ের পায়ের কাছে বসে আছেন। আমি ঘরে ঢুকতে তাঁরা পাশের একটি ঘরে চলে গেলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের মুখ যথারীতি ঘোমটায় ঢাকা ছিল। আমি ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করলাম। বললাম, আমি ঢাকা থেকে এসেছি, তাঁর আশীর্বাদপ্রার্থী। তিনি তাঁর ডানহাত তুলে আশীর্বাদ করলেন এবং কয়েকটি মাত্র কথা বললেন। ঠিক তখনই সেই অল্পবয়স্ক সাধুটি দরজার সামনে এসে হাত নেড়ে আমাকে তাঁর কাছে ডাকলেন। মায়ের ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় যেতেই তিনি একটি শালপাতার ঠোঙায় কিছু প্রসাদী ফল ও সন্দেশ দিলেন। প্রসাদ গ্রহণ করে হাত ধুয়ে মায়ের ঘরে ফিরে যাচ্ছি, এমন সময় সেই সাধুটি বললেন : "আজ আর যাবেন না।"

প্রধানতঃ গ্রীষ্মের ছুটিতে আমি কলকাতায় এবং বেলুড় মঠে যেতাম। সাধারণতঃ, সেই সময়ে শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটীতে থাকতেন এবং কলকাতায় ফিরতেন জগদ্ধাত্রীপূজার পরে—অক্টোবর-নভেম্বর মাসে। শুনেছিলাম কামারপুকুর আর জয়রামবাটীতে খুব ম্যালেরিয়া হয়। এতদিন শহরে বাস করেছি, তাই ঐসব জায়গায়, বিশেষ করে বর্ষাকালে যেতে সাহস পেতাম না।

যতদূর মনে পড়ে, ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে একদিন স্বামী প্রেমানন্দ আমাকে মায়ের একটি ছবি নিয়ে গিয়ে পূজা করতে বললেন। উদ্বোধন কার্যালয়ের রাসবিহারী মহারাজকে (স্বামী অরূপানন্দ) তিনি একটি চিঠিও লিখে দেন যাতে তিনি আমাকে একটা শ্রীশ্রীমায়ের ছবি দেন। আমি চিঠিটি নিয়ে রাসবিহারী মহারাজের কাছে যাই

এবং তাঁর কাছ থেকে ছবিটি নিয়ে আসি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যতদিন শ্রীশ্রীমা স্থূলশরীরে ছিলেন ততদিন তাঁর ছবি বিক্রি করা হতো না। আমার কাছে মহামূল্যবান রত্নের মতো সেই ছবিটি সঙ্গে নিয়ে আমি ঢাকা ফিরে গেলাম। আমার ঠাকুরঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবির পাশেই মায়ের ছবিটি রাখলাম। ঢাকায় আমি মোহিনীবাবুর[২] বাড়িতে থাকতাম ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে আর সেখান থেকেই মঠের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতাম।

মহারাজকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) আমি প্রথম দেখি ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার। প্রথম দেখার পর থেকেই তাঁর প্রতি আমার আকর্ষণ উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল।

১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মে আমি আবার বেলুড় মঠে গিয়েছিলাম। সেই সময়ে কয়েকজন যুবক ভক্ত শ্রীশ্রীমায়ের কাছে দীক্ষা নেবে বলে জয়রামবাটী যাওয়ার তোড়জোড় করছিল। তাদের মধ্যে অধিকাংশই জয়রামবাটীতে আগে কখনো যায়নি। সেই দলে ছিল প্রভু—পরবর্তী কালে স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দশম অধ্যক্ষ। ওদের যেতে দেখে আমার মনে হলো, জয়রামবাটী যাওয়ার এবং শ্রীশ্রীমায়ের কাছে দীক্ষা পাওয়ার এ এক অপূর্ব সুযোগ! কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা রওনা হলাম। যাবার আগে সকলের সঙ্গে আমিও গিয়ে মহারাজকে প্রণাম করলাম এবং বিদায় নিলাম। রাস্তার কিছুটা আমরা ট্রেনে গিয়েছিলাম। তারপর হাঁটতে শুরু করলাম এক বিশাল মাঠের মধ্য দিয়ে। দলে আমরা ৬।৭ জন ছিলাম।

সেদিন সন্ধ্যার মুখে আমার আমাশা দেখা দিল। আসলে সেটা ছিল রক্ত-আমাশা। ফলে আমাকে মাঝে মাঝেই থামতে হচ্ছিল। আমার সঙ্গীরা বলল একটি গরুর গাড়ি ভাড়া করতে। গাড়ি ভাড়া করা হলে আমি তাতে উঠে শুয়ে পড়লাম। প্রায় সারারাত গাড়িটি

---

২ জমিদার মোহিনীমোহন দাস। ওঁর বাড়ি ছিল ঢাকার ফরাসগঞ্জে। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে স্বামীজী যখন ঢাকায় গিয়েছিলেন তখন মোহিনীবাবুর বাড়িতে ছিলেন।—সম্পাদক

চলল। সেই দলেরই একজন, শরদিন্দু—পরবর্তী কালে স্বামী বিশ্বনাথানন্দ[৩]—ছিল আমার পুরনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে গরুর গাড়ির পিছনে পিছনে আসছিল। অসুখের জন্য আমাকে প্রায়ই গরুর গাড়িটি থামাতে হচ্ছিল। দলের অন্য সবাই হাঁটছিল—কেউ সামনে, কেউ পিছনে।

পরদিন ভোরে জয়রামবাটীর অনতিদূরে একটি নদীর ধারে আমরা এসে পৌঁছালাম। পথে শরদিন্দু আমাকে বারবার বলল, ঐ অবস্থায় আমার শ্রীশ্রীমায়ের কাছে যাওয়া উচিত নয়, কারণ আমার এই অসুস্থতা তাঁকে খুব অসুবিধায় ফেলবে। সে আমাকে তাই কলকাতায় ফিরে যেতে জোর করল। ফিরে আসার ইচ্ছা আমার মোটেই ছিল না, আবার আমার জন্য শ্রীশ্রীমায়ের এতটুকু অসুবিধা হবে—তাও চাইছিলাম না। শেষপর্যন্ত ফিরে যাওয়াই মনস্থ করলাম। গাড়োয়ানকে বললাম গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে। শরদিন্দু স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে রইল।

পরদিন আমরা কলকাতায় ফিরে এলাম। ইতিমধ্যে আমি অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছি। কলকাতায় এক আত্মীয়ের বাড়ি গেলাম। তিনি খুব যত্ন করলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই আমি আবার স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরে পেলাম।

সেরে উঠে গেলাম বেলুড় মঠে। ইতিমধ্যে আমার ফিরে আসার খবর মঠে পৌঁছে গেছে এবং অনেক ভক্তও তা জেনে গেছেন। মন্দিরে ঠাকুর প্রণাম সেরে স্বামী প্রেমানন্দকে প্রণাম করলাম। তিনি বললেন : "সময় না হলে কোন কাজই হয় না।" এরপর মহারাজকে প্রণাম করতে গেলাম। আমাকে দেখে তিনি শুধু বললেন : "শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি"—শ্রেয়োলাভের পথে অনেক বাধা।

এরপর শ্রীশ্রীমাকে দ্বিতীয়বার দর্শনের সুযোগ আমার জীবনে আর আসেনি। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে [২১ জুলাই] শ্রীশ্রীমা মহাসমাধিতে প্রবেশ করেন।

---

৩ স্বামী বিশ্বনাথানন্দ কাশী অদ্বৈত আশ্রমে যোগদান করেন ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে। তিনি ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দের ১৯ জুন কাশীতে তিনি দেহত্যাগ করেন।—সম্পাদক

আমার অবশ্য সৌভাগ্য হয়েছিল ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে [১৯ এপ্রিল] জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরপ্রতিষ্ঠা উৎসবে উপস্থিত থাকার। মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন স্বামী সারদানন্দ। সেই উৎসবে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের একশ জনেরও বেশি সাধু এবং কলকাতা ও অন্যান্য স্থান থেকে বহু ভক্ত যোগ দিয়েছিলেন। উৎসব চলেছিল বেশ কয়েকদিন ধরে। দূর-দূরান্তের হাজার হাজার গ্রামবাসীকে পেট ভরে খাওয়ানো হয়েছিল। আমার দেখা সবচেয়ে বড় উৎসব-অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে সেটি ছিল অন্যতম প্রধান।* □

---

* লেখকের 'The Significance of Sri Ramakrishna's Life and Message In The Present Age' (Vedanta Society of St. Louis, U.S.A., 1976, pp. 85-91) গ্রন্থ থেকে সঙ্কলিত ও অনূদিত। অনুবাদ : অধ্যাপক সন্দীপকুমার দাঁ (বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৭)—সম্পাদক

মাতৃস্মৃতি

স্বামী অম্বানন্দ

শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী অম্বানন্দের পূর্বাশ্রম কেরলের ত্রিবাঙ্কুরে। তাঁর পূর্বনাম—সি. মধুরন পিল্লাই। স্মৃতিকথায় উল্লিখিত তাঁর ভাইয়ের নাম সি. দামোদরন পিল্লাই।—**সম্পাদক**

দিনটা ছিল ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের ১৯ সেপ্টেম্বর, শনিবার, অমাবস্যা। সেদিনই শ্রীশ্রীমাকে প্রথম দর্শনের সৌভাগ্য আমার হয়। আগের দিন বিকেলে স্বামী নির্মলানন্দজী বেলুড় মঠের যে-ঘরে আমি এবং আমার ভাই দামোদরন ছিলাম, সেই ঘরে এলেন এবং বললেন : "আগামীকাল শ্রীশ্রীমাকে তোমাদের দর্শন ও প্রণাম নিবেদন করার পক্ষে শুভদিন। প্রত্যূষে স্নান সেরে নেবে, কিন্তু প্রাতরাশ করবে না। কিছু ফুল নিয়ে ব্রহ্মচারী গোবিন্দের (তিনি মঠের ডিস্পেনসারিতে কাজ করতেন) সঙ্গে শ্রীশ্রীমার কাছে যাবে। সেখানে দুপুরের প্রসাদ পেয়ে বিশ্রাম করে দক্ষিণেশ্বরে যেতে পার। দেবীদর্শন ইত্যাদি করে সন্ধ্যার মধ্যে মঠে ফিরে আসবে।" সেইমত আমরা শনিবার ভোরে স্নান সেরে কিছু ফুল তুলে নিয়ে মঠে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর মন্দিরে গিয়ে ঠাকুর ও স্বামীজীর চরণে নিবেদন করি। তারপর স্বামী প্রেমানন্দজীকে প্রণাম করে ব্রহ্মচারী গোবিন্দের সঙ্গে বাগবাজারে উদ্বোধনে যাই। 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'তে প্রবেশের আগেই গোবিন্দজী রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেওয়ালে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। তাঁর এই সুগভীর ভক্তির প্রকাশ দেখে অনুরূপভাবে আমরাও দেওয়ালে মাথা ঠেকিয়ে আমাদের ভক্তি নিবেদন করলাম। 'মায়ের বাড়ী'তে প্রবেশ করে বাঁদিকের ঘরে গেলাম। সেখানে স্বামী সারদানন্দজী বসেছিলেন। তাঁকে আমরা প্রণাম করলাম। তিনি আমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা

বললেন। ইতিমধ্যে উদ্বোধনের ম্যানেজার মহারাজ বললেন : "মা এখন পূজা করছেন। পূজা শেষ হলে দর্শন হবে।" আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম।

সকাল ৯টার পর মায়ের পূজা শেষ হলো এবং আমাদের ডাকা হলো। প্রথমে আমাকেই তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। তাঁর পূজার ঘরে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম, পশ্চিমমুখী করে সিংহাসনে ঠাকুরের ফটো বসানো আছে। আমি ভূমিষ্ঠ হয়ে সেখানে প্রণাম করলাম। তারপর মাকে প্রণাম করলাম। তিনি আমাকে তাঁর বাঁদিকে বসতে আজ্ঞা করলেন। তিনি উত্তরমুখী হয়ে পূজার আসনে বসেছিলেন। এরপর তিনি কিছুক্ষণ ঠাকুরের পূজা করে আমার হাতে গঙ্গাজল দিলেন। আমি জানতাম না, ঐ জল একটু মুখে দিতে হয়। আমার বাবার শ্রাদ্ধের সময় পুরোহিতের দেওয়া জল আমি আমার মাথায় এবং চোখে ছিটিয়েছিলাম। মায়ের দেওয়া এই পুণ্যবারি নিয়েও আমি সেরকম মাথায় ও চোখে ছিটালাম। মা পুনরায় একটু জল আমার হাতে দিয়ে জিভে ছিটাতে বললেন। তারপর তিনি আমাকে রামকৃষ্ণ-মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। কিভাবে ডানহাতের আঙুল দিয়ে জপ করতে হয়, তিনি আমাকে তা তিনবার দেখিয়ে দেন। এইভাবে একবারে দশবার নামজপ করা যায়। তারপর তিনি আমাকে মা-কালীর মন্ত্রও দিলেন। দীক্ষা-শেষে তিনি আমার কাছে গুরুদক্ষিণা চাইলেন। যখন আমি কাপড়ের খুঁট থেকে এক টাকার একটি মুদ্রা তাঁকে দিতে গেলাম, তখনি আমার মনে একটি ভাবনার উদয় হলো—কিভাবে আমি তাঁর হাতে মুদ্রাটি দেব ? কারণ, তিনি এমন একজনের সহধর্মিণী, যিনি নিজে কখনো মুদ্রা স্পর্শ করতেন না বা স্পর্শ করতে পারতেন না। সেই কারণে আমি মুদ্রাটি মায়ের বাঁপায়ের কাছে রাখলাম। তৎক্ষণাৎ তিনি আমার মনের ভাব বুঝতে পারলেন এবং পরম করুণায় মুদ্রাটি তুলে নিয়ে একপাশে রাখলেন—এইভাবে আমাকে দেখালেন যে, মুদ্রাটি তিনি গ্রহণ করেছেন। তখন আমি পরম শ্রদ্ধায়

মায়ের সামনে ভূমিষ্ঠ হলাম এবং মনে মনে বললাম : "মা, আপনি যদি দয়া করে আপনার পাদপদ্ম একটু তোলেন তাহলে আমার মাথার ওপর তা রাখতে পেরে কৃতার্থ হতে পারি।" তিনি তৎক্ষণাৎ আমার মনের ভাব বুঝে তাই করলেন। আমি তাঁর সেই পাদপদ্মযুগল আমার মাথার ওপর রাখলাম এবং এক দিব্য আনন্দের অনুভূতি লাভ করলাম। সেই অবস্থায় তাঁকে বললাম : "মা, দয়া করে আমাকে পবিত্রতা ও ভক্তি দিন।" পূর্বরাত্রে আনন্দের অস্থিরতায় একটুও ঘুমোতে পারিনি। মনের মধ্যে অসংখ্যবার প্রশ্ন জেগেছিল যে, মায়ের সঙ্গে দেখা হলে আমি কী প্রার্থনা করব এবং অবশেষে স্থির করি, এই প্রার্থনাটিই মায়ের কাছে রাখব। মা তৎক্ষণাৎ একটি ফুল নিলেন এবং সেটি আমার মাথায় রেখে বললেন : "তুমি যা চাইছ, শ্রীগুরু মহারাজ তোমাকে তাই দেবেন।" মায়ের এই কথায় আমি পরম সান্ত্বনা পেলাম এবং পরমানন্দে ফুলটি নিয়ে সযত্নে আমার কাছে রাখলাম। এই ফুলটি আমি দু-তিনদিনে অল্প অল্প করে সবটুকু খেয়ে নিয়েছিলাম।

তারপর শ্রীশ্রীমা আমাকে কিছুক্ষণের জন্য জপ করতে বললেন। আমি আনন্দে আত্মবিস্মৃত হয়ে জোরে জোরে মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগলাম। মা তখন ঠোঁটে আঙুল রেখে বললেন : "মুখে নয়, মনে মনে জপ কর।" তাঁর আজ্ঞামত আমি সেইভাবে জপ করে পুনরায় তাঁকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলাম। তিনি আমাকে বললেন : "বাইরে গিয়ে তোমার ভাইকে পাঠিয়ে দাও।" আমি বাইরে এসে ভাইকে পাঠালাম।

আমার ভাই ফিরে এলে আমরা দুজনে নিচে ম্যানেজার মহারাজের ঘরে গেলাম এবং সেখানে বসে নীরবে জপ করতে লাগলাম। দুপুরে আমরা স্বামী সারদানন্দজী এবং অন্যান্যদের সঙ্গে একটি ঘরে আহারে বসলাম। ঐ ঘরে শ্রীশ্রীমায়ের একটি অপূর্ব প্রতিকৃতি রাখা ছিল। খাবার দেওয়ার পর অন্যান্য সকলে আহার শুরু করলেন।

কিন্তু আমরা দুজন—আমি এবং আমার ভাই—চেয়েছিলাম যে, মায়ের প্রসাদ পাওয়ার পর আহার গ্রহণ করব এবং সেই কারণে আমরা চুপ করে বসেছিলাম। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাইঝি লক্ষ্মী-দিদি খাবার পরিবেশন করছিলেন। তিনি আমাদের মনের ইচ্ছা বুঝতে পেরে বললেন : "বাবা, মা এখনো খেতে শুরু করেননি। তাঁকে খাবার দেওয়া হয়েছে। তিনি তোমাদের খাবার দিতে বলেছেন। তিনি খেতে শুরু করলে আমি তোমাদের প্রসাদ এনে দেব। তোমরা এখন খাওয়া শুরু করতে পার।" কিছুক্ষণ পর তিনি আমাদের মায়ের প্রসাদ এনে দিলেন। ঘি এবং ডাল দিয়ে মাখা দু-মুঠো ভাত। আমরা ভক্তিভরে সেই প্রসাদ ভাগ করে খেলাম। শেষ বিকালে আমরা মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা করলাম।

দশদিন পর অর্থাৎ দুর্গাপূজার বিজয়াদশমীর দিনে সকালে স্নান সেরে আমরা আবার উদ্বোধনে গেলাম। সেখানে রাসবিহারী মহারাজকে মায়ের জন্য কিছু ভাল মিষ্টি আনিয়ে দেবার জন্য টাকা দিলাম। আমরা ম্যানেজার মহারাজের ঘরে বসলাম। মায়ের পূজা শেষ হলে আমরা তাঁর কাছে গেলাম এবং তাঁকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলাম। মধ্যাহ্নে সেখানেই আমরা প্রসাদ পেলাম। সেদিন বিকেলে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পূজা দিয়ে বেলুড় মঠে ফিরে এলাম সন্ধ্যা ছটায়।

একদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা কয়েকজন লোকের সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে গেলাম। সেদিন তিনি আমাদের সঙ্গে কোন কথা বললেন না। আমি মনে খুব দুঃখ পেলাম। কিন্তু তখনি মা আমার দিকে স্নেহভরে তাকালেন এবং পরম করুণায় আমার প্রতি মৃদু হাসলেন।

আমাদের বারাণসী-যাত্রার আগে আমরা শ্রীশ্রীমায়ের কাছে বিদায় নিতে গেলাম। তখন তিনি আমাদের সঙ্গে প্রায় পনের মিনিট ধরে কথা বললেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজখবর নিলেন। অন্যান্য কথার মধ্যে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : "আগে কখনো কাশীধাম গিয়েছ? তোমাদের সঙ্গে কারা যাচ্ছেন? ওখানে কতদিন থাকবে?

তোমরা কি এখানে ফিরে আসবে, নাকি সেখান থেকে সরাসরি তোমাদের নিজেদের বাড়িতে ফিরে যাবে? তীর্থযাত্রার জন্য যথেষ্ট টাকাকড়ি তোমাদের সঙ্গে আছে তো? না থাকলে আমি তোমাদের দেব। আমাকে জানাতে দ্বিধা করো না। যদি ফেরত দিতে চাও তো সুবিধানুযায়ী দিলেই হবে। ওখানে রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) আছে। আমার হয়ে একটা কাজ করবে? রাখালকে আমার আশীর্বাদ জানাবে। তাহলে আমি খুব খুশি হব। মঠে ফিরে এলে দেরি না করে এখানে চলে আসবে।" এইভাবে পরম স্নেহভরে তিনি আমাদের সঙ্গে নানা কথা বললেন। আমাদের মন গভীর আনন্দে পরিপূর্ণ হলো। আমি আমার নিজের মাকে হারানোর দুঃখ ভুলে গেলাম। শ্রীশ্রীমায়ের মুখ আমার নিজের মায়ের মুখ মনে করিয়ে দিচ্ছিল। ভাবলাম, যদি প্রত্যেক মায়ের স্নেহ শ্রীশ্রীমায়ের মতন হতো তাহলে পৃথিবীটা একটি আনন্দভবন হয়ে উঠত।

আমরা কাশীধামে পৌঁছে স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর নিকট উপস্থিত হলাম এবং তাঁকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলাম। মা আমাদের যে-বার্তা দিয়েছিলেন তা তাঁকে জানাবার সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। দু-তিন দিন পর স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে একা পেলাম। আমি তাঁর নিকটে গিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে বললাম ঃ "মহারাজ, আপনার প্রতি আমার কিছু নিবেদন করার আছে। আমি জানি না কিভাবে তা করব! ঠিকমত করতে না পারলে দয়া করে আমাকে মার্জনা করবেন।" তিনি বললেন ঃ "যথেষ্ট ক্ষমাভিক্ষা করেছ, তোমার কি বলার আছে তাড়াতাড়ি বল।" আমি তখন মা যে-বার্তা দিয়েছিলেন তা তাঁকে জানালাম। মায়ের সেই আশীর্বাদ তিনি পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধায় মাথা নত করে গ্রহণ করলেন। এরপর তিনি আমাকে বললেন ঃ "শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে কি আবার তোমার দেখা হবে?" আমি বললাম ঃ "হ্যাঁ, হবে।" মহারাজ বললেন ঃ "তাঁকে বলবে যে, আমি তাঁর আশীর্বাদ পেয়ে নিজেকে কৃতার্থ মনে করছি। তুমি আমার হয়ে

শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণে ভক্তিভরে ভূমিষ্ঠ প্রণামও করবে।" শ্রীশ্রীমায়েরই করুণায় তাঁরই অর্পণ করা দায়িত্ব সন্তোষজনকভাবেই সম্পন্ন হলো।

একদিন মায়ের কাছ থেকে একটি রুদ্রাক্ষের মালা পাওয়ার বাসনা নিয়ে তাঁর কাছে যাই। মাকে সেদিন একা পেয়েছিলাম। মায়ের কাছে আমার প্রার্থনা নিবেদন করতে মা আমাকে একটি রুদ্রাক্ষের মালা দেন। আমি মালয়ালম ভাষায় মায়ের কাছে প্রার্থনা জানালাম : "মা, এই মালা আমি আপনার গলায় পরাতে চাই।" মা তৎক্ষণাৎ তাঁর মাথাটা সামনে এগিয়ে দিলেন এবং আমি ভক্তিভরে মালাটি তাঁর গলায় পরিয়ে দিলাম। তিনি তখনই মালাটি আমাকে ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছেন দেখে আমি আবার মালয়ালম ভাষাতেই বললাম : "মালাটি কিছু সময় আপনার গলাতেই থাকুক।" এরপর আমার ভাই তাঁকে করজপের বিষয়ে একটি প্রশ্ন করল। প্রশ্নের উত্তর ব্যাখ্যা করে তাকে সন্তুষ্ট করা পর্যন্ত তিনি মালাটি গলাতেই পরে থাকলেন। এরপর তিনি মালাটি খুলে আমাকে দিতে গেলে আমি বললাম : "মা, দয়া করে ঐ মালাটিতে কিছুক্ষণ জপ করে তারপর আপনার আশীর্বাদ হিসাবে মালাটি আমাকে দেবেন।" মা মালাটি নিয়ে কিছুক্ষণ জপ করলেন এবং তারপর আমাকে দিলেন। আমি মালাটি নিয়ে নিজের গলায় পরলাম। মা তখন বললেন : "ওটি হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ জপ কর।" আমি মালাটি হাতে নিয়ে মায়ের দেওয়া মহামন্ত্র শ্রীরামকৃষ্ণ-নাম মনে মনে জপ করতে লাগলাম। আমার যখন প্রায় কুড়িবার নামজপ করা হয়ে গিয়েছে, তখন মা বাঙলায় বলে উঠলেন : "না না, ঐ মন্ত্র নয়, আরেকটি যে-মন্ত্র আছে সেটি জপ কর।" তাঁর আজ্ঞা যে আমি বুঝতে পেরেছি তা বোঝাবার জন্য আমি মাথা নাড়ালাম, কিন্তু তবুও আমি শ্রীরামকৃষ্ণের নামই জপ করে যেতে লাগলাম। যাহোক, তিনি অবশ্য আর কিছু আপত্তি করলেন না। আমি অনুমান করলাম যে, মায়ের এতে সম্মতি আছে। একশত শ্রীরামকৃষ্ণ-নাম জপ করার পর মা দেবীর যে-মন্ত্র দিয়েছিলেন সেটি

জপ করলাম। জপ করা শেষ হলে মাকে দেখে মনে হলো—তিনি অশেষ করুণাময়ী। ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। এই ঘটনাটি থেকে আমি অনুভব করলাম যে, মাকে কিছু বলতে হয় না, তিনি অন্তর্যামিনী।

...একদিন হঠাৎ মনে এক অভিপ্রায় জাগল, আমি মায়ের কাছে তাঁর চরণামৃতের জন্য প্রার্থনা করব। তিনি আমার প্রার্থনায় সম্মত হলে নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান বলে মনে করব। ...অনেক ভক্তকেও তাঁর চরণামৃত দিতে পারব। এটা আমার এবং তাদের সকলের কাছেই আশীর্বাদস্বরূপ হবে। এই উদ্দেশ্যে কিছুটা গঙ্গাজল নিয়ে খুব যত্ন করে ছেঁকে একটি দু-আউন্সের শিশিতে ভরে নিলাম। এরপর একদিন সকালে উদ্বোধনে গেলাম এবং ম্যানেজার মহারাজকে বললাম : "আমার একটি পরিষ্কার চ্যাপটা পাত্র প্রয়োজন। কি জন্য প্রয়োজন তা আপনাকে পরে জানাব।" তিনি অনুগ্রহ করে সেইরকম একটি পাত্র আমাকে দিলেন। সেই পাত্রটি নিয়ে আমি এবং আমার ভাই তাঁরই সঙ্গে শ্রীশ্রীমার কাছে গেলাম। মহারাজকে বললাম শ্রীশ্রীমাকে জানাতে যে, আমার একটা প্রার্থনা মঞ্জুর করতে হবে। তিনি আমার কথাগুলি অনুবাদ করে শ্রীশ্রীমাকে বলার আগেই মা তাঁর চরণযুগল বাড়িয়ে দিলেন। আমি পাত্রটি তাঁর শ্রীচরণের নিচে রেখে শিশি থেকে গঙ্গাজল তাঁর শ্রীচরণে ঢালতে লাগলাম। মনে মনে বললাম : "মা, আমি এটুকুই করতে পারি।" তিনি তখন পরম স্নেহভরে আমার দিকে তাকালেন। কিছুটা গঙ্গাজল নিজের হাতে নিয়ে তাতে কিছুক্ষণ জপ করে সেই পূতবারি নিজের চরণেই ঢেলে দিলেন। এইভাবে তিনি তিনবার জপ করলেন এবং সেই জল আমাকে নিতে আজ্ঞা করলেন। নিজেকে আমার পরম সৌভাগ্যবান ও পবিত্র বলে বোধ হলো। মায়ের শ্রীচরণতল থেকে পাত্রটি সরিয়ে নিয়ে একটি গোলাপী রঙের তোয়ালে দিয়ে চরণ-দুটি সযত্নে মুছিয়ে দিলাম। এরপর মাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলাম। অনুভব করলাম,

মা পরম করুণায় আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন। পরে আমার ভাইয়ের কাছে শুনেছিলাম যে, ম্যানেজার মহারাজকে তিনি অনুচ্চস্বরে বলেছিলেন : "দেখ, কত ভক্তিভরে ছেলেটি এসব করছে!" ভাবলাম, সেও তো তাঁরই অনুগ্রহ, তাঁরই আশীর্বাদ! এরপর সেই চরণামৃত পান করার জন্য আমার ভাইকে কিছুটা দিয়ে নিজে কিছুটা পান করলাম। অবশিষ্ট চরণামৃত সযত্নে শিশিতে রাখলাম। সন্ধ্যা হলে মাকে আবার ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে আমরা বেলুড় মঠে ফিরে এলাম। সেই চরণামৃত এখনো আমার কাছে আছে এবং তা থেকে বিন্দু বিন্দু করে বহু ভক্তকে দিয়েছি। বাস্তবিক, এই চরণামৃত মায়ের একটি প্রত্যক্ষ আশীর্বাদ, যার অংশ আমি অপরকেও দিতে পারি।

কলকাতা থেকে আমাদের দেশে ফেরার দিন স্থির হওয়ার পর মায়ের কাছে বিদায় নিতে আমরা বেলুড় মঠ থেকে উদ্বোধনে গেলাম। নানা কথার মধ্যে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : "আমাকে দেখতে তোমরা আর আসবে না?" এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সামর্থ্য আমার ছিল না। আমি কপর্দকশূন্য ছিলাম। অনেক কষ্টে আমি এখানে আসতে সমর্থ হয়েছিলাম। এই সুযোগ কি আবার আসবে? কিছুক্ষণ চিন্তার পর আমি মাকে করজোড়ে বললাম : "হ্যাঁ মা, আবার আসব।" আমি অনুভব করলাম যে, মা আমার মনের ভাবনা বুঝতে পেরেছেন এবং আমার উত্তরে সন্তুষ্ট হয়েছেন।

পরদিন অর্থাৎ দেশে ফেরার দিন আমরা কলকাতায় গেলাম আমার এক কাকার আমন্ত্রণে। আমার এই ভক্ত-কাকার বিরল সৌভাগ্য হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করার।

আমাদের হাতে তিনঘণ্টার মতো সময় ছিল, সেই সুযোগে আমরা আরও একবার শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করতে যাই এবং তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি। আমাদের দেখে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন। যখন বিদায় নিচ্ছি মা তখন কিন্তু সেই প্রশ্নটি আর করলেন না—"তোমরা কি আর আসবে না?"

মায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের কয়েক বছর পর একদিন মনে মনে ভাবলাম, আমি যদি দেড়টাকা পাঠিয়ে রাসবিহারী মহারাজকে অনুরোধ করি এক টাকার মিছরি কিনে শ্রীশ্রীমাকে দিয়ে ঠাকুরকে নিবেদন করিয়ে তার অল্প কিছু আমাকে পাঠিয়ে দিতে, তাহলে খুব ভাল হয়। কিন্তু আমি যখন বেতন পেতাম, তখন একথা একেবারে ভুলে যেতাম এবং বেতনের সব টাকাও তাড়াতাড়ি খরচ হয়ে যেত। এইভাবে ছয়মাস কেটে গেল, আমার ইচ্ছাপূর্ণ আর হলো না।

এক বিশেষ পুণ্যদিনে পূজা শেষ করে উঠে আমি দুটি চিঠি পেলাম। হাতের লেখা দেখে বুঝতে পারলাম, চিঠিগুলি স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর পাঠানো। একটি চিঠি পড়লাম। অপরটি খুলে দেখি, তার মধ্যে একটি ছোট প্যাকেট। প্যাকেটটির মোড়কের ওপর লেখা—"শ্রীশ্রীমায়ের প্রসাদ"। প্যাকেটের ভিতরে কতকগুলি মিছরি ছিল। আমার বিস্ময় আর আনন্দের সীমা রইল না। এই ঘটনাটি নিশ্চিতভাবেই শ্রীশ্রীমায়ের অন্তর্দৃষ্টি ও অন্তর্যামিত্বের পরিচায়ক, যে-দৃষ্টি এবং শক্তি ভক্তের একান্ত আকাঙ্ক্ষা জানতে পেরে তা পূর্ণ করে। তাঁর ঐশ্বরিক করুণা অপূর্ব—তুলনাহীন এবং আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগম্য।* □

---

* উদ্বোধন, ৯৮তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৪০৩, পৃঃ ৩৪৪-৩৪৭; দ্রঃ Vedanta Kesari, December 1953, pp. 326-330। অনুবাদ ঃ সন্দীপকুমার দাঁ; সংগ্রহ ঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।—সম্পাদক

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি

মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়

যে বছর আমি শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম দর্শন পাই কলকাতায় তাঁর বাগবাজারের বাড়িতে, সেই সময়টা ছিল ১৯০৯ কিংবা ১৯১০ খ্রীস্টাব্দ। আমার তখন বার বছর বয়স। কলকাতা থেকে মাইল বার দূরের একটি গ্রামের বিদ্যালয়ে নিচুক্লাসের ছাত্র আমি তখন। এক শনিবারের বিকালে শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষিত এক শিষ্যের সঙ্গে আমি বাগবাজারে 'মায়ের বাড়ী'তে আসি। মায়ের এই শিষ্য প্রায়ই আমাদের গ্রামে রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ প্রচার করতেন। শ্রীশ্রীমাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করবার সময় একটা ভয় আমার সারা মন জুড়ে ছিল। শ্রীশ্রীমা অবগুণ্ঠিতা হয়ে তাঁর শ্রীচরণ-দুখানি মাটিতে ঝুলিয়ে খাটের ওপর বসেছিলেন। একজন বয়স্কা ভদ্রমহিলা তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। মায়ের চরণে মাথা ছুঁইয়ে প্রণাম করে যখন মুখ তুললাম, দেখি তিনি ঘোমটাটি একটু সরালেন এবং আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। আমি অনুভব করলাম, তাঁর ঐ হাসি পার্থিব সকল কিছুর ঊর্ধ্বে। তাঁর সঙ্গে কোন কথা হলো না। এরপর তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে নিচে নেমে এলাম। মায়ের সেই কয়েক মুহূর্তের স্নেহদৃষ্টি এমনভাবে আমার মনকে অভিভূত করেছিল যে, আমার মনে সে-স্মৃতি এখনো সজীব হয়ে আছে।

বাড়িতে ফিরে আসার পর মাকে আবার দেখার এক গভীর আগ্রহ আমার মনে উদিত হলো। কয়েক মাস পর তাঁর দর্শনের একটা সুযোগ এল। সেবারে যদিও তিনি দু-একটি কথা বলেছিলেন তবে তা ছিল আমার স্বাস্থ্য এবং লেখাপড়া সংক্রান্ত। কিন্তু আমি বেশ অনুভব করলাম যে, তাঁর প্রতি আমার টান ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে, আর এর মূলে রয়েছে আমার প্রতি তাঁর নীরব সুগভীর স্নেহ।

দু-তিন বছর কেটে গেল। এর মধ্যে আমি বেশ কয়েকবার মার দর্শন পেয়েছি। ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মের এক শনিবার সন্ধ্যাবেলায় শ্রীশ্রীমায়ের কাছে গেলাম। ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁকে প্রণাম করে আমার অন্তরের ইচ্ছা ব্যক্ত করলাম। তাঁর সঙ্গে দেখা করে নিচে নেমে এসে আমার পরিচিত এক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হলো। তিনি আমাকে তাঁর বাসায় রাত্রিবাস করার জন্য বললেন। তারপর আমরা দুজনে শ্রীশ্রীমায়ের অন্যতম সেবক স্বামী ধীরানন্দের সঙ্গে কাছেই গঙ্গার ধারে বেড়াতে গেলাম। সেখানে গঙ্গার ঢালু পাড়ে ঘাসের ওপর বসে বেলুড় মঠ, চরিত্র গঠন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হলো। স্বামী ধীরানন্দ আমার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে একান্ত আপনজনের মতো কথা বলছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের কাছে দীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করার কথা আমার বেশ কয়েকবার মনে হলো, কিন্তু তা বলা হলো না। গ্রামে ফিরে পরের রবিবার দীক্ষাগ্রহণ বিষয়ে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করে আমি তাঁকে একটি চিঠি লিখলাম। ছয়-সাত দিন পর তাঁর উত্তর এল। তিনি লিখলেন, মা দয়া করে দীক্ষা দিতে সম্মত হয়েছেন এবং দিন ও সময় তিনি স্বয়ং ঠিক করে দিয়েছেন। আমি যেন সেই অনুযায়ী বাগবাজারে যাই। আমার পরিচিত যে-ভদ্রলোকের সঙ্গে আগের বার উদ্বোধনে দেখা হয়েছিল, তাঁকে এই চিঠিটা দেখালাম।[১] একমাত্র তাঁকেই বিশ্বাস করে এই চিঠির কথা জানিয়েছিলাম। চিঠিটি দেখে তিনি খুব খুশি হলেন এবং আমাকে বললেন যে, আমার চিঠি পাওয়ার পর কৃষ্ণলাল মহারাজ (স্বামী ধীরানন্দ) তাঁর কাছে আমার স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছেন। তিনি আমাকে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিলেন এবং বললেন যে, আমি একজন পরম সৌভাগ্যবান, কারণ এইভাবে এত কম বয়সে শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা

---

১ মনে হয় ভদ্রলোক এবং লেখক একই গ্রামের লোক। ভদ্রলোক কলকাতা থেকে হয়তো সপ্তাহান্তে গ্রামের বাড়িতে আসতেন। সেসময় লেখক তাঁকে চিঠিটি দেখিয়ে থাকবেন। কারণ, লেখক কলকাতায় এসে তাঁকে চিঠি দেখানোর কথা উল্লেখ করেননি।—সম্পাদক

পাচ্ছি। আমি যে স্বয়ং জগজ্জননীর কাছ থেকে দীক্ষা পেতে চলেছি—এসম্বন্ধে তখন আমার খুব অল্প ধারণা ছিল। আমি শুধু এইটুকু অনুভব করেছিলাম যে, তিনি আমার নিজের মা এবং গুরুরূপে আমার বাকি জীবনে তিনিই আমাকে রক্ষা করবেন। এই অনুভূতি আমার মনের মধ্যে মাঝে মাঝে তোলপাড় করতে লাগল এবং আমি অন্তরে স্পষ্ট উপলব্ধি করলাম, যা আমি লাভ করতে চলেছি, মনুষ্যজীবনে এর বেশি আর কিছু আকাঙ্ক্ষা করার থাকতে পারে না।

নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট সময়ে আমি বাগবাজারে 'মায়ের বাড়ী'তে উপস্থিত হলাম। শ্রীশ্রীমা পূজা শেষ করে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর ঘরে যখন প্রবেশ করলাম তখন আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম, কিন্তু তাঁর সামনে গিয়ে আমার মনে আর কোন ভয় রইল না। বাড়িতে যেমন মায়ের সঙ্গে কথা বলি, সেইভাবে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম। স্বামী ধীরানন্দের পরম করুণা ও স্নেহময় সহায়তায় সেদিন প্রথমে আমারই দীক্ষা হলো। যখন মা আমাকে তাঁর বাঁদিকের একটি আসনে বসতে বললেন, তখন আমি লক্ষ্য করলাম—প্রকৃতপক্ষে আমি স্বচক্ষে দেখলাম—তিনি আর আগের মানুষটি নেই। এক স্বর্গীয় জ্যোতি তাঁকে ঘিরে রয়েছে, আর তাঁর মুখমণ্ডল থেকে বিকীর্ণ হচ্ছে সেই মাধুর্য, সেই স্বর্গীয় আনন্দ, সেই গভীর করুণা—যা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু ইতিপূর্বে আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। এরপর একবার কি দুবার তিনি আমার মাথা থেকে পিঠ বরাবর হাত বুলিয়ে দিলেন এবং বললেন : "এস বাবা, এস—এত ছোট তুমি! আহা, আহা!" এই কথার মাধ্যমে সম্ভবতঃ তিনি এটাই সকরুণভাবে বোঝাতে চাইলেন যে, আমাকে এই দুঃখ-কষ্টের পৃথিবীতে অনেকদিন থাকতে হবে এবং আমার জন্য অনেক দুঃখ-যন্ত্রণা ও ভোগ জমা আছে। আমার শুভাকাঙ্ক্ষী সেই ব্যক্তি আমাকে যেমন বলে দিয়েছিলেন সেই অনুযায়ী আমি একটি রুপোর টাকা গুরুদক্ষিণা হিসাবে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমি মাকে প্রণাম করে যখন টাকাটি তাঁকে দিতে গেলাম, তিনি বলে উঠলেন : "না, না, তোমাকে টাকা দিতে হবে না। তুমি কোথা থেকে টাকা পাবে বাবা? তুমি এখন

স্কুলের ছাত্র, আর তোমার এত কম বয়েস! তুমি এই হরীতকীটি নাও (এই বলে তিনি একটি হরীতকী আমার হাতে দিলেন), আর আমাকে ওটি দাও।" আমি আবদারের সুরে বললাম : "না মা, আপনাকে এই টাকা নিতেই হবে। এই টাকা আমি আমার হাতখরচ বাঁচিয়ে জমিয়েছি।" ইতিমধ্যে স্বামী ধীরানন্দ দরজা খুলে ঘরে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি এতক্ষণ ঘরের বাইরে অপেক্ষা করছিলেন এবং আমাদের কথাবার্তা হয়তো শুনেছিলেন। তিনি চোখের ইশারায় আমাকে টাকাটি হরীতকীর সঙ্গে মায়ের সামনে রাখতে বললেন। আমি তৎক্ষণাৎ তাই করলাম। মা ধীরানন্দজীর হাতে টাকাটি দিতে তিনি আমাকে বললেন : "এই টাকাটি ঠাকুরের পুজোয় খরচ হবে।" শুনে মা মৃদু হাসলেন। এরপর মা গঙ্গাজলে হাত ধুয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর কৃষ্ণলাল মহারাজকে আমায় কিছু প্রসাদ দিতে বললেন। মায়ের চরণে মাথা রেখে প্রণাম করে বাইরে এলাম। মায়ের ঘরের সামনে ছোট বারান্দায়[২] দরজা থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আমি প্রসাদ গ্রহণ করলাম। দেখলাম, কৃষ্ণলাল মহারাজ দীক্ষার জন্য অন্য দীক্ষার্থীদের এক-এক করে ঠাকুরঘরে নিয়ে যাচ্ছেন।

মায়ের কাছে আমি প্রায় পনের মিনিট ছিলাম। যখন বাইরে এলাম, তখন আমার মনে হলো আমি যেন আনন্দের সাগরে সাঁতার কাটছি। দীক্ষার পর ঠাকুরঘর থেকে বের হওয়ার আগে মা আমাকে বলেছিলেন, বাড়ি ফেরার আগে আমি যেন অবশ্যই দুপুরে প্রসাদ পেয়ে যাই। আমি তাই নিচের একটি ছোট ঘরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বলরামবাবুর পুত্র রামকৃষ্ণবাবু তখন সেখানে আসেন। আমার দীক্ষা হয়েছে শুনে তিনি আমাকে পরম স্নেহে আলিঙ্গন করলেন এবং বললেন যে, কয়েক বছর পরে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে আমাকে যোগদান করতে দেখলে তিনি খুব আনন্দিত হবেন। কিন্তু হায়! তা হওয়ার ছিল না। মা আমার ভাগ্যে অন্য পথ নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন।

---

২ আগে মায়ের ঘরের সামনে লম্বা একফালি বারান্দা ছিল সিঁড়ি বরাবর। পরবর্তী কালে বারান্দাটি বাড়ানো হয়েছে।—সম্পাদক

বেলা একটা নাগাদ প্রসাদগ্রহণের জন্য আমাকে ডাকা হলো। প্রসাদ পেতে যে-ঘরটিতে গেলাম, সে-ঘরটি তখন লোকে পরিপূর্ণ। স্বামী সারদানন্দ, স্বামী ধীরানন্দ, রামকৃষ্ণবাবু এবং অন্যান্যদের সঙ্গে একসাথে বসে প্রসাদ পাওয়ার সৌভাগ্য আমার হলো। আমাদের আসনগ্রহণের পর আবার শ্রীশ্রীমাকে দেখতে পেলাম। তিনি ঘরের দরজার কাছে এসে তাঁর নিজের কিছু প্রসাদ একজন বিধবা ভদ্রমহিলার হাতে দিলেন এবং আমার দিকে দেখিয়ে তাঁকে বললেন : "ঐ ছোট ছেলেটিকে এগুলি দাও।" এই ঘটনায় সেখানে উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তি, এমনকি শরৎ মহারাজও (স্বামী সারদানন্দ) আমার দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন। এতে আমি কিছুটা লজ্জা পেলাম।

কিভাবে ধ্যান করব মা আমাকে দীক্ষার সময় দেখিয়ে দিয়েছিলেন, তবুও জিজ্ঞাসা করেছিলাম : "মা, আপনাকে কিভাবে ধ্যান করব?" তিনি উত্তর দিলেন : "তোমাকে সেরকম কিছু করতে হবে না। তোমার ইষ্টের ধ্যানেই সব হবে।" নিজেকে সাধারণের দৃষ্টির আড়ালে রাখার অসংখ্য ঘটনার একটিমাত্র নিদর্শন হিসাবে এটি উল্লেখ করলাম।

সেদিন বিকালে 'মায়ের বাড়ী' থেকে ফিরে আসার আগে আবার তাঁর দর্শন পেলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : "মা, আপনি বলেছেন, মন্ত্রটি সকালে ও সন্ধ্যায় অন্ততঃ ১০৮ বার করে জপ করতে। এছাড়া অন্যসময়েও যতটা পারি করতে। আমি কি যেকোন জায়গায় জপ করতে পারি?" মা বললেন : "হ্যাঁ বাবা, তোমার যেখানে খুশি করতে পার।" আমি আবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম : "খাওয়ার সময় বা কোন অপরিষ্কার স্থানেও কি জপ করতে পারি?" মা খুব জোর দিয়ে বললেন : "হ্যাঁ, হ্যাঁ, অপরিষ্কার স্থানেও করতে পার। ওসব নিয়ে তোমায় কিছু চিন্তা করতে হবে না বাবা।" তিনি আমার মাথার ওপর হাত রাখলেন এবং চোখ বন্ধ করে কয়েক মিনিট নীরব রইলেন। এরপর তিনি আমার চিবুকে হাত দিয়ে আদর করলেন। যখন আমি চলে আসছি তখন বললেন : "আবার এসো বাবা।" কথাগুলি সাধারণ, সাধারণভাবেই বলা। অন্য কারোর কাছে একথাগুলির প্রভাব হয়তো সামান্যই, কিন্তু আমার কাছে তা সকল

প্রেরণার উৎস। জীবনের কঠিন উত্থান-পতনে এই কথাগুলিই আমাকে উজ্জীবিত রাখে। যে-আশ্বাস তিনি আমাকে দিয়েছিলেন, তা আমার কাছে পরম নিশ্চিন্ততা এবং বিপুল সাহসের উৎস। যখনি আমি কোন কারণে বিমর্ষ বা দুর্বল বোধ করেছি অথবা কোন প্রচণ্ড বাধা-বিপত্তির মধ্যে পড়েছি, কিংবা কোন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি তখনি মায়ের কথাগুলি আমার কাছে অফুরন্ত শক্তির মতো কাজ করেছে। আমার এই সামান্য স্মৃতিচারণা থেকে এই কথাগুলিই সুস্পষ্ট হবে যে, তাঁর অসীম স্নেহ আমার মতো অনেক মানুষকেই তাঁর চরণকমলে চিরকালের জন্য বেঁধে ফেলেছে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলে, পবিত্রতা, একনিষ্ঠতা, আন্তরিক ভক্তি এবং অভীষ্ট লাভ করার তীব্র ইচ্ছা—এইসকল গুণ মাকে সবচেয়ে সন্তুষ্ট করত।* □

---

*উদ্বোধন, ৯৮তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মাঘ ১৪০২, পৃঃ ৩২-৩৪; দ্রঃ Prabuddha Bharata, February 1955, pp. 73-75। অনুবাদ : সন্দীপকুমার দাঁ; সংগ্রহ : নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। লেখকের বাঙলায় লেখা মাতৃস্মৃতি 'উদ্বোধন'-এর ৩১তম বর্ষের ৮ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে কিছু অতিরিক্ত তথ্য আছে, বর্তমান নিবন্ধটিতেও কিছু অতিরিক্ত তথ্য আছে। স্বামী চেতনানন্দ সঙ্কলিত 'মাতৃদর্শন' গ্রন্থে মূল বাঙলা স্মৃতিকথাটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।—সম্পাদক

স্মৃতিসৌরভ

সোরাব মোদী

১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের কথা। আমি তখন সদ্যযুবক। আমার দাদা ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত। তাঁর কাছে প্রথম শুনি শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর কথা। দাদাই আমাকে বম্বে থেকে কলকাতায় পাঠান মাকে দর্শন করার জন্য। আমি কলকাতায় এসে বাগবাজারে মাকে দর্শন করতে যাই। তিনি তখন খুব অসুস্থ ছিলেন। শুনলাম সেজন্য ভক্তদের দর্শন বন্ধ। আমি স্বামী সারদানন্দকে প্রণাম করে বললাম : "আমি বম্বে থেকে এসেছি মাকে দর্শন করতে। আমার আকাঙ্ক্ষা মায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করি।" আমার আর্তি দেখে তাঁর করুণা হলো। তিনি

একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমাকে মাকে দর্শন করতে পাঠালেন এবং বললেন মায়ের কাছে যেন আমার প্রার্থনা নিবেদন করি। মাকে প্রণাম করে আমি কাতরভাবে দীক্ষা প্রার্থনা করি। তিনি করুণাপরবশ হয়ে আমাকে তখনই দীক্ষাদান করেন। যদিও তিনি আমার ভাষা বুঝতেন না এবং আমিও বাঙলা জানতাম না তবুও দেখলাম তাঁর কথা বুঝতে আমার কোন অসুবিধা হলো না এবং তাঁরও আমার কথা বুঝতে কোন অসুবিধা হয়নি। মা বাঙলাতেই কথা বলেছিলেন, আমি বলেছিলাম হিন্দীতে। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় আমি বলেছিলাম : "মাঈজী, ম্যায় যা রহা হুঁ।" মা বাঙলায় বললেন : "'যাই' বলতে নেই বাবা, বলো 'আসি'।" একজন সেবক আমাকে মায়ের কথাগুলি ইংরেজীতে অনুবাদ করে শোনালেন : "Mother says, don't say 'I am going', say 'I am coming'।" আমি তো শুনে অবাক! আমি যাচ্ছি, আর মা বলছেন 'আসছি' বলতে! আমি তখন জানতাম না, বাংলাদেশে এভাবেই বিদায় নেবার সময়ে বলা হয়। যাই হোক, আমি বম্বে ফিরে এলাম। সঙ্গে নিয়ে এলাম এক মধুর স্মৃতি। মাকে আমার মনে হয়েছিল ভালবাসায় পূর্ণ তিনি। মনে হয়েছিল—She was wonderful and beautiful। তারপরে বহু বছর কেটে গিয়েছে, আমি এখন বৃদ্ধ। জীবনের এই দীর্ঘ সময় মায়ের কথা আমি কিন্তু ভুলেই গিয়েছিলাম। এখন আমি ওপারের ডাকের অপেক্ষা করছি—যেকোন সময় সেই ডাক এসে যেতে পারে। আজ এই পৃথিবীর কোন কিছুরই আমার কাছে আর আকর্ষণ নেই। এখন এতকাল ভুলে-থাকা মাকেই শুধু আমার মনে পড়ছে। তাঁর সেই অপূর্ব শেষকথাগুলি আমার কানে বাজছে : "যাই বলতে নেই বাবা, বলো আসি।" এখন আমি বুঝতে পারছি—যা তখন আমার কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়েছিল—আমি তাঁর কাছ থেকে 'চলে যেতে' চেয়েছিলাম, কিন্তু শেষ-পর্যন্ত 'যেতে' আমি পারিনি। আমরা কেউই পারি না। মায়ের কাছে আমাদের ফিরে আসতে হবেই। আমার জীবনের অন্তিম উপলব্ধি—আমি আমার মায়ের কাছে ফিরে আসছি—I am coming to my Mother!* □

* স্বামী নিরাময়ানন্দকে [illegible] ও [illegible] পত্রিকার সেপ্টেম্বর [illegible] (১৯৭০-১৯৮২) ইংরেজীতে প্রদত্ত বিবৃতি। বিবৃতিটি আমরা পেয়েছি স্বামী নিরাময়ানন্দের কাছ থেকে।—সম্পাদক

সপ্তম পর্ব

"তোমার লিখিবার শক্তি আছে। কিন্তু কোন্ বিষয়ে কিরূপে লিখিলে লোকে ঠিক ঠিক [শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষত্ব, বক্তব্য, আচরণ এবং বাণীর তাৎপর্য] বুঝিতে পারিবে এবং কোন্ ঘটনার কতদূর প্রকাশ করা কর্তব্য—এই সকল বিষয়ে শিক্ষা করিতে হইবে। লেখনী অনেকস্থলে সংযত রাখিতে হয়।" —স্বামী সারদানন্দ

"শ্রীশ্রীমায়ের কথা যদি উদ্ধৃত কর, তবে খুব হিসাব করে করবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা উল্লেখ করতে পার, কিন্তু তাও খুব সতর্কতার সঙ্গে করবে।" —স্বামী সারদানন্দ

মায়ের কথা

সরলাবালা সরকার

রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের প্রায়-আদিপর্বের অনুরাগীদের মধ্যে সরলাবালা সরকার একটি উল্লেখযোগ্য নাম। তাঁর দীর্ঘ ৮৬ বছরের জীবনে (জন্ম— ৯ ডিসেম্বর ১৮৭৫, মৃত্যু— ১ ডিসেম্বর ১৯৬১) তিনি বাঙলা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের অঙ্গনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন। সমকালীন স্বদেশী আন্দোলনের প্রতিও ছিল তাঁর গভীর সহমর্মিতা। বাংলার সংস্কৃতি-জগতের দুই অনন্য পরিবারের সঙ্গে তিনি সম্পর্কিত ছিলেন। 'যুগান্তর' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা' গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা ঘোষ-পরিবার ছিল সরলাবালার মাতৃবংশ এবং 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক প্রফুল্লকুমার সরকারের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল তাঁর একমাত্র সন্তান নির্ঝরিণীর। সরলাবালার লেখা 'নিবেদিতা' (পরে 'নিবেদিতাকে যেমন দেখিয়াছি') এবং 'স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ' রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত 'গিরিশচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতামালা'র সরলাবালা ছিলেন প্রথম মহিলা বক্তা (১৯৫৩)। 'উদ্বোধন'-এ তাঁর অনেক রচনা প্রকাশিত হয়েছে। ১৯০৯ সালে উদ্বোধনের নবনির্মিত বাড়িতে আসার পর শ্রীমা যেদিন ভগিনী নিবেদিতার আহ্বানে তাঁর স্কুলে পদার্পণ করেন সেদিন স্কুলের ছাত্রীরা সরলাবালার রচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করে শ্রীমায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছিল। কবিতা-আবৃত্তি শুনে শ্রীমা ও নিবেদিতা মুগ্ধ হয়েছিলেন। শ্রীমা ও ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্কের গভীর প্রভাব পড়েছিল তাঁর জীবনে। বর্তমান রচনাটি উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' (১ম ভাগ) গ্রন্থের 'পরিচয়' শিরোনামে ভূমিকারূপে লিখিত সরলাবালা সরকারের রচনা থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ সঙ্কলন করে প্রধানতঃ প্রস্তুত করা হয়েছে। 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' গ্রন্থের ভূমিকারূপে প্রকাশের পূর্বে রচনাটি ২৩ আশ্বিন ১৩৩৩ তারিখে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র অতিরিক্ত শারদীয়া সংখ্যায় (পৃঃ ৪-৫) 'মায়ের কথা' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। বর্তমান রচনাটিতে সরলাবালার অন্য রচনা থেকে প্রাসঙ্গিক অংশও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট অংশের আকর পাদটীকায় নির্দেশিত হয়েছে।—**সম্পাদক**

জননীর অনেক কন্যাই মনে করেন—মা আমাকে অতিশয় ভালবাসেন, কখনো আমাকে ভুলেন না। অযোগ্য এই দীনা লেখিকাও তাঁহাদের মধ্যে একজন। মা অতি নিকটেই থাকিতেন, দর্শনের জন্য ইচ্ছাও যে প্রবল হইত না এমন নহে। কিন্তু সঙ্কোচ সবসময়েই বাধা দিত। তথাপি যখনই যতদিন পরেই মায়ের দর্শন পাইয়াছি তখনই মনেপ্রাণে অনুভব করিয়াছি—মা আমাকে একবারও ভুলেন নাই।

তাঁহার ভালবাসা ক্ষণে ক্ষণে তাঁহাকে নব নব ভাবে বিভাবিত করিত। একজনের একটিমাত্র সন্তান সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছে, তিনি মায়ের নিকট আসিয়া নিজের মনের তাপ জানাইতে গিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন, শ্রীশ্রীমারও চোখে জল। মা বলিতেছেন ঃ "আহা! তাই তো, একটিমাত্র সন্তান, প্রাণের ধন—এমন করে সন্ন্যাসী হয়ে গেলে মা কি করে প্রাণ ধরে বল দেখি?" আবার অপর একদিন একজন যখন তাঁহার দুইটি সন্তানই সন্ন্যাসী হইবার জন্য ব্রহ্মচর্য লইয়াছে ইহা জননীর কাছে জানাইয়া বলিতেছেন ঃ "মা, সন্তানের কল্যাণ হয় সেইটিই মায়ের কামনা। কী আছে সংসারে? ছেলে যদি পরম কল্যাণের পথে যায়, তার চেয়ে আনন্দের বিষয় কী আছে?" মা তখন সহর্ষে বলিতেছেন ঃ "ঠিক বলেছ মা, পরম কল্যাণের পথে যদি ছেলে যায়, তার চেয়ে আর মার আনন্দ কী হতে পারে?" এই যে বিভিন্ন স্থানে মায়ের বিভিন্ন ভাবের উক্তি—উভয়ই তাঁহার আন্তরিক; একটিতে তিনি সন্তানহারা মায়ের দুঃখের সম-অংশিনী, আবার অপরটিতে মা যে সন্তানের প্রকৃত কল্যাণের বিষয় বুঝিয়াছেন, ইহা দেখিয়া পরমানন্দিতা।

সেই অপার স্নেহময়ী জননী যেমন তাঁহার পিতৃহীনা দুঃখিনী স্নেহপাত্রী 'রাধু'র সকল অত্যাচার অম্লানমুখে সহ্য করিয়াছেন, সেইরূপ তাঁহার সকল সন্তানেরই অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করিয়াছেন। জয়রামবাটীতে ইদানীং ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া তাঁহার শরীর অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল; সে-সময় হয়তো মধ্যাহ্নে বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় বহুদূর

হইতে দর্শনপ্রার্থী পথশ্রান্ত ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জননী তখনই তাঁহার পরিচর্যার প্রয়োজনের জন্য বিশ্রাম ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের শতজনের শত আবদার। কেহবা মায়ের হাতের অন্নগ্রহণ না করিয়া জলগ্রহণ করিবেন না—এই সঙ্কল্প করিয়াছেন, মা তখনই রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলেন; কেহবা ধূলিপায়ে মায়ের চরণপূজা করিয়া পরে প্রসাদান্ন গ্রহণ করিবেন বলিয়া আবদার ধরিয়াছেন, স্নেহময়ী সন্তানের সে-আবদারও পূরণ করিতেছেন। শত অবুঝ সন্তানের মায়ের উপর শত দাবি। সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি করুণাময়ী জননী সকল প্রকারেই স্নেহসুধায় তাহাকে শান্ত করিতেছেন—মায়ের এই ছবি প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু আবার অনুরূপ দৃঢ়তারও অভাব ছিল না। তাঁহার অসুস্থ অবস্থায় একদিন একজন গৈরিকবস্ত্রপরিহিতা মহিলা তাঁহার চরণদর্শন করিতে আসিয়াছেন। তিনি মায়ের নিকট দীক্ষা লইবার জন্য অতিশয় ব্যাকুল হইয়া আসিয়াছেন । মা তখন খাটের উপর শুইয়াছিলেন। তিনি যেমন পদধূলি লইবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন, অমনি মা যেন সন্ত্রস্তা হইয়া বলিলেন ঃ "কর কি, কর কি, পায়ে হাত দিও না; গৈরিকধারিণী সন্ন্যাসিনী তুমি, পায়ে হাত দিয়ে কেন আমাকে অপরাধী কর?" মেয়েটি নিতান্ত দুঃখিতা হইয়া উত্তর করিলেন ঃ "অনেক আশা করে যে আপনার কাছে এসেছি, আপনি আমায় দীক্ষা দেবেন বলে।"

মা বলিলেন ঃ "ব্যস্ত হলে কি কিছু হয়, মা? সময় হলে নিজেই হবে। দীক্ষা কি তোমার হয়নি? গেরুয়া কে দিয়েছেন? যাঁর কাছে সাধন পেয়েছ, নিষ্ঠা করে তাঁকেই ধরে থাক, সময়ে হবে।"

মেয়েটি অবশেষে বলিলেন ঃ "গেরুয়া কেউ দেননি, আমি নিজেই ধারণ করেছি। আর যে-সাধনপ্রণালী পেয়েছি তাতে মনে শান্তি পাচ্ছি না।"

মা তখন বলিলেন ঃ "আজ আমি বড় অসুস্থ, তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারলুম না বলে মনে দুঃখ করো না। কিন্তু মা,

এটি মনে রেখো, গেরুয়া পরা খুব সহজ নয়। এই যে সব আশ্রমের ত্যাগী ছেলেরা ঠাকুরের জন্য সব ছেড়ে এসেছে, এরাই গেরুয়া পরার অধিকারী। গেরুয়া পরা কি যার-তার কাজ?" এইসব বলিয়া মিষ্টিকথায় তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

কিন্তু মা তাঁহাকে পায়ের ধুলা লইতে দিলেন না।

মায়ের পায়ে বাতের ব্যথা ছিল, সেজন্য মা পা ছড়াইয়া বসিতেন। সে-সময় হয়তো কোন সৌভাগ্যবতীকে নিজেই বলিতেন : "পা-টা একটু টিপে দাও তো মা, বড় কনকন করছে।"[১]

উদ্বোধনের বাড়ির কাছে একটি ডালের গোলা ছিল, সেই গোলায় হিন্দুস্থানী স্ত্রী-পুরুষ বাস করিত। মা ঘরের পিছনে ঝুলন্ত বারান্দায় বসিয়া রোদ পোহাইতেন। ছোট ছোট ছেলেরা খেলা করিত—তা দেখিতেও ভালবাসিতেন।

একদিন একজন হিন্দুস্থানী তাহার স্ত্রীকে লাঠি দিয়া মারিতেছে আর বৌটি উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিতেছে। মা এই কাণ্ড দেখিয়া রেলিং ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার মাথার কাপড় খুলিয়া পড়িল। স্বভাবতঃ মৃদুভাষিণী মা উচ্চৈঃস্বরে সেই লোকটিকে "লাঠি ফ্যাল মিনসে, খবরদার ওর গায়ে হাত তুলবিনে" বলিয়া এমন প্রচণ্ড ধমক দিলেন যে, লোকটি থতমত খাইয়া লাঠি ফেলিয়া জোড়হাতে মাকে প্রণাম করিয়া কোথায় পালাইয়া গেল। আর তাহাকে দেখিতে পাওয়া গেল না। এর আগে সে প্রায়ই বৌকে মারিত, কিন্তু সেইদিন হইতে আর কখনও বৌকে মারে নাই।

"মাকে দেখে আপনার কী মনে হয়েছিল?"—যাঁহারা মাকে চোখে দেখেন নাই তাঁহারা যদি এই প্রশ্ন করেন, তাহার মধ্যে জানিবার জন্য ব্যাকুলতাই অবশ্য প্রকাশ পায়। কিন্তু যাহারা চোখে দেখিয়াছে সেই মাতৃমূর্তি, তাহারাই কি জানিতে পারিয়াছে তাঁহাকে?

---

১ এই অনুচ্ছেদ এবং পরবর্তী চারটি অনুচ্ছেদ 'দেশ' পত্রিকায় ৪ পৌষ ১৩৬০ তারিখে প্রকাশিত 'জননী সারদেশ্বরী' প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত।—সম্পাদক

শুধু এইটুকুই জানিয়াছে, তিনি এমন একজন যাঁহার কাছে কোন সঙ্কোচ থাকে না, সমস্ত মনটাই মেলিয়া ধরিতে পারা যায়। মানসিক সকল জটিলতার দ্বন্দ্ব যিনি একটিমাত্র কথায় মিটাইয়া দিতে পারেন, যাঁহার সান্নিধ্যে আসামাত্র মন শীতল হইয়া যায়—মায়ের ইহাই প্রকৃত স্বরূপ।

মা অসুস্থ থাকিতেই [একবার] তাঁহার জন্মতিথির দিন আসিল। সেদিন তাঁহার চরণপূজা করিতে বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছে। মা তখন খুব দুর্বল, বারবার জ্বর হইতেছিল। মা পালঙ্কে অবগুণ্ঠিতা হইয়া বসিয়া আছেন, শত শত ভক্ত চরণপূজা করিতে আসিতেছেন। মা সস্নেহে সকলের পূজা গ্রহণ করিতেছেন। ত্বরা সত্ত্বেও পূজায় বহু সময় লাগিল, কিন্তু মা সমভাবেই প্রসন্নময়ীরূপে সন্তানদের অর্চনা গ্রহণ করিতেছেন। এই দৃশ্যটি আজও মনে অঙ্কিত রহিয়াছে।

ঠাকুরের সহিত শ্রীশ্রীমার সরল ভাবের বিষয়ে অতিশয় সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। ঠাকুর যেমন গলার ব্যথা কিসে সারে ইহাকে-তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, মাও সেইরূপ অসুখের সময় "কি অসুখ হলো বাপু, একি আর সারবে না, মা! আমায় যে বিছানায় পেড়ে ফেললে। কি করি বল দেখি!" ইত্যাদি বলিতেছেন। আবার শশধর তর্কচূড়ামণি অসুস্থ স্থানে মানসিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া অসুখ সারাইবার কথা বলিতেই ঠাকুর যেমন "পণ্ডিত হয়ে ওকি কথা বল গো! যে-মন সচ্চিদানন্দকে দিয়েছি তা কি আবার ফিরিয়ে এনে হাড়-মাসের খাঁচায় দেওয়া যায়?"—দৃঢ়ভাবে এই উত্তর দিয়াছেন, মাকেও তেমনি যদি কেহ অনুনয় করিয়া প্রার্থনা করিয়াছে : "আপনি একবার বলুন অসুখ সেরে যাবে, তাহলে নিশ্চয় অসুখ সেরে যাবে।"—তাহা হইলে "তা কি বলতে পারি মা? ঠাকুর যা করেন তাই তো হবে; আমি আর কি বলব?"—ইহা ভিন্ন অন্য উত্তর পাওয়া যায় নাই। যদি কেহ জিদ করিয়া বলিয়াছে : "আপনি একবার মুখে বলুন, তাহলে নিশ্চয় অসুখ সেরে যাবে।"—তাহা হইলেও "আমি কি

তা বলতে পারি? ঠাকুর যা করেন তাই হবে।"—তাঁহার এই একই উত্তর ছিল।

এই অসুখের সময় উদ্বোধন অফিসে মায়ের জন্মতিথির দিনে মায়ের সেই ছবিটি মনে পড়ে। অবগুণ্ঠিতা মা দাঁড়াইয়া আছেন, যেন একখানি প্রতিমা। ভক্তের পর ভক্ত আসিয়া পদপ্রান্তে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতেছেন। স্বামী সারদানন্দ ঘড়ি-হাতে দাঁড়াইয়া আছেন দুয়ারের কাছে। বারবার বলিতেছেন ঃ "পাঁচ মিনিটের বেশি কেউ সময় নিও না, অনেক লোক গলিতে দাঁড়িয়ে আছে, সকলকেই সময় দিতে হবে।"[২]

স্বামী সারদানন্দ প্রতিদিন স্নানের পর মাকে একবার প্রণাম করিতে আসিতেন, মা অবগুণ্ঠন দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। অসুখের সময় আবার তিনিই মায়ের সেবা করিয়াছেন, আর মা "শরৎ, শরৎ" বলিয়া তাঁহাকে ডাকিয়াছেন। ছোট মেয়ের মতো "আর তেতো ওষুধ খেতে পারি না বাবা" বলিয়া আবদার করিয়াছেন, "বাবা, তোমার ঠাণ্ডা হাতটা একবার আমার পিঠে বুলিয়ে দাও" বলিয়াছেন। এই দেখিয়া বেশ বোঝা যায়, মা ও ছেলের মধ্যে অবগুণ্ঠনের দূরত্ব কেবল মার স্বাভাবিক লজ্জাশীলতার প্রকাশ মাত্র, বাস্তবিক অন্তরে অন্তরে কোন দূরত্বই ছিল না।

বাগবাজারে উদ্বোধন কার্যালয়ে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে ভগিনী নিবেদিতা ও ক্রিশ্চিয়ানা (ভগিনী ক্রিস্টিন) দিনের মধ্যে একবারও অন্ততঃ তথায় গিয়া তাঁহার নিকট কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিতেন। নিতান্ত বালিকা যেমন মায়ের মুখের দিকে আনন্দে চাহিয়া থাকে, নিবেদিতাও ঐ সময়ে সেইরূপভাবে 'মাতাদেবী'র [নিবেদিতা এবং ক্রিশ্চিয়ানা মাকে 'মাতাদেবী' বলিতেন] মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। ভগিনী নিবেদিতা—যাঁহার ন্যায় তেজস্বিনী রমণী রমণীকুলে দুর্লভ, যাঁহার বুদ্ধির আলোকে প্রদীপ্ত অন্তর্ভেদী নয়নের দৃষ্টি দেখিলে মনে হইত

২ এই অনুচ্ছেদ ও পরবর্তী অনুচ্ছেদটি 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত পূর্বে উল্লিখিত (পাদটীকা ১ দ্রঃ) 'জননী সারদেশ্বরী' প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত।—সম্পাদক

তাহা যেন জগতের সকল রহস্য উদ্‌ঘাটনেই সমর্থ—মাতাদেবীর নিকট অবস্থিতা তাঁহাকে দেখিলে যেন পঞ্চমবর্ষীয়া নিতান্ত শিশুপ্রকৃতি, একান্ত মাতৃনির্ভরপরায়ণা বালিকা বলিয়া মনে হইত। মাতাদেবী যখন তাঁহার দিকে সস্নেহ হাস্যে চাহিতেন তখন মায়ের আদরে বালিকার মতো তিনি একেবারে গলিয়া যাইতেন। মা যে-আসনে বসিতেন, নিবেদিতা যেদিন সেই আসনখানি পাতিয়া দিবার অধিকার পাইতেন, সেদিন তাঁহার যে-আনন্দ হইত, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে—সে-আনন্দ তাঁহার মুখের দিকে ঐ সময়ে চাহিলেই কেবল বুঝা যাইত। পাতিবার পূর্বে আসনখানিকে তিনি বারংবার চুম্বন করিতেন এবং অতি যত্নে ধুলা ঝাড়িয়া পরে উহা পাতিতেন; তাঁহার ভাব দেখিয়া তখন বোধ হইত, মাতাদেবীর ঐটুকু সেবা করিতে পাইয়াই যেন তাঁহার জীবন সার্থকজ্ঞান করিতেছেন।[৩]

মাতাদেবী একদিন বিদ্যালয় দেখিতে আসিবেন স্থির হইয়াছিল। ঐকথা শুনিয়া অবধি নিবেদিতার কার্যের ও আনন্দের যেন আর বিরাম নাই। বিদ্যালয়ের সমস্ত ঘরগুলি ঝাড়াইয়া-ঝুড়াইয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন, পত্র-পুষ্প আনাইয়া গৃহদ্বারে টাঙাইয়া শোভাবর্ধন করিলেন। মাতাদেবী কোথায় বসিয়া মেয়েদের সহিত আলাপ করিবেন, মেয়েরা তাঁহাকে কি উপহার দিবে, কি শুনাইবে, কেমন করিয়া সম্বর্ধনা করিবে ইত্যাদি সকল বিষয় স্থির করিতে তাঁহার আর বিন্দুমাত্র সময় রহিল না। তাহার পর মা যেদিন বিদ্যালয়ে আসিবেন, নিবেদিতা সেদিন যেন আনন্দে একেবারে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছেন; সকল বস্তু যথাস্থানে আছে কিনা দেখিতে এখানে-ওখানে ছুটাছুটি করিতেছেন, শিশুর মতো অকারণে কেবলই হাসিতেছেন, আবার কখনো-বা আনন্দে অধীর হইয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীদিগের এবং কখনো দাসীর পর্যন্ত গলা জড়াইয়া আদর করিতেছেন।

---

৩ এই অনুচ্ছেদ এবং পরবর্তী অনুচ্ছেদটি লেখিকার 'নিবেদিতা' (চতুর্দশ সংস্করণ থেকে 'নিবেদিতাকে যেমন দেখিয়াছি' শিরোনামে প্রকাশিত) গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।—সম্পাদক

শ্রীশ্রীমার স্বরূপ ভাষায় তুলি দিয়া আঁকিতে পারি—এমন ক্ষমতা আমার নাই। আমি যখন মার দর্শন পাই নাই, আমার মেয়ে[৪] তখন নিবেদিতা স্কুলে পড়িত, তাহার কাছে প্রথম মায়ের প্রত্যক্ষ সংবাদ পাই। ইতিপূর্বে কেবল মনে কল্পনা লইয়াই তৃপ্ত থাকিতাম। আমার মেয়ে প্রথম আসিয়া আমাকে তাঁহার প্রত্যক্ষ সংবাদ জানাইল। সে বলিল ঃ "মা, মাকে আমরা দর্শন করতে গিয়েছিলুম, তিনি যে কত সুন্দর, কত ভাল তুমি দেখলে বুঝতে পারবে। আমার এত ভাল লেগেছে মা, সে আর কী বলব! কেবলই মনে হচ্ছিল, তুমি যদি একবারটি তাঁকে দেখতে!" তাহার এই কথা শুনিয়া খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া তাহার কাছে মায়ের মধুর প্রসঙ্গ জিজ্ঞাসা করিলাম। সেও আনন্দের সহিত বলিল—কেমন তিনি খাইতে বসিয়া হাসিতে হাসিতে বালিকাদের সম্ভাষণ করিতেছিলেন, অল্পাহারের জন্য গোলাপ-মার কাছে তিরস্কৃত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছিলেন, সকলকে তাঁহার প্রসাদ কত স্নেহের সঙ্গে হাতে হাতে ভাগ করিয়া দিতেছিলেন।—সেই ছবিটি যেন তাহার বর্ণনায় মনের মধ্যে আঁকা হইয়া গেল। সেইদিন হইতে তাহার কাছে মায়ের কথা প্রত্যহ শুনিতে পাইতাম, আর মনে অভিমান প্রবল হইয়া উঠিত, কেবল মনে হইত—সবাইকে আপন করে নিয়ে আমায় কেন এতদূরে রেখেছেন? অবশেষে একদিন বাঁধ ভাঙিয়া গেল। মায়ের দর্শন পাইলাম।

আজ তিনি দুর্লভ, তিনি ধ্যানগম্য। ১৩২৭ সালের ৪ঠা শ্রাবণ রাত্রি ১টা ৩০ মিনিটের সময় চিন্ময়ী জননী মৃন্ময় ঘট ভাঙিয়া দিয়াছেন। জড়দৃষ্টি আজ তাঁহার দর্শনের অধিকার হারাইয়াছে, কিন্তু জগৎ তাঁহার পাদস্পর্শে পবিত্র হইয়া কী সম্পত্তি লাভ করিয়াছে, তাহাই অনুভব করিবার আজ সময় আসিয়াছে।* □

---

৪ নির্ঝরিণী সরকার।—সম্পাদক

* উদ্বোধন, ৯৭তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আষাঢ় ১৪০২, পৃঃ ২৬৯-২৭২

মায়ের কথা

নির্ঝরিণী সরকার

নির্ঝরিণী সরকার (১৮৯৪-১৯৬৩) ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্যা। একদিন মা পরম স্নেহে তাঁকে বলেছিলেন : "তুমি মন্ত্র নেবে?" মায়ের সেই অযাচিত করুণায় তিনি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। সেদিনই মহামন্ত্র লাভ করেছিলেন তিনি। (দ্রঃ রচনা-সংগ্রহ—নির্ঝরিণী সরকার, সম্পাদনা : চিত্রা দেব, ১ম সং, ১৯৯১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃঃ ৯) নির্ঝরিণীর মা ছিলেন সরলাবালা সরকার, স্বামী 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক প্রফুল্লকুমার সরকার, পুত্র অশোককুমার সরকারও ছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক। তিনি ছিলেন দেশপ্রেমিক এবং সুলেখিকা। লেখার দিকটি তিনি পেয়েছিলেন মা সরলাবালার কাছে, কিন্তু দেশপ্রেমের অগ্নিমন্ত্রে তিনি দীক্ষিত হয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতার কাছে, যেমন হয়েছিলেন তাঁর মা-ও। নির্ঝরিণী ছিলেন ভগিনী নিবেদিতার বিদ্যালয়ের ছাত্রী। সেই শিক্ষা তাঁর চরিত্র এবং ভবিষ্যৎ জীবন ও কর্মের ওপর গভীর প্রভাব রেখেছিল। রবীন্দ্রনাথেরও তিনি স্নেহধন্যা ছিলেন।—**সম্পাদক**

প্রথম যখন মাকে দর্শন করবার সৌভাগ্য লাভ করি তখন আমার বয়স খুবই কম, মাকে বোঝবার বা ধারণা করবার কোন ক্ষমতাই তখন আমার হয়নি। আমি সে-সময় নিবেদিতা স্কুলের ছাত্রী ছিলাম। মাকে দর্শন করার সৌভাগ্য আমি তখনো লাভ করিনি, কিন্তু আমার আগে যেসব মেয়েরা এখানে শিক্ষালাভ করবার জন্য এসেছিল, আমার সেইসব স্কুলের সঙ্গীদের কাছে প্রায়ই মায়ের কথা শুনতাম। তাদের মধ্যে অনেকেই অনেক আগে থেকেই মাকে দেখবার, তাঁর কথা শোনবার, তাঁর আদর ও স্নেহ এবং তাঁর হাতের প্রসাদ পাওয়ার

সৌভাগ্য লাভ করেছিল। তারা অনেক সময় নিজেদের মধ্যে মায়ের কথা বলাবলি করত। তাদের মধ্যে আমার সমবয়সী কেউ কেউ বলত : "আজ মাকে স্বপ্নে দেখতে পেয়েছি।" কেউ কেউ বলত : "যখনই খুব মুশকিল হয়, মায়ের সঙ্গে মনে মনে কথা বলি, মাকে সব জানাই; অমনি যেন মার কথা শুনতে পাই, মা যেন কত আদর করেন।" এইসব শুনে শুনে আমারও মনে মনে মাকে দেখবার জন্য খুবই ইচ্ছা হতো আর মনে মনে ছবি আঁকতাম, মা কেমন দেখতে? আমার ছেলেমানুষ-মনে মাকে যেন এক আশ্চর্য অনুভূতির প্রত্যক্ষরূপিণী বলে মনে হতো। একদিন হঠাৎ মাকে দেখবার সৌভাগ্য আমারও লাভ হলো। মা তখন উদ্বোধনে। সুধীরা-দি[১] যিনি আমাদের স্নেহময়ী বড় বোনের আসন গ্রহণ করেছিলেন, তিনি স্কুলের ছুটির পর সর্বদাই মায়ের কাছে যেতেন। সেদিন স্কুলের ছুটির পর কয়েকটি মেয়েকে মায়ের বাড়ী যাওয়ার সময় সঙ্গে নিলেন, সেইসঙ্গে আমাকেও নিলেন। সেদিন যে কী আনন্দ হলো বলে বোঝাতে পারব না। মাকে দেখতে যাচ্ছি, কেমন দেখব—সমস্ত রাস্তা তা-ই ভাবতে ভাবতে চলেছি। মা উদ্বোধনের সেই ঠাকুরঘরের রাস্তার দিকের বারান্দায় দরজার সামনে বসেছিলেন। আর কয়েকজন মহিলা তাঁর চারপাশে বসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন একখানি ধর্মগ্রন্থ পড়ে মাকে শোনাচ্ছিলেন। পড়তে পড়তে তাঁরা পাঠ্যবিষয় নিয়ে মধ্যে মধ্যে দু-একটি আলোচনাও করছিলেন, মা-ও সেইসঙ্গে দু-একটি মন্তব্য করছিলেন। সুধীরা-দির সঙ্গে আমরা মাকে প্রণাম

---

১ সুধীরা বসু—ভগিনী নিবেদিতার বিদ্যালয়ে ভগিনীর অন্যতম সহকারিণী, পরে বিদ্যালয়ের পরিচালনার দায়িত্ব তঁর ওপর পড়েছিল। তিনি ছিলেন শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী সারদানন্দের বিশেষ স্নেহের পাত্রী। তঁর দাদা ছিলেন অগ্নিযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী অরবিন্দের প্রধান সহকারী দেবব্রত বসু। মানিকতলা বোমার আসামী দেবব্রত বসু পরে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করেছিলেন, নাম হয়েছিল—স্বামী প্রজ্ঞানন্দ। তিনি ছিলেন কবি এবং মননশীল লেখক। অগ্নিযুগের অন্যতম মুখপত্র 'যুগান্তর' পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করতেন। তিনি একসময় 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদকও ছিলেন।—সম্পাদক

করে একপাশে বসতে মা সস্নেহে সুধীরা-দিকে বললেন : "এই যে সুধীরা, এস এস, আজ মেয়েরাও যে এসেছে!" আমাদের দিকে চাইলেন, কী যে স্নেহ সেই চোখের দৃষ্টিতে, আর সেই হাসিতে। আমি তাঁকে কেমন দেখেছিলাম, কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন, আমি তার উত্তর দিতে পারব না। আমার খেই হারিয়ে যাবে। সে এক অপূর্ব অনুভূতি, সে-অনুভব ভাষা দিয়ে বর্ণনা করা যায় না। কেবল একটিমাত্র কথাই বলতে পারি—এত ভাল লাগল যে, যতক্ষণ ছিলাম, আমি অবাক হয়ে তাঁকেই দেখেছি। যেসব মেয়েরা মায়ের চারপাশে বসেছিলেন, মা যেন তাঁদেরই মতো, তাঁদের একজন। বাইরে কোনরকম মহিমা গরিমার বিন্দুমাত্রও প্রকাশ নেই, অথচ কী অপূর্ব মহিমা মাকে ঘিরে আছে! এত স্বাভাবিক এবং সকলের একজন হয়েও তিনি যে সম্পূর্ণ আলাদা—এই অনুভব করতে একটুও দেরি হয় না।

এর পরে আরও কয়েকবার মাকে দেখতে পাওয়ার সৌভাগ্য আমি লাভ করেছিলাম। সবচেয়ে আশ্চর্য মনে হতো তাঁর সেই অদ্ভুত সরলতা আর প্রত্যেকের প্রতিই অসীম করুণামাখা ভালবাসা, যেন স্নেহ-ভালবাসার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি—মূর্তিমতী করুণা আমাদের মা। মনে হয়েছিল, শত শত অপরাধ ও গ্লানিতে পরিপূর্ণ আমাদের মন। মা যেন আপনা হতেই আমাদের মনের এইসব গ্লানি, এই তাপ দূর করবার জন্য করুণা-ছলছল নেত্রে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা নেই, কোন অলৌকিকতা নেই, এত সহজ মা যেন আমাদের ঘরেরই মা। আমাদের কল্যাণের জন্য, সুখ-সুবিধার জন্য তিনি সদাই ব্যস্ত। কী আশ্চর্য সেই সরলতা! তাঁর সমস্ত সত্তাই যেন ঠাকুরের পায়ে বিলীন হয়ে গেছে, অহং বলতে যেন কোনকিছুই তাঁকে স্পর্শমাত্রও করতে পারে না। একবার আমি উদ্বোধনে মাকে প্রণাম করতে গিয়েছিলাম, সেইসময় একজন অতি বৃদ্ধ মৈথিলী দরিদ্র ব্রাহ্মণ দূর দেশ থেকে মাকে প্রণাম করতে এসেছিলেন। মার কাছে যখন তাঁকে প্রণাম করতে ওপরে আনা

হলো, তখন দেখি সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মায়ের চরণ দর্শন করে আবেগে কাঁপছেন আর জোড়হাত করে 'মাতাজী মাতাজী' ছাড়া কোন কথাই বলতে পারছেন না। ব্রাহ্মণটি প্রণাম করে চলে গেলে মা সবিস্ময়ে ঠাকুরের ছবির দিকে দেখিয়ে আমাদের বললেন : "আহা, ঠাকুরের কী আশ্চর্য মহিমা, কোন্ দূর দেশ থেকে এসেছে শুধু ঠাকুরের টানে ঠাকুরের কাছে।" ঠাকুরের এই দয়া স্মরণ করে মায়ের মুখে যে আশ্চর্য বিস্ময়, আনন্দ ও ভক্তির ছবি দেখেছি তা আমি ভুলতে পারিনি। মায়ের নিজের সম্বন্ধে সেখানে কোন চিন্তারই স্থান নেই। একদিকে মা যেমন মূর্তিমতী সরলতা, আবার আরেকদিকে মায়ের মতো অপূর্ব বিচারবুদ্ধিও কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। একাধারে বালিকার মতো সরলা লজ্জাশীলা কুলবধূ, আবার অন্যদিকে অপরাজিতা শক্তিময়ী। মায়ের কথা যা পড়েছি, তাতে অপার স্নেহকোমলহৃদয়া মায়ের তেজস্বিতার কথা পড়লে আশ্চর্য মনে হয়। যাকে সবাই মন্দ বলে পরিত্যাগ করেছে—তাকেও তিনি কোলে টেনে নিয়েছেন, লোকের কথা তাঁর কাছে সম্পূর্ণ তুচ্ছ হয়ে গিয়েছে। শরণাগত-বৎসলা তিনি, যে তাঁর শরণ নিয়েছে সে যত বড় অন্যায়ই করুক, তখনই তাঁর কৃপাকণালাভে ধন্য হয়েছে। আর মা ছিলেন অন্তর্যামিনী, তিনি সকলের অন্তরই দেখতেন, বাইরের কাজ দেখে কখনো বিচার করেননি।

সিস্টারের[২] একান্ত অনুরোধে শ্রীশ্রীমা একদিন আমাদের স্কুলে[৩] এসেছিলেন। দুর্গাপূজার সময় দেবীকে গৃহে আনলে আমরা যেভাবে অনুষ্ঠান করি, সিস্টারও সেদিন ঠিক সেইভাবে দুয়ারে মঙ্গলঘট, আমের শাখা, সশীষ ডাব, কলাগাছ প্রভৃতি স্থাপন করেছিলেন। শ্রীশ্রীমা যখন গোলাপ-মা প্রভৃতিকে সঙ্গে নিয়ে স্কুলের দুয়ারে গাড়ি থেকে নামলেন, তখন সিস্টার সেইখানেই হাঁটু গেড়ে বসে তাঁর পায়ের ওপর মাথা রাখলেন। শ্রীশ্রীমাও গভীর স্নেহে তাঁর মাথার

---

২ সিস্টার নিবেদিতা—সম্পাদক

৩ সিস্টার নিবেদিতার স্কুল।—সম্পাদক

ওপর হাত রাখলেন। সিস্টার সেসময় যেন অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। আরেকদিন সিস্টারের সঙ্গে নৌকায় দক্ষিণেশ্বর থেকে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। সিস্টার সেদিন আমাদের বলেছিলেন : "যদি ঝড়-বৃষ্টি হয়ে নৌকা ডোবার মতো হতো, সেসময় তোমাদের কি মনে হতো, খুব ভয় হতো? কিন্তু আমি চাই যে, তোমরা একান্ত মনে সম্পূর্ণভাবে মায়ের ওপরে নির্ভরশীল হও, একেবারে ছোট্ট শিশুর মতো—শিশু যেমন মহাবিপদেও নির্ভয়ে মায়ের কোলে হাসে। যাকিছুই হোক না কেন, মা আছেন, আমরা কিছুতেই ভাবব না, কিছুতেই ভয় পাব না।"

মার কথার শেষ নেই, তাই একখানি মায়ের লেখা চিঠি দিয়ে মায়ের কথা শেষ করলাম। মা তাঁর একটি দীনা মেয়েকে লিখেছিলেন : "মা, ভগবান মনের ধন। যেখানেই থাক, তাঁকে আন্তরিক ডাকবে, যে তাঁকে আন্তরিক ডাকে সেই তাঁর আপনার।" * □

---

* আনন্দবাজার পত্রিকায় ২৭ ডিসেম্বর ১৯৫৩ তারিখে 'মায়ের কথা' শিরোনামে এই স্মৃতিনিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল। শেষ অনুচ্ছেদের আগের অনুচ্ছেদটি লেখিকার 'ভগিনী নিবেদিতা ও তাঁহার বালিকা বিদ্যালয়' শীর্ষক নিবন্ধ থেকে সংগৃহীত। উল্লিখিত নিবন্ধটি ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল (পুনঃপ্রকাশিত : 'উদ্বোধন', ৯৭তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৪০২, পৃঃ ৩২১-৩২২)।—সম্পাদক

মাতৃস্মৃতি

লাবণ্যকুমার চক্রবর্তী

"যত গুপ্ত তত ব্যক্ত"—জননী শ্রীশ্রীসারদাদেবীর জীবনবেদ তার এক সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অপূর্ব লজ্জাবতী গৃহস্থঘরের কুলবধূর মতো মহামায়া আপনাকে মায়ার আবরণে আবৃতা রাখিতেন। ব্রহ্ম-শক্তি, নর-নারী দেহধারী-দেহধারিণী—শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা। কিন্তু অপূর্ব ও অনন্ত ভাবের গুণতনু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবের বিকাশ ও বিলাস তদীয় পার্ষদগণের এবং মুমুক্ষু দর্শকগণের চক্ষে অল্পবিস্তর ধরা পড়িলেও মহাশক্তি ব্রহ্মময়ীর সমধিক ভাববিকাশ ও বিলাস সাধারণের চক্ষে ক্বচিৎ ধরা পড়িত। এত গুপ্ত এবং গভীর ছিলেন তিনি! শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদগণকে জিজ্ঞাসু ভক্তগণ শ্রীশ্রীমায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা কিছুই বলিতে চাহিতেন না। পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দ বলিতেন : "কে জেনেছে, কে বুঝেছে মাকে?" কথা শেষ করিয়া "জয় মা, জয় মা" বলিতেন। তাঁহারই স্বমুখে শুনিয়াছি, শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্ত ভাববিগ্রহ, মূর্ত বেদান্তবিগ্রহ, প্রধান বার্তাবহ পূজ্যপাদ স্বামীজী একবার মাকে দেখিতে বেলুড় মঠ হইতে বাগবাজারে রওনা হইয়াছেন। সঙ্গে আছেন গুরুভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দ। নৌকা করিয়া যাইতেছেন। তখন বর্ষাকাল। গঙ্গার ঘোলা জল দুকূল ভরাইয়াছে। স্বামীজীর শরীর ভাল নাই। গায়ে ১০২°-এর মতো জ্বর। হঠাৎ তুরীয়ানন্দ মহারাজ দেখিলেন, স্বামীজী গঙ্গার ঘোলা জল অঞ্জলি করিয়া পান করিতেছেন এবং মাথায় দিতেছেন। এরূপ করিলে আরও অসুস্থ হইতে পারেন—তুরীয়ানন্দজী এরূপ কথা বলায় স্বামীজী বলিলেন : "মার কাছে যাচ্ছি। কি জানি, দেহে প্রাণে কোথাও অপবিত্রতা যদি লুক্কায়িত থাকে তবেই সর্বনাশ ভাই! তাই প্রাণে বড় ভয়!"

স্বামীজীর এই কথায় আমরা সেই মহাশক্তিময়ী শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসঙ্গিনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় পাই। স্বামী বিবেকানন্দ যুগাচার্য, যোগাচার্য এবং যজ্ঞাচার্য, শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারার বা শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর প্রধান বার্তাবহ ও ভাষ্যকার। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় জানি, স্বামীজী সপ্তর্ষিমণ্ডলের প্রধান ঋষি। বিশ্বের কল্যাণের জন্য অশিব নাশ করিতে স্বয়ং শিব নরদেহে অবতীর্ণ। জাত্যভিমান বা জন্মগত সংস্কার বা সংস্কারপ্রসূত অহঙ্কারের বশবর্তী হইয়া তখন অনেক শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তও স্বামীজীকে লৌকিক দৃষ্টিতে দেখিতেন—কায়স্থ বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁহাদের কাহারও মনে উঠিত যে, কায়স্থের ছেলে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের সহিত একই সঙ্গে পূজাপ্রাপ্তির যোগ্য পাত্র কি? পূর্ববঙ্গের একদল ভক্ত তাই তাঁহাদের আশ্রমের ঠাকুরঘরে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের পটের সহিত স্বামীজীর পটকে স্থান দেন নেই। সেই খবর শ্রীশ্রীমায়ের কানে পৌঁছাইলে সেই ভক্তদের ব্রাহ্মণত্বের অভিমান চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়া দৃপ্তকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন : "যেখানে নরেনের পুজো হয় না, ঠাকুর সেখানে পুজো গ্রহণ করেন না।" স্বামী সারদানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ প্রমুখাৎ ইহা আমরা শুনিয়াছি। আরও একটি ঘটনার কথা প্রামাণ্য সূত্রে অবগত আছি। উহাও এখানে বলি। পূর্ববঙ্গেরই আর একদল ভক্ত তাঁহাদের আশ্রমের ঠাকুরঘরে একই সঙ্গে একই সারিতে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর পট রাখিয়া পূজা করিতেন। একবার তাঁহারা বাগবাজারে 'মায়ের বাড়ী'তে মাতৃসন্দর্শনে আসিয়াছেন। তাঁহাদের কাহারও কাহারও মনে একটি খটকা ছিল যে, শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের সহিত পূজাকালে ঐভাবে শিষ্যের একই সারিতে অবস্থান কি ঠিক? উহা কি শ্রীশ্রীমায়ের অভিপ্রেত? তাই তাঁহারা যাহা করিতেছেন তাহা খুব ভয়ে ভয়ে মাকে বলিলেন। দেখিলেন, মায়ের মুখখানি গম্ভীর হইয়া গেল। তাঁহারা উহাতে খুব ভীত হইলেন। তাহা হইলে ঐভাবে স্বামীজীর পূজা মায়ের অনুমোদিত নহে? হঠাৎ

মা গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন : "ঠাকুর থাকলে কি তা করতে দিতেন?" ভক্তকয়টির পা কাঁপিতে শুরু করিল। মা বলিয়া চলিলেন : "ঠাকুর থাকলে কি নরেনকে পাশে বসাতেন? তিনি নরেনকে কোলে নিয়ে বসতেন। নরেন যে তাঁর মাথার মণি!" আনন্দে ভক্তদের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ইহার পর কি আর কিছু বলিবার বা ভাবিবার থাকে?

স্বচক্ষে দেখিয়াছি এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছেও শুনিয়াছি, পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ মাকে দর্শন করিতে গেলে কাঁপিতে থাকিতেন। ভাল করিয়া কথা পর্যন্ত বলিতে পারিতেন না। সাধু নাগ মহাশয় 'মায়ের বাড়ী'র সিঁড়ি পর্যন্ত কাঁপিতে কাঁপিতে অগ্রসর হইলেও মায়ের মন্দির পর্যন্ত যাইতে পারিতেন না। তাঁহাকে একপ্রকার কোলে করিয়া লইয়া যাইতে হইত। এরূপ আরও বহু ঘটনা। তাই মায়ের সম্পর্কে আমরা কী বলিতে পারি, আর কী বলিবারই বা আছে? আমরা তো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, তুচ্ছাতিতুচ্ছ। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য বলিতে পারি না, তাঁহার পদাশ্রিত আমাদিগকে তাঁহার সম্বন্ধে অল্পাধিক কথা বলিতে হয় জিজ্ঞাসুগণের একান্ত আগ্রহে।

দেখিয়াছি, তখন শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাপ্রাপ্ত দীক্ষিত ভক্তগণ ছাড়া শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতি পর্যন্ত অন্য কাহাকেও দেওয়া হইত না। আজকাল অবশ্য ঘরে ঘরে, থিয়েটার-সিনেমা-হাটে-বাটে সর্বত্র মায়ের ছবি দেখা যায়। সংগোপনে থাকায় অভ্যস্থ মাকে তাঁহার পার্ষদগণ আরও সংগোপনে রক্ষা করিতেন, অবশ্য লোককল্যাণার্থেই নিঃসন্দেহে। পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ একবার আমার লেখা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে গিয়া বলিয়াছিলেন : "শ্রীশ্রীমায়ের কথা যদি উদ্ধৃত কর, তবে খুব হিসাব করে করবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা উল্লেখ করতে পার, কিন্তু তাও খুব সতর্কতার সঙ্গে করবে।"

ইদানীং আমরা নির্বাক বিস্ময়ে দেখিতেছি, ধর্মপিপাসু লোকসংখ্যা বিপুলভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারায় আকৃষ্ট হইতেছেন। তাঁহারই

পার্ষদদের মুখে শুনিয়াছি, শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন ঃ "দেখ, যে একবার মাত্র কায়মনোবাক্যে ভগবানকে ডেকেছে, তাকে এখানে আসতেই হবে।" তা-ই হইতেছে। যোগেশ্বর তিনি, তাঁর বাক্য ব্যর্থ হইতে পারে না।

স্বামীজী বলিয়াছেন, যে-শক্তির উন্মেষমাত্র সমগ্র জগৎজোড়া একটা জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে, তাহার পূর্ণ বিকাশ কল্পনা কর। আরও বিস্ময়ের উপর বিস্ময়ে দেখিতেছি, কিছুকাল যাবৎ যাঁহারা এই ভাবধারায় আকৃষ্ট, তাঁহাদের প্রধান আকর্ষণ শ্রীশ্রীমায়ের কথা জানিবার এবং শুনিবার। মা মহাশক্তি, তাঁহার বিকাশ-বৈভব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু লোকের অল্পই জানা। এমনকি কিছুই জানা নয়, শুধু নামমাত্র শোনা।

প্রায়-অপ্রকাশিত একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা মনে পড়িতেছে। ঘটনাটি শোনার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের কাছে। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের স্তোত্রগীতি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল তিনি মাকে ইহা শ্রবণ করাইবেন। মায়ের কাছে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে মা চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন ঃ "কি স্তোত্র? কার স্ত্রোত্র?" মহারাজ বিনীত কণ্ঠে বলিলেন ঃ "মা, আপনার স্তোত্রগীতি।" মা যেন খুবই বিস্ময়াভিভূতা হইলেন এবং বলিলেন ঃ "বাবা, আমার আবার কি স্তোত্র?" কিন্তু ভক্তপ্রবরের নির্বন্ধাতিশয্যে স্থিরভাবে শুনিতে লাগিলেন সেই প্রসিদ্ধ স্তোত্রগীতি— "প্রকৃতিং পরমাং" ইত্যাদি। অভেদানন্দ মহারাজ যখন গাহিলেন— "রামকৃষ্ণগতপ্রাণাং" তখন দেখা গেল, মা ইহা শুনিয়া স্পন্দনহীন হইয়া পড়িয়াছেন। "তন্নামশ্রবণপ্রিয়াং" উচ্চারিত হইবামাত্র তাঁহার দুচোখে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল। "তদ্ভাবরঞ্জিতাকারাং" বলার পর অভেদানন্দ মহারাজ দেখিলেন, মা আর সেখানে নাই, শ্রীশ্রীঠাকুর বসিয়া আছেন, অথবা মা নিজেই ঠাকুরে পরিণতা হইয়াছেন। মহারাজ হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া স্তোত্রগীতি গাহিতেছিলেন। তিনিও যেন তাঁহার মধ্যে রহিলেন না। তিনি আরও কি দেখিয়াছিলেন তাহা আমাদের

বলিয়া যান নাই। কিন্তু আমরা এই না-বলার মধ্যে অনেক কিছু নিত্যনূতনভাবে পাইতেছি।[১]

১৯১২, নভেম্বর মাস। কাশীধামে গিয়াছি। পরদিন বিকালবেলা শ্রীরামকৃষ্ণ-অদ্বৈতাশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, পূজ্যপাদ শ্রীম কি একটি গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন এবং কতিপয় শ্রোতা আশেপাশে বসিয়া শ্রবণ করিতেছেন। পূজ্যপাদ হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) পার্শ্ববর্তী খালি জায়গায় আপন মনে পায়চারী করিতে করিতে পাঠ শ্রবণ করিতেছেন।

আমার দিকে চোখ পড়িতেই মাস্টার মহাশয় তাঁহার স্বভাবসুলভ "এই যে, কখন? বসে পড়ুন, পরে কথা হবে।"—বলিলেন। আমি বসিলাম। কিছুক্ষণ পরে পাঠ শেষ হইলে বলিলেন : "গোপীগীতা পড়া আছে?" "নিয়মিতভাবে নয়, বিক্ষিপ্তভাবে পড়েছি।"—বলিলাম।

"পড়বেন, চমৎকার জিনিস।"

"পড়ব" বলিলাম আর মনে মনে হাসিলাম। চমৎকার তো বটেই! আরও চমৎকার আপনার কাছে। জানি তো, আপনি তাঁর ব্রজলীলার একজন অংশীদার ছিলেন।

জিজ্ঞাসাবাদের পর বলিলেন : "এই রাস্তার ওপারের বাড়ি লক্ষ্মীনিবাসে মাঠাকরুন আছেন, প্রণাম করে আসুন।"

---

১ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁর রচিত 'সারদা-স্তোত্র' শ্রীশ্রীমাকে শোনান বেলুড়ের নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়িতে। শ্রীশ্রীমা ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের মে মাসের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত প্রায় ছয়মাস এই বাড়িতে ছিলেন। ভক্তদের উদ্যোগ ও আর্থিক ব্যবস্থায় তাঁর জন্য এই বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। ঐ ছয়মাসের মধ্যে কোন একদিন অভেদানন্দ মহারাজ শ্রীশ্রীমাকে তাঁর স্তোত্রটি শুনিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমা স্তোত্রটি শুনে প্রসন্ন হয়ে মহারাজকে আশীর্বাদ করেছিলেন : "তোমার কণ্ঠে সরস্বতী বসবেন।" এইসময় শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গিনী ছিলেন প্রধানতঃ গোলাপ-মা ও যোগীন-মা এবং সেবক ছিলেন স্বামী যোগানন্দ। (দ্রঃ 'রামকৃষ্ণ মঠের চতুর্থ পর্যায়'—স্বামী প্রভানন্দ, উদ্বোধন, ৯৩তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৯৮, পৃঃ ২৯৭-২৯৮)—সম্পাদক

তখন বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণ দর্শন করিতে চলিলাম।

ক্যান্টনমেন্ট রোড অতিক্রম করিয়া লক্ষ্মীনিবাসের দিকে চলিলাম। ডানদিকে খালি, বামদিকে সারি সারি কাঁচা ঘরবাড়ি। বোঝা যায়, নূতন নূতন বাসস্থান। অল্পদূর, একশ-দেড়শ হাত হইবে গলিপথ। অর্ধপথে ব্রহ্মচারী রাসবিহারী মহারাজের সহিত দেখা। তিনি লক্ষ্মীনিবাস হইতে অদ্বৈতাশ্রমে যাইবেন। জিজ্ঞাসাবাদ হইল। আরও জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "মাস্টার মশায়ের কোন পরিবর্তন দেখলেন কি?" কোন্ পরিবর্তন বা কী পরিবর্তন আমি বুঝিতে না পারায় আরও দু-চার কথার পর বলিলেন ঃ "তাঁর খুবই প্রিয় একটি মেয়ে বম্বেতে কলেরায় মারা গেছে, কয়েক ঘণ্টা আগে মাত্র টেলিগ্রাম এসেছে। দেখুন, আমি তো সংসার ছেড়ে এসেছি—ব্রহ্মচারী, কিন্তু মনে হয় কোন নিকট আত্মীয়ের এরূপ আকস্মিক মৃত্যুসংবাদপ্রাপ্তির অল্প সময় পরেই এমন নির্বিকার থাকতে পারতাম না। মাস্টার মশাই গৃহী আর আমরা ত্যাগী—বুঝুন তিনি কত বড়!"

বুঝিলাম নির্বাক বিস্ময়ে। তারপর রাসবিহারী মহারাজ আমাকে শ্রীশ্রীমায়ের অবস্থান সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। দেখিলাম, আরও দুইজন যুবক আমাকে অনুসরণ করিয়া মাকে দর্শন করিতে চলিয়াছেন। বাড়ি কলিকাতার ভবানীপুরে। দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। মনে হইল, মাস্টার মহাশয়ের সঙ্গে আমার কথাবার্তা শুনিয়া মাকে দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছে।

নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। মেটে দোতলার বারান্দায় মা বসিয়া আছেন—রাসবিহারী মহারাজ বলিয়াছেন। কিন্তু কাহাকেও দৃষ্টিগোচর হইল না। একটি কোণে আপাদমস্তক মোটা বস্ত্রে আবৃত করিয়া একটি প্রাণী অনুমান করিতে পারি। নিজেদের মধ্যে কথা বলিতে লাগিলাম, একটু শব্দও করিলাম, কিন্তু কোন সাড়া নাই। অগত্যা একটু দূরে থাকিয়া প্রণাম করিলাম। এই প্রাণীটি যে মা তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। পায়ের অবস্থান

বুঝিতে না পারিয়া পদধূলির আশা ত্যাগ করিয়া নামিয়া আসিলাম। সঙ্গী দুজনও আসিলেন। মনটা ভারি খারাপ। বিশ্বেশ্বর ও গঙ্গা দর্শনে রওনা দিলাম চিত্তের ভার লাঘব করিবার জন্য।

বিশ্বনাথের গলিতে বিপরীত দিক হইতে আগত মাস্টার মহাশয়ের সহিত দেখা হইল। তিনি "এই যে" বলিয়া কাঁধে হাত রাখিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "মাকে দর্শন করা হলো?"

আমি ব্যথিত কণ্ঠে বলিলাম ঃ "মাস্টার মহাশয়, প্রণাম দূর থেকে হয়েছে। দর্শন হয়েছে একটি কাপড়ের পুঁটলির।" "সেকি!" বলিয়া তিনি সব কথা জানিয়া লইলেন। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন ঃ "আপনি একা ছিলেন?"

"না, আরও দুটি যুবক।"

"আপনার পরিচিত?"

"না, আপনার কথা শুনে তারাও গিয়েছিল মাকে দেখতে।"

মাস্টার মহাশয় হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন ঃ "সঙ্গদোষে আপনার মাতৃদর্শন হয়নি। আপনি গিয়েছিলেন মাতৃদর্শনে, আর ওরা গিয়েছিল পরমহংসের স্ত্রীকে দেখতে। পরমহংস তো নামকরা লোক—তাঁর স্ত্রী কেমন দেখবে।"

আমিও হাসিলাম। তারপর বলিলেন ঃ "কাল সকালে গঙ্গায় নেয়ে কিছু ফুল-বেলপাতা, ফল, মিষ্টি নিয়ে যাবেন। একা, একা।" শব্দটি নিম্নস্বরে উচ্চারিত হইল। যেন গুহ্য কথা। "কেউ অনুসরণ করছে দেখলে ঘোরাঘুরি করে তাকে অতিক্রম করে যাবেন—একা একা।" তারপর তিনি অদ্বৈতাশ্রমের দিকে ও আমি বিশ্বনাথের মন্দিরের দিকে চলিয়া গেলাম।

পরদিন ভোরে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া দশাশ্বমেধ ঘাটের রাস্তা ভুল করিয়া প্রয়াগ ঘাটে উপস্থিত হইলাম। আমার জানা বৎসর দুই পূর্বে লোকান্তরিত এক সাধুর স্মৃতিমন্দির প্রয়াগ ঘাটে দেখিতে পাইলাম, যাহা পূর্বে অন্যান্য ঘাটে বৃথা অন্বেষণ করিয়াছিলাম। যাক, স্নানান্তে পথপার্শ্ব হইতে ফুল-বেলপাতা, কিছু ফল এবং ছানার মিষ্টি

লইয়া লক্ষ্মীনিবাসের দিকে অগ্রসর হইলাম। রাস্তায় কোন প্রতিকূল বা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিল না। বড় রাস্তা হইতে গলিপথে প্রবেশ করিতে গিয়াই দেখিলাম, লক্ষ্মীনিবাসের সদর দরজায় একজন অর্ধাবগুণ্ঠিতা স্ত্রীলোক গালে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ভাবিলাম, তবে কি মা? গত বৈকালের কথা মনে পড়িল। কাল আর আজ! এত সৌভাগ্য আমার হইবে কি? মা যেমন দূরদেশাগত সন্তানের আগমন-প্রতীক্ষায় পথের দিকে চাহিয়া থাকেন ঠিক তেমনি। ভাবিতে ভাবিতে একেবারে মায়ের সাক্ষাতে গিয়া নিজের অজ্ঞাতসারেই যেন মায়ের বুকের মাঝে ঢুকিয়া পড়িয়াছি। মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম ঃ "তুমি কি মা?"

"হ্যাঁ বাবা, আমি তোমার মা।"

"আমার মা!"

"হ্যাঁ, আমি তোমাদের সকলের মা।"

"আমাদের মা!"

"হ্যাঁ বাবা, আমি জগতের মা।"

মনে মনে ভাবিলাম, তাই বুঝি তুমি জগদম্বা। প্রণাম করিতে উদ্যত দেখিয়া মা বলিলেন ঃ "একটু অপেক্ষা কর বাবা।" বলিয়াই ডাকিলেন ঃ "কেষ্টলাল, ও কেষ্টলাল।" কৃষ্ণলাল মহারাজ (স্বামী ধীরানন্দ) ছুটিয়া আসিলেন। আমাকে তদবস্থ দেখিয়া আনন্দের হাসি হাসিলেন। ইনি আমার পূর্ব-পরিচিত আর ইঁহারা কোন ভক্তের প্রতি মায়ের কৃপাদৃষ্টি দেখিলে স্বতই আনন্দলাভ করেন। মা বলিলেন ঃ "ছেলের হাতের এসব নিয়ে ঠাকুরঘরে রাখ। আমি গঙ্গায় নেয়ে এসে ঠাকুরপূজায় ও ভোগে দেব।" কৃষ্ণলাল মহারাজের প্রসারিত হস্তে সমস্ত অর্পণ করিয়া আবার মাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইতেই আমাকে বলিলেন ঃ "আর একটু অপেক্ষা কর বাবা।" আর কৃষ্ণলাল মহারাজকে বলিলেন ঃ "এক-ঘটি গঙ্গাজল নিয়ে এস।" কৃষ্ণলাল মহারাজ খুব তাড়াতাড়ি পূজার উপকরণ ঠাকুরঘরে রাখিয়া এক-ঘটি গঙ্গাজল নিয়া আসিতেই মা বলিলেন ঃ "ছেলের হাত ধুয়ে দাও।"

তাহা হইল। তখন প্রাণ ভরিয়া প্রণাম করিলাম। হৃদয় আনন্দে ভরপুর। কিন্তু মনের কোণে একটু যেন সংশয়—কেন গঙ্গাজল? তবে কি অপবিত্র আমাকে মা পবিত্র করিয়া লইলেন? মনের কথা অন্তর্যামিনী মা জানিয়াছেন। মৃদু হাসিয়া বলিলেন ঃ "ঠাকুরের পূজার জিনিস তুমি যে-হাতে এনেছ—সে-হাত আমার পায়ে তো দেওয়া যায় না বাবা! তাই তোমার হাত ধোয়ানো হলো।"

আমি কোন উত্তর দিতে পারিলাম না। উদ্গত আনন্দাশ্রু ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা বৃথা হইল।

তারপর অনেক কথা। বাড়ি-ঘর পরিবারবর্গ সব কথা খুঁটাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি শৈশবেই মাতৃহারা শুনিয়া "আহা বাছা" বলিয়া আমার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন ঃ "আমি তো তোমার মা আছি বাবা।" আমি আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলিলাম ঃ "হ্যাঁ মা, আমি মা পেয়েছি।"

বিদায়গ্রহণকালে বলিলেন ঃ "যে-কদিন এখানে আছ, রোজ একবার করে এস। আমাকে না দেখলে 'মা' 'মা' বলে ডাক দেবে।" "আচ্ছা মা" বলিয়া ধীরে ধীরে চলিলাম। বারবার ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিলাম। দেখিলাম, মা দাঁড়াইয়া আছেন আমারই দিকে চাহিয়া। কান্নায় বুক ভাঙিয়া যাইতেছিল। "হ্যাঁ, আর একটু আছে"—আমি ফিরিয়া গিয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম। মা বলিলেন ঃ "আর কি বাবা?"

"আর কি চাই—তুমি জান না মা?"

উত্তরে মা বলিলেন ঃ "জানি বাবা। তবে এটি অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বরের এলাকা। তোমার কলকাতায় হবে—খোঁজ রেখ।"

এখানে আনুষঙ্গিকভাবে আরেকটি কথার অবতারণা করিতেছি। পরে জানিতে পারিয়াছি, কাশীধামে মা কাহাকেও দীক্ষাদান করিতেন না।

"হবে"। "হবে"! আর কি! আমার তখন সেই তেঁতুলতলার ভক্ত শান্তিরামের অবস্থা। বৈকুণ্ঠ-প্রত্যাগত নারদঋষি শান্তিরামের প্রার্থিত সংবাদ দিলেন—এই তেঁতুলগাছে যত পাতা আছে তত জন্ম পরে তোমার মুক্তি

হবে। শান্তিরাম আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন—হোক তত জন্ম, হবে তো। গাঁজাখোর শান্তিরাম গান ধরিলেন, নৃত্য করিতে লাগিলেন—"বৈকুণ্ঠে তোর ভিজল গাঁজা, শান্তিরাম তুই বগল বাজা।"

কিন্তু বড় রাস্তায় পড়িতে পড়িতে আমার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। ভাবিলাম কী বোকা আমি, জোর করিয়া ধরিয়া বসিলে হয়তো করুণাময়ী মা বলিতেন—অমুক দিন অমুক সময়ে এস।

মন খারাপ হইল। আবার সেই বিশ্বেশ্বরের গলিপথে—আবার সেই মাস্টার মহাশয়। আবার সেই—"এই যে!" আর কাঁধে হাত। "মাকে দর্শন হলো?"—প্রশ্ন। সব বলিলাম। মনের ভাবান্তরের কথা বলিলাম। মাস্টার মহাশয় জোর গলায় বলিলেন : "চন্দ্রসূর্য রসাতলে যাবে, পৃথিবী উলটে যাবে, তবুও মায়ের বাক্য ব্যর্থ হবে না।" আবার উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলাম। আজও কানে সেই কণ্ঠস্বর বাজে—"চন্দ্রসূর্য রসাতলে যাবে...তবু মায়ের বাক্য ব্যর্থ হবে না।"[২]

সন্ধ্যার দিকে অদ্বৈতাশ্রমে শ্রীম আমাকে দেখাইয়া পূজনীয় হরি মহারাজকে বলিলেন : "গতকাল ও আজকের যে-ঘটনা আপনাকে বলেছি তা এই ভক্তের।" হরি মহারাজ আমার দিকে সহাস্য বদনে চাহিয়া শুধু বলিলেন : "ধন্য"!

তারপর যথাকালে দেশে ফিরিলাম। প্রাণে দীক্ষালাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও মনে-প্রাণে কেমন একটা বেয়াড়া ভাব দৃঢ়মূল হইল যে, দীক্ষার জন্য শ্রীশ্রীমায়ের নিকট কিছুতেই যাইব না। মা বলিয়াছেন : "কলকাতায় তোমার হবে।"—এই বাণী ব্যর্থ করিব। অদ্ভুত খেয়াল বটে। তবুও ইহা আমাকে চাপিয়া ধরিল। ভক্তকবি শ্রীরামপ্রসাদের সেই ভাব—"আয় মা

---

২ শ্রীম বা মাস্টার মহাশয়ের সঙ্গে লেখকের কথাবার্তা ও সংশ্লিষ্ট মাতৃপ্রসঙ্গের বিস্তৃততর আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : 'শ্রীম-স্মৃতিকথা'—লাবণ্যকুমার চক্রবর্তী, উদ্বোধন, বৈশাখ ১৩৪২ এবং শ্রাবণ ১৩৪২। [স্মৃতিকথাটি স্বামী চেতনানন্দ সম্পাদিত 'শ্রীম সমীপে' গ্রন্থে (১৯৯৬, পৃঃ ৫৯-৬৮) প্রকাশিত হয়েছে।]—সম্পাদক

সাধনসমরে—দেখি মা হারে কি পুত্র হারে।" অবশ্য এক্ষেত্রে তুলনা চলে না। তবুও ভাব সেই একরূপই।

শ্রীশ্রীমা কলিকাতায় আসার পর তাঁহার আগমন-সংবাদ পাইলাম। সহধর্মিণী এবং আমার জনৈক অন্তরঙ্গ ভক্তবন্ধুর (তিনি কিছুকাল পূর্বে শ্রীশ্রীমায়ের কৃপালাভে ধন্য হইয়াছিলেন।) একান্ত পীড়াপীড়িতেও নড়িলাম না। দিন যায়। মাস যায়। প্রাণে দাবদাহন। তবুও সঙ্কল্পে অটল রহিলাম।

১৯১৩। শ্রীপঞ্চমীর রাত্রি ভোর হয় হয়। জাগিয়াছি, কিন্তু ঘুমের স্বাভাবিক আবেশ রহিয়াছে চোখে। কাক ডাকিতেছে—তাও শুনিতেছি। যথা-অভ্যস্ত বালিশে মাথা ঠেকাইয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে করিতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়াছি, এমন সময় গুরুগম্ভীর কণ্ঠ-বিনিঃসৃত ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল—"লাবণ্য—লাবণ্য—লাবণ্য!" চমকিয়া উঠিয়া চাহিয়া দেখিলাম, শিয়রের কাছে বদ্ধ দরজায় পিঠ রাখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর আমার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সস্মিত বদনমণ্ডল, বরাভয় করযুগল, দাঁড়ানো সমাধিস্থ সেই মূর্তি। প্রণাম করিবার বা কিছু বলিবার অবকাশ ছিল না। আনন্দে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছি। তিনি পার্শ্ববর্তী কক্ষে যাতায়াতের দরজার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিলেন ঃ "দ্যাখ"। মাটি হইতে হাত দুই উচ্চে দেখিলাম একটি নাম—শূন্যের মধ্যে লেখা রহিয়াছে। আগুন দিয়া লেখা জ্বলজ্বল করিতেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখের দিকে চাহিতেই বলিলেন ঃ "এই নাম জপ করে চল। সময়ে বীজ পাবি। জানিস তো, যেই নাম সেই তিনি—নাম আর নামী অভেদ।"

এতক্ষণে আমি ভাবাপ্লুত প্রাণে ঠাকুরকে প্রণাম করিলাম। প্রণাম করিয়া উঠিয়া ঠাকুরকে আর দেখিলাম না। তিনি অন্তর্ধান করিয়াছেন।

অগ্নিবর্ণ নাম। অনেক পরে দেবীস্তোত্রে এক জায়গায় পাইয়াছি—"তামগ্নিবর্ণাম্"।

ঠিক সেই সময়ে আমার একটি খুড়তুতো ভাই দরজায় ধাক্কা দিয়া বলিল ঃ "আমি অমুক জায়গায় যাচ্ছি দাদা।" তন্দ্রা ভাঙিল। স্বপ্ন শেষ!

কিন্তু কলিকাতায় শ্রীশ্রীমায়ের কাছে যাইব না—এই গোঁ ছাড়িলাম না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাটিয়া একটি বছর পূর্ণ হইল টানাটানির মধ্যে। পত্নী এবং বন্ধুর শুধু তাগিদ—"মায়ের কাছে যাও।" অতিষ্ঠ হইয়া পড়িলাম। পূজার ছুটি নিকটবর্তী, তখনও এই যাইবার তাগিদ আর আমার না যাইবার জেদ। দুর্গাপূজার অব্যবহিত পূর্বে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থার মধ্যে একপ্রকার বাধ্য হইয়া কথিত বন্ধু ও আরও কয়েকজন ভক্তবন্ধুর সহিত রওনা দিলাম। রওনা দিলাম বলা ঠিক হইল না, এরা যেন একটা পাগলকে পায়ে বেড়ি বাঁধিয়া নিয়া চলিল।

১৯১৪ সালের দুর্গাষষ্ঠীর দিন সকালবেলা। অন্তরঙ্গ বন্ধুটির সঙ্গে বাগবাজারে 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'তে (উদ্বোধন কার্যালয়ে) উপস্থিত হইলাম। 'মায়ের বাড়ী'তে ঢুকিয়াই দেখিলাম, বামদিকের কুঠুরিতে এবং আশপাশে অনেকগুলি ভক্ত স্ত্রী-পুরুষের সমাবেশ। জানিলাম, শ্রীশ্রীমা উপরে ঠাকুরঘরে পূজা করিতেছেন। পূজা শেষ হইলেই ভক্তেরা একে একে শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণ দর্শন ও স্পর্শন করিবেন। কুঠুরির পূর্বদিকে বিরাটবপু এক সন্ন্যাসী উপবিষ্ট। কুঠুরিতে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলাম। পূজনীয় শরৎ মহারাজ—স্বামী সারদানন্দ—আমার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন ঃ "কোথা হতে আসা হয়েছে? মুখখানি তো চেনা বোধ হচ্ছে!"

উত্তরে আমি বলিলাম ঃ "মহারাজ, কলকাতা বা এই অঞ্চলে আমি এই প্রথম এসেছি আর আপনি তো আমাদের ওখানে কখনো যাননি। কি করে চেনা মনে হলো বুঝতে পারছি না।"

তিনি কিছুক্ষণ চাহিয়াছিলেন আমার মুখের দিকে। বলিলেন ঃ "হ্যাঁ, ঠিকই চিনেছি, বস।" তাঁহার সম্মুখেই বসিয়া পড়িলাম।

ততক্ষণে শ্রীশ্রীমাকে প্রণামের জন্য উপর হইতে আহ্বান আসিয়াছে। মহারাজের নানা কথা চলিতে লাগিল। একবার বলিলেন ঃ "শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে এসেছ। কি দেবে মাকে?" সঙ্গের টাকাপত্র (তখনকার দিনের

কাঁচা রুপোর টাকা) গুনিয়া দেখিলেন। এক-টুকরো কাগজ নিয়া একটি হিসাব লিখিলেন। আমাকে খরচ এবং সম্ভাব্য খরচ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া একটি টাকা আমার হাতে দিয়া বলিলেন ঃ "মাকে বলবে, 'পূজার ভোগের জন্য কিছুই আনিনি মা, এই টাকা দিয়ে কিছু আনিয়ে দেবেন।' গ্রহণ করলে ধন্য হয়ে গেলে। সাধারণতঃ মা টাকা নেন না।" আমার একটু কিন্তু কিন্তু ভাব। মাত্র একটি টাকা? অন্ততঃ পাঁচটি দিলেও তো হইত? পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ আমার ভাব বুঝিয়া বলিলেন ঃ "দেখ, তোমার বাড়িতে ফেরা পর্যন্ত আমি হিসেব করে দিয়েছি।" তিনি কুড়ি টাকার মতো অতিরিক্ত ধরিয়াছেন পথের নানা প্রয়োজনের জন্য। ততক্ষণে তিনি কলিকাতায় থাকা ও ফেরৎ যাওয়ার সর্বাঙ্গীণ হিসাব লিখিয়াছেন। বলিলেন ঃ "মা কি বেশি টাকা হলেই প্রসন্না হবেন? প্রসন্নতা টাকাতে নয়।" বড় অন্তরঙ্গভাবে মহারাজ আমার সহিত গল্প করিতেছিলেন, যেন কতকালের পরিচয়! ওদিকে দর্শনার্থিগণ প্রণামান্তে প্রায় চলিয়া গিয়াছেন। আমি অধৈর্য হইয়া উঠিয়াছি। সর্বশেষ, হ্যাঁ আর একজনও বাকি নাই। মহারাজ তখন ব্রহ্মচারীকে বলিলেন ঃ "একে নিয়ে যাও।" দু-তিনটি সিঁড়ি উঠার পর তিনি ব্রহ্মচারীকে বলিলেন ঃ "মাকে বলবে, ইনি আমাদের আপনজন।"

আমি চমকিয়া উঠিলাম—এত ভাগ্য আমার! দেহ রোমাঞ্চিত হইল আনন্দে। ভাবাপ্লুত প্রাণে মায়ের শ্রীচরণ-সকাশে উপনীত হইলাম। দেখিলাম, দণ্ডায়মান আমাকে দেখাইয়া ব্রহ্মচারীজী মাকে কি বলিতেছেন। বোধহয়, পূজনীয় শরৎ মহারাজ যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন তাহাই। দেখিলাম, শ্রীশ্রীমা আমার দিকে প্রসন্নবদনে চাহিতেছেন।

মায়ের শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম করিলাম—"রাঙ্গাস্থলপদ্মসম রাঙ্গাপদতল।" বলিলাম শরৎ মহারাজের আদিষ্ট কথা কয়টি। মা দুই হাত বাড়াইয়া "দাও, বাবা দাও" বলিয়া টাকাটি গ্রহণ করিলেন। নিজেকে কৃতার্থবোধ করিলাম।

প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই বন্ধু শ্রীশ্রীমাকে আমার কথা বলিল এবং কাশীধামে দর্শনাদির কথা উত্থাপন করিল। তাহাতে শ্রীশ্রীমা বলিলেন ঃ "আমার মনে আছে, তবে আজ তো সন্ধ্যের দিকে মঠে যাব। তোমরাও তো যাবে। বিজয়া দশমীর দিন আমি এখানে ফিরে আসব। পরদিন সকালে তুমি গঙ্গায় নেয়ে আসবে, হয়ে যাবে।"

বন্ধুকে মা বলিলেন ঃ "ঐ দিন সকালে তোমার বন্ধুকে নিয়ে আসবে।" বন্ধু কিছুকাল পূর্বেই শ্রীশ্রীমায়ের কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, আগেই বলিয়াছি।

ইহার পর মায়ের দু-একটি জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়া আবার প্রণাম করিয়া নিচে নামিয়া আসিলাম। মা টাকাটি গ্রহণ করিয়াছেন জানিয়া শরৎ মহারাজ আনন্দে বলিলেন ঃ "ধন্য"! এই ছোট্ট দুই অক্ষরের শব্দ আমার কাছে অনন্ত ভাবব্যঞ্জক মনে হইল।

পূর্বে মায়ের প্রতিকৃতি ও কাশীধামে পূর্ব-উল্লিখিত দর্শনের পর স্থূলভাবে মাকে এই প্রথম দর্শন। পূর্বে শুনিয়াছিলাম, শরৎ মহারাজ অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির এবং অল্পভাষী। পরেও তাহার যথার্থতা দেখিয়াছি অন্যের সঙ্গে কথায় এবং ব্যবহারে। কিন্তু আমার কত ভাগ্য! আমি পূর্বাপর তাঁহার নিকট অন্যরূপ ছিলাম, যেন একান্ত আপনজন— একেবারে খোলামেলা ভাব।

সেদিনই সন্ধ্যার দিকে শিয়ালদহ স্টেশনে ট্রেন হইতে নামিয়া ফুটপাত ধরিয়া পুনরায় বাগবাজারে 'মায়ের বাড়ী'র দিকে রওনা দিয়াছি। রাস্তায় মাস্টার মহাশয় শ্রীম-র সহিত দেখা। তিনি অস্পষ্ট আলোকে চিনিতে পারিয়া আমার কাঁধে হাত রাখিয়া "এই যে, কখন?" বলিয়া দু-এক কথার পর বলিলেন, মায়ের ওখানে আজ অনেক লোক আসিয়াছেন—রাধু, মন্মথ, নলিনী, মাকু প্রভৃতি। সুতরাং রাত্রে সেখানে থাকিতে যাইলে স্থানাভাব হইবে। তাঁহার বাড়ি (স্কুলবাড়ি—মর্টন ইনস্টিটিউশন) ৫০ নম্বর

আমহার্স্ট স্ট্রীটে।[৩] মাকে প্রণাম করিয়া সেখানে চলিয়া যাইতে তিনি আমাকে আদেশ বা অনুরোধ করিলেন।

বাগবাজারে উদ্বোধন কার্যালয়ে পৌঁছিলাম। শরৎ মহারাজের সঙ্গে দেখা করিয়া শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিবার পর শরৎ মহারাজের কাছে আবার কিছু সময় বসিলাম। সেই রাত্রে মাস্টার মহাশয়ের দেবদুর্লভ আতিথ্য ও সান্নিধ্য লাভে ধন্য হইলাম। সেই আনন্দময়ী রাত্রির সুখস্মৃতি চিরজাগরূক রহিল অন্তরমধ্যে।

দুর্গাপূজা শেষ হইয়া গেল। মা বাগবাজারে ফিরিলেন। পূজার কয়দিন শরৎ মহারাজও মঠে ছিলেন এবং আমরাও ছিলাম। কিন্তু শরৎ মহারাজকে দীক্ষার প্রসঙ্গটি জানাইবার সুযোগ-সুবিধা হয় নাই। অবশেষে আসিল আমার সেই পুনর্জন্মের দিন—বিজয়া দশমীর পরদিন সকাল (১৯১৪)।

বন্ধুসহ গঙ্গাস্নানে গিয়াছি খুব সকালে। মায়ের শিষ্য ও সেবক স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দজীও (কপিল মহারাজ) উপস্থিত। তিনি তীরে দাঁড়াইলেন আমার যৎকিঞ্চিৎ পূজোপকরণ, নরুণ-পেড়ে বস্ত্র হাতে লইয়া—আমাদের বস্ত্রাদিসহ। দীক্ষার কথা শরৎ মহারাজকে বলা হয় নাই। সেইজন্য আমার মনে একটু খুঁতখুঁত ভাব চলিতেছে। তিনজনেই স্নানান্তে মায়ের নিকট চলিলাম। শরৎ মহারাজের সম্মুখ দিয়াই তো উপরে যাইতে হইবে। আমার কেমন সঙ্কোচ ও ভয় ভয় করিতে লাগিল। কেবলই মনে হইতে লাগিল, শরৎ মহারাজ কি মনে করিবেন? সঙ্গী দুজনকেও মনের সঙ্কোচের কথা জানাইলাম। কি যে করি। কপিল মহারাজ বলিলেন ঃ "জানাবার দরকার হলে তো মা-ই বলে দিতেন। অত ভাবনার কি আছে? ভাবনা কিন্তু ছিলই। মনের কোণে একটু অন্ধকার। মনে হইল, 'চাঁদ যারে দয়া করে আঁধার

৩ পূর্বের আমহার্স্ট স্ট্রীট, বর্তমানে রাজা রামমোহন রায় সরণি। শ্রীম ছিলেন মর্টন ইনস্টিটিউশনের অধ্যক্ষ (রেক্টর) ও স্বত্বাধিকারী। এই বিদ্যালয়-ভবনের চারতলার ঘরে তিনি থাকতেন এবং তুলসী ও পুষ্পবৃক্ষে সজ্জিত সংলগ্ন ছাদে সকাল-সন্ধ্যায় তিনি ধর্মালাপ করতেন। বহু ভক্ত ও যুবক তাঁর কাছে আসতেন।—সম্পাদক

তার কী করে', তবুও মন্দিরের কাছে গিয়াও আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম। কপিল মহারাজ হাসিয়া বলিলেন ঃ "আসুন, শরৎ মহারাজের সামনে দিয়ে যেতে হবে না। ঐ দিকের সিঁড়ি দিয়ে উঠে পড়ি।" হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। তারপর উঠিয়া গিয়াই জানিলাম, মা অপেক্ষা করিতেছেন। মায়ের ঘরে বা ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, মা আসনে বসিয়া আছেন। সামনের একটি আসনে আমাকে বসিতে বলিলেন। দীক্ষার কাজ শুরু হইল।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রদত্ত অগ্নিময় নাম যাহা কারও কাছে বলা হয় নাই, তাহা শ্রীশ্রীমায়ের মুখে উচ্চারিত হওয়া মাত্র আমার এক অপূর্ব ভাবের আবেশ হইল। সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হইলে ঠাকুরের পূজার আসনে ঠাকুরের প্রতিকৃতি এবং দেওয়ালে টাঙানো নিজের একখানি ছবি দেখাইয়া বলিলেন ঃ "ওঁকে ভাবলেও হবে।" দুইজনকেই দেখাইলেন। আশীর্বাদ লাভ করিয়া প্রণামান্তর বাহিরে আসিলাম। আমার হঠাৎ মনে হইল, কই মা তো আমার মাথায় হাত বুলাইয়া দেন নাই। ঠিক সেই সময়ে ভিতর হইতে আবার ডাক পড়িল। ব্রহ্মচারী বলিলেন ঃ "মা আপনাকে ডাকছেন।" গেলাম। মা সেই দীক্ষার আসনেই বসিতে বলিলেন। তারপর অন্তর্যামিনী মায়ের শ্রীহস্তের স্পর্শ মস্তকে অনুভব করিলাম। মা বলিলেন ঃ "এবার হলো তো?" আমি বিহ্বলের মতো তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে মাথা ঠেকাইয়া প্রণামান্তর কম্পিত অন্তরে বাহিরে আসিলাম।

পূজ্যপাদ শ্রীম আমার সহিত প্রথম পত্রালাপে লিখিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর ও মা অভেদ। একই সত্তা। খোলসে মাত্র তফাত। নর আর নারী দেহ।

অভীষ্ট লাভ করিয়া জন্ম-জীবনের সার্থকতা মাথার উপরে নামিয়া আসিল। যাহাই ঘটুক—এবার চলিলাম শরৎ মহারাজকে প্রণাম করিতে। অভীষ্ট লাভের সংবাদ তাঁহাকে জানাইলাম।

কোথায় বিরক্তি? সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া

বলিলেন ঃ "ধন্য"! সজল নেত্রে মনে মনে বলিলাম, তুমি বরেণ্য—তুমি মহান—তুমি বিরাট—তোমায় প্রণাম করি।

আরেকবার মহাষ্টমীর দিন। শ্রীদুর্গাপ্রতিমা পূজা হইয়া গেলে বহু ভক্ত শ্রীশ্রীমাকে পুষ্পাঞ্জলি দিতে চলিয়াছে নীলাম্বর-ভবনে। শ্রীশ্রীমা একখানি ছোট জলচৌকিতে বসিয়া আছেন। কাছে পূজনীয়া গোলাপ-মা—হাতে পাখা, মাকে হাওয়া করিতেছেন। এক দরজা দিয়া প্রবেশ—প্রণামান্তে অন্য দরজা দিয়া নির্গমন। লাইন পড়িয়া গিয়াছে। একজনের পিছনে আরেকজন। প্রবেশপথের পার্শ্বে পূজনীয় শরৎ মহারাজ উপবিষ্ট। আমি যখন মায়ের কাছে পৌঁছাইলাম, তখন আমার পূর্ববর্তী ভক্তটি অঞ্জলি প্রদান করিতেছেন। প্রণামরত হইয়া মন্ত্রোচ্চারণ আরম্ভ করিলেন—ওঠেন আর না।

গোলাপ-মা বলিলেন ঃ "আরে বাপুরে, কত ভক্ত বাকি! এই ভিড়ের মধ্যে গরমে মার কষ্ট হচ্ছে না? অত লম্বা কেন?"

কথাটা শরৎ মহারাজের কর্ণে প্রবেশ করিতে দেরি হইল না। তিনি বলিলেন ঃ "গোলাপ-মা, ওর সব সাধ—সব আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করবে তো? 'রূপং দেহি, জয়ং দেহি, ভার্যাং মনোরমাং দেহি'—কত কিছু! তাড়া করছ কেন?"

সমবেত ভক্তগণ সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন, দেখিলাম শ্রীশ্রীমাও একটু হাসিলেন। আর ভক্তটি বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া একেবারে লম্বা দৌড়।

এই প্রসঙ্গে অনেক কথার মধ্যে আরেকটি কথা মনে পড়িল। শ্রীশ্রীমায়ের দেহত্যাগের পরের ঘটনা।

উদ্বোধনে শরৎ মহারাজের ঘরে কয়েকজন ভক্তসহ বসিয়া আছি। একজন বুড়ো ভদ্রলোক একথা-সেকথার পর মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "মহারাজ, ঠাকুরের মন্দিরের আগে মায়ের মন্দির উঠল কেন? এটা কি ঠিক হলো?" বলা প্রয়োজন যে, তখন মাতৃমন্দিরের নির্মাণকার্য চলিয়াছে জয়রামবাটীতে।

শরৎ মহারাজ তাঁহার দিকে একটুখানি চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন : "কথাটা ঠাকুর বা মাকে জিজ্ঞাসা করলেই উত্তর পাবে। আর আমি বলি, এই কাজে হাত দেওয়ার আগে বোধ হয় তোমাকে পেলে সব উলটে যেত।"

আমরা না হাসিয়া পারিলাম না। বিবর্ণমুখে ভদ্রলোক বলিলেন : "না, এমনি জিজ্ঞাসা করছিলাম।"

আরেকবারের কথা। সেও দুর্গাপূজার সময়। শ্রীশ্রীমা পূজা উপলক্ষে বেলুড় মঠে আসিয়াছেন। মঠের উত্তরের বাগানবাড়িতে ('লেগেট হাউস'-এ) আছেন। মনে হয় নবমীর দিন, দ্বিপ্রহরের পর গোলাপ-মা আসিয়া বলিলেন : "শরৎ, মা তোমাদের সেবায় খুশি হয়েছেন।" বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ) পাশেই ছিলেন। সাধু ও ভক্তদেরও অনেকে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শরৎ মহারাজ আনন্দ-গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন : "বটে"? বলিয়াই পার্শ্বোপবিষ্ট বাবুরাম মহারাজের দিকে চাহিয়া আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন : "বাবুরাম-দা, শুনলে?" সেবার সার্থকতাজনিত আনন্দ তখন বাবুরাম মহারাজের চোখে-মুখেও সুস্পষ্ট। উভয়ে তখন আনন্দে সে কী কোলাকুলি! শরৎ মহারাজের সেই আবেগকম্পিত কণ্ঠস্বর আজও আমার কানে বাজে। 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত আমার 'প্রেমানন্দ-স্মৃতি' (২৭শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৩২, পৃঃ ৬৬৩) হইতে এই ঘটনাটি স্বামী গম্ভীরানন্দ তাঁহার শ্রীশ্রীমায়ের জীবনীতে 'বেলুড় ও কাশী' অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন।

দুর্গোৎসব। ষষ্ঠীর দিন মঠের ফটকে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর গাড়ি আসিয়া থামিয়াছে। ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া স্বামী প্রেমানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসহচরগণ গাড়ি টানিয়া মঠপ্রাঙ্গণে লইয়া আসিতেছেন। সমবেত কণ্ঠে "শ্রীগুরুমহারাজজী কি জয়", "জয় মহামায়ী কি জয়" ধ্বনিতে ভক্তমণ্ডলীর শরীর হর্ষাবেগে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। প্রেমানুরাগরঞ্জিত-মুখ স্বামী প্রেমানন্দ আনন্দে টলিতেছেন। চোখ-মুখ দিয়া যেন আনন্দ ঠিকরাইয়া পড়িতেছে! এই স্বর্গীয় দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়াছি। গুরুপত্নীতে

এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসিবৃন্দের শ্রদ্ধার গভীরতা প্রত্যক্ষ করিয়া গুরুভক্তি জিনিসটি যে কী তাহা একটু উপলব্ধি করিয়াছি।[৪] স্বামী গম্ভীরানন্দ তাঁহার শ্রীশ্রীমায়ের জীবনীতে এই ঘটনাটিও 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত আমার পূর্ব-উল্লিখিত স্মৃতিনিবন্ধ (পৃঃ ৬৬৪-৬৬৫) হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

একবার শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিতে গিয়াছি। সঙ্গে আমার জনৈক বন্ধুস্থানীয় আত্মীয় যুবক রহিয়াছে। সে প্রণাম করিয়া হাউমাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সেবক ব্রহ্মচারীটি তাহাকে বাহিরে চলিয়া যাইতে বলিলেন। শ্রীশ্রীমাও দেখিলাম বেশ কিছুটা বিব্রত বোধ করিতেছেন। বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমারও একটু অস্বস্তি লাগিতেছে। ব্রহ্মচারীকে আমি বলিলাম ঃ "এরকম করছেন কেন? মা কি আপনাদের একচেটিয়া সম্পত্তি—আমাদের কিছুই নন?" ব্রহ্মচারী বলিলেন ঃ "দেখছেন না মশাই, কিরকম উৎপাত আরম্ভ করেছেন।" ওদিকে শ্রীশ্রীমা ততক্ষণে বুঝাইতেছেন ঃ "শান্ত হও বাবা, শান্ত হও। বল কি চাই?" সে শুধু মাকে বলিতেছে ঃ "মাগো, কৃপা কর—কৃপা কর।" মা তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছেন আর বলিতেছেন ঃ "বাবা, কৃপা তো আছেই—তুমি শান্ত হও।" বন্ধুটিও ধীরে ধীরে শান্ত হইয়া মাকে প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিল। তাহাকে লইয়া নিচে গেলাম পূজনীয় শরৎ মহারাজের কাছে। তিনি প্রশ্ন করিলেন ঃ "লাবণ্য, ওপরে ব্যাপারটি কি হলো?" আমি সংক্ষেপে ঘটনাটি বিবৃত করিলাম। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন ঃ "পূর্ববঙ্গের লোকেরা বড় ভাবপ্রবণ হয়। এরকম কাণ্ড অনেকেই করে বসে। একবার যশোরের একটি ভক্ত করল কি, গায়ের কাপড়ের ভেতর একটা ছোরা লুকিয়ে রেখে মাকে প্রণাম করতে গেছে। প্রণাম করে উঠে মাকে ছুরিখানি দেখিয়ে বলল, 'মা তোমার স্বরূপ দেখাও।' মাকে নীরব

---

৪ স্বামী গম্ভীরানন্দ এই ঘটনাটি ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের দুর্গাপূজার বলে উল্লেখ করেছেন। (দ্রঃ শ্রীমা সারদা দেবী, ৪র্থ সং, ১৩৭৫, পৃঃ ৩৪২) কিন্তু লেখকের স্মৃতিকথা থেকে মনে হয় যে, ঘটনা-দুটি ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দ বা তার পরের কোন দুর্গাপূজার।—সম্পাদক।

দেখে আবার বলল, 'তা না হলে এই দেখ আমার বুকে ছোরা বসিয়ে দিচ্ছি।' মা সন্ত্রস্তভাবে উঠে পড়ে ছোরাখানি ধরে বললেন, 'ছাড়, কি স্বরূপ দেখবে? (নিজের শ্রীমুখের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে) এবার এই রূপ'। স্বরূপ-দর্শনার্থী এবার কি দেখে যেন শান্ত হলো।

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা প্রকাশ সম্পর্কে স্বামী সারদানন্দ মহারাজ পত্রে (৬।৮।১৯২১) আমাকে একটা নির্দেশ দিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন ঃ "তোমার লিখিবার শক্তি আছে। কিন্তু কোন্ বিষয়ে কিরূপে লিখিলে লোকে ঠিক ঠিক [শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষত্ব, বক্তব্য, আচরণ এবং বাণীর তাৎপর্য] বুঝিতে পারিবে এবং কোন্ ঘটনার কতদূর প্রকাশ করা কর্তব্য— এই সকল বিষয়ে শিক্ষা করিতে হইবে। লেখনী অনেকস্থলে সংযত রাখিতে হয়।" পূজ্যপাদ মহারাজের এই নির্দেশ আমি সর্বদা সতর্কতার সহিত স্মরণ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি।

নিচে কয়েকটি ঘটনা ও শ্রীশ্রীমায়ের কয়েকটি বাণী উল্লেখ করিতেছি। এগুলি কিছু আমার নিজের চোখে দেখা এবং নিজের কানে শুনা, কিছু নির্ভরযোগ্য প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে প্রাপ্ত।

॥ ১ ॥

শ্রীশ্রীমা—"ক্ষুরের ধারের ন্যায় পথ। তবে তিনি ধরে রয়েছেন, তিনি কোলে করে রয়েছেন, তিনিই দেখছেন।"—বলতেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

সেবক—কৈ, কিছুই জানতে দিচ্ছেন না যে?

শ্রীশ্রীমা—সেই তো দুঃখ।

সেবক—হ্যাঁ, সেই তো দুঃখ মনে করি।

জনৈক ভক্ত—মরলে পর ঠাকুর কোলে করে নেবেন, সে আর বেশি কথা কি? যদি এই দেহেই...

শ্রীশ্রীমা—এই দেহেই কোলে করে ধরে রয়েছেন, মাথার ওপর তিনি আছেন, ঠিক ধরে রয়েছেন।

ভক্ত—ঠিক আমাদের ধরে রয়েছেন?

শ্রীশ্রীমা—ঠিক ধরে রয়েছেন।

ভক্ত—সত্যি বলছেন?

শ্রীশ্রীমা—সত্যি বলছি—ঠিক ধরে রয়েছেন।

ভক্ত—ঠিক?

শ্রীশ্রীমা (দৃঢ়তার সহিত)—হ্যাঁ, ঠিক।

॥ ২ ॥

জনৈক ভক্ত—মা, তোমাকে লোকে ভগবতী বলে।

শ্রীশ্রীমা—লোকে বলবে কি, আমিই বলছি।

॥ ৩ ॥

জনৈক অসুস্থ সাধু—মা, ঠাকুর কি কেবল পরকালের জন্য?

শ্রীশ্রীমা—না, তিনি ইহকালেরও জন্য, পরকালেরও জন্য।

॥ ৪ ॥

শ্রীশ্রীমা—ঠাকুর বলতেন ঃ "আমাকে (ঠাকুরকে) যারা ডাকবে তাদের জন্য আমাকে অন্তিমে দাঁড়াতে হবে।" এটি তাঁর নিজের মুখের কথা।

(বিনীতভাবে বলিতেছি, আমি নির্ভরযোগ্য সূত্রে অনেক শুনিয়াছি—শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তকে অন্তিমকালে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা দেখা দিয়া হাত ধরিয়া লইয়া যাইতেছেন। শ্রীশ্রীমাকে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন ঃ "তোমার কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তকে অন্তিমে আমি নিজে এসে নিয়ে যাব।")

॥ ৫ ॥

স্বামী ধীরানন্দ মহারাজ বেলুড় মঠ হইতে বাগবাজারে সময় সময় শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে যাইতেন। স্বামী সারদানন্দ মহারাজকে লইয়া নিচের উঠানে দাঁড়াইতেন। মা বারান্দায় আসিয়া প্রণাম গ্রহণ ও আশীর্বাদ করিতেন।

॥ ৬ ॥

জনৈক ভক্ত শ্রীশ্রীমায়ের কৃপালাভের পর একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন ঃ "মা, যোগশাস্ত্রানুযায়ী আবাল্য আমার যোগাভ্যাস করার ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল। যোগাভ্যাস আরম্ভ করব নাকি?"

শ্রীশ্রীমা একটু নীরব থাকিয়া হাসিয়া বলিলেন ঃ "যা লাভ করবার জন্য সাধক যোগাভ্যাস করেন তাতো তোমার হয়ে গেছে বাবা। আর তার প্রয়োজন কি? তাতে ত্রুটি হলে ক্ষতিও ঘটে। তোমার প্রয়োজন নেই।"

ভক্ত—মা, বুঝতে যে পারছি না।

শ্রীশ্রীমা—পারবে, ক্রমে বুঝবে।

॥ ৭ ॥

দীক্ষার আসনে শ্রীশ্রীমায়ের পার্শ্বে উপবিষ্ট দীক্ষার্থী জনৈক কৃতবিদ্য ভক্ত মাকে বলিলেন ঃ "বিশ্বাস যে হচ্ছে না মা।"

শ্রীশ্রীমা হাসিয়া বলিলেন ঃ "তা না হোক, দিয়ে দিচ্ছি নিয়ে নাও।"

দেওয়া-নেওয়া হইয়া গেল। পরে এই ভক্ত মঠ-মিশনের অনেক কাজ করিয়াছেন এবং দেখিয়াছি, অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কর্মে নিযুক্ত থাকিয়াও জপ-ধ্যানে দিবসের বেশি সময় তন্ময় হইয়া কাটাইয়া দিতেন।

॥ ৮ ॥

একবার পূজোৎসবে (শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সময়) বেলুড় মঠে সকালের দিকে শ্রীশ্রীমা স্ত্রীভক্তদের কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া রান্নাঘরের পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন ঃ "ছেলেরাও বেশ কুটনো কুটতে পারে।"

স্বামী জগদানন্দ মহারাজ হাতজোড় করিয়া বলিলেন ঃ "কুটনো কুটেই হোক, বাটনা বেটেই হোক, আর জপ-ধ্যান করেই হোক—ব্রহ্মময়ীর প্রসন্নতালাভই আমাদের উদ্দেশ্য।"

শ্রীশ্রীমা সহাস্যবদনে বলিলেন ঃ "তাতো ঠিক বাবা।"

উপস্থিত সকলে মাকে প্রণাম করিলেন।

॥ ৯ ॥

জনৈক ভক্ত—শ্রীশ্রীঠাকুরকে অনেকে ভগবান বলেন। আপনি কি?

শ্রীশ্রীমা—তিনি যদি ভগবান হন, আমি তবে ভগবতী।

একবার জনৈক ভক্ত শরৎ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "ঠাকুর তো স্বয়ং ভগবান। তবে মা কি?"

শরৎ মহারাজ বলিলেন ঃ "ভগবান কি তাহলে একটি ঘুঁটে-কুড়োনীর মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন? আচ্ছা মক্কেল তো?" (ঠাকুরের নিজের কথা—"আমি কি লাউশাক-খাকী, পুঁইশাক-খাকীকে বে করেছি?")

কোন আশ্রমাধ্যক্ষের সহিত বনিবনা না হওয়াতে জনৈক সাধু আশ্রম ছাড়িয়া অনির্দিষ্ট পথে যাত্রা করিতে গিয়া শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে যাইতেছেন। সাধু নানা কথার মধ্যে কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "মা, সংসার মাতাপিতা আত্মীয়স্বজন ছেড়ে আশ্রমজীবন বরণ করেছিলাম। কিন্তু এখানেও সেই সংসারের দাবি-দাওয়া, ঝগড়া-ঝাঁটি।"

শ্রীশ্রীমা—বাবা, আশ্রমও দ্বিতীয় সংসার। তবে এখানে ঝগড়া-ঝাঁটির মধ্যে তাঁর সান্নিধ্য বেশি পাওয়া যায়।

॥ ১০ ॥

"পরগৃহবাসী ও পরান্নভোজী হয়ো না বাবা, এ বড় কষ্টকর।"—শ্রীশ্রীমা জনৈক ভক্তের প্রতি।* □

---

* উদ্বোধন, ৯৭তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, আশ্বিন ১৪০২, পৃঃ ৪৭৭-৪৮৬

শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যস্মৃতি

বীণাপাণি ঘোষ

শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্যদর্শন লাভ করেছিলেন আমার পূজনীয় শ্বশুর মহাশয়। শ্রীশ্রীঠাকুর যে-কয়জন ভাগ্যবানকে রসদদার বলে নির্দেশ করতেন তাঁদের মধ্যে একজন, যাঁর নাম ছিল ঠাকুরের কথায় 'সুরেশ মিত্তির', সেই সুরেনবাবু ছিলেন আমার শ্বশুর মহাশয়ের পরম বন্ধু। আমার শ্বশুর মহাশয় তখন কলকাতার সিমলা স্ট্রীটে সুরেনবাবুর বাড়ির নিকট থাকতেন। তাঁরই সঙ্গে একদিন দক্ষিণেশ্বরে আমার শ্বশুর মহাশয় গিয়েছিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণ দর্শন ও স্পর্শন করবার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। তখনকার দিনে সাধুদর্শন করতে গেলে তাঁর অলৌকিকত্বই সাধুত্বের পরিচায়ক বলে গণ্য হতো, ভগবৎ তত্ত্বান্বেষণে খুব কম লোকই সাধুর নিকট যেতেন। আমার শ্বশুর মহাশয় ছিলেন বড় ইঞ্জিনীয়ার। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রণাম করে বসতেই ঠাকুর যেমন সকলকেই বলতেন ঃ "মাঝে মাঝে এসো", তাঁকেও ঐরূপ বলেই তারপর বলেছিলেন ঃ "ওরে, তুই বদলি হয়ে গেছিস।" বাড়ি এসেই শ্বশুর মহাশয় দেখেন, পূর্ণিয়ায় তাঁর বদলি হবার খবর দিয়ে সরকার থেকে তার এসে গেছে। এতে তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে গিয়েছিলেন, কারণ তখন তিনি তা আশা করেননি। এই অলৌকিক ঘটনা তাঁর হৃদয় স্পর্শ করেছিল বটে, কিন্তু বদলি হয়ে বিদেশে চলে যাওয়ায় আর সংসারের নানাবিধ ঝঞ্ঝাটে ডুবে যাওয়াতে এবং বহুদিন কলকাতা ছাড়া হয়ে থাকায় তাঁর আর শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তারপর যখন তিনি কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন, তখন ঠাকুর মানবলীলা সম্বরণ করেছেন।

বহুদিন কেটে গেল। শ্বশুরের প্রথম সন্তান—আমার ডাক্তার ভাসুর যখন বালিকা-বধূ আর শিশুসন্তান রেখে অকালে মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে পিতামাতাকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করে চলে গেলেন, তখন তাঁদের প্রাণে সান্ত্বনা দিতে আত্মীয়ের হাতের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে'র মধ্য দিয়ে ঠাকুর আমাদের ঘরে এলেন। সেই থেকে আমরা তিন পুরুষ ঠাকুরের শ্রীচরণে বাঁধা পড়েছি।

আমার বড় জা ভারী ভক্তিমতী ছিলেন। তাঁরই সংস্পর্শে আমার শোকাতুরা শাশুড়িঠাকুরানী শ্রীশ্রীমায়ের চরণতলে গিয়ে একটু শান্তিলাভ করতেন। কিছুদিন পরে কৃপাময়ী মা আমার শোকাতুরা শাশুড়িমাতাকে ও আমার বড় জাকে শ্রীচরণে আশ্রয় দেন। তখন আমি বালিকা, মনে মনে ইচ্ছা থাকলেও কিছু বলবার মতো সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারিনি।

মাঝে মাঝে শাশুড়ির সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের চরণদর্শনে যেতাম, তাঁদের কথা অবগুণ্ঠনাবৃতা হয়ে শুনতাম। আমাদের বাড়িতে আবার অবগুণ্ঠন খোলবার উপায় ছিল না বা শাশুড়ির সামনে অপরের সঙ্গে কথা বলারও নিয়ম ছিল না। তাই শাশুড়ির সাহচর্যে শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্যলাভ সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ হতো না।

আমার বাপের বাড়ির দিকে তখনো কেউ ঠাকুরের ভক্ত হননি। দক্ষিণেশ্বরে বা বেলুড় মঠে বেড়াতে যাওয়া ছাড়া আর কিছু সেখান থেকে হতো না।[১]

শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণ দর্শন বা স্পর্শন একমাত্র শাশুড়িমাতার সঙ্গে ছাড়া কখনো হয়নি। কাজেই শ্রীশ্রীমায়ের কাছে তাঁর শ্রীচরণে আশ্রয় নেবার মনের যে-ইচ্ছা, কিছুতেই তা নিবেদন করবার সুযোগ পেতাম না।

---

১ পরে অবশ্য আমার মাতাঠাকুরানী ঠাকুরের কাজের জন্য অকাতরে ব্যয় করতেন। তাঁর পিতামাতার স্মৃতিতে কাশীতে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে সংক্রামক রোগীর ওয়ার্ড তিনিই নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

এইভাবে অনেকদিন কেটে গেল। আমার শিশুকন্যাটির বয়স তখন মাত্র চার মাস; তাকে নিয়েও একদিন যাই। তার মাথাটি শ্রীচরণে ঠেকাতেই মা তাকে কোলে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আমার কোলে দিয়ে দিলেন। এইভাবে মায়ের দর্শন মাঝে মাঝে পেলেও আমার প্রাণের আকুলতা যায় না।

স্বামীরও তখন দীক্ষায় মন নেই। অবশ্য আমায় বাধা দেননি, সর্বান্তঃকরণে বলেছিলেন : "তুমি শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রয় নাও, আমার যখন যেখানে ইচ্ছা হবে তখন নেব।" তখনো জানতেন না যে, ঠাকুর আমাদের ধরে আছেন, আমাদের কোথাও যাবার উপায় নেই।

এইভাবে দিন যায়, শেষে আর থাকতে না পেরে আমার বড় জাকে মনের কথা বললাম। তিনিও তখন কিছু করে উঠতে পারলেন না, তবে আশা দিলেন যে, নিশ্চয়ই চেষ্টা করে দেখবেন।

এইসময় আমার একটি দেবর ঠিক আমার ভাসুরের মতনই কৃতবিদ্য ডাক্তার হয়ে সেইরকমই বালিকা-বধূ ও এক বছরের শিশুপুত্র রেখে পঁচিশ বছর বয়সে অকালে চলে গেল। এইবার আমার শাশুড়ি একেবারে ভেঙে পড়লেন। আমার শ্বশুর মহাশয়ও তখন ছয়-সাত বছর হলো ইহলোক ত্যাগ করে চলে গেছেন। আমার শাশুড়িঠাকুরানী আর সহ্য করতে পারলেন না, একেবারে শোকবিহ্বলা ও জ্ঞানহারা হয়ে পড়লেন।

পূজনীয় শরৎ মহারাজ এলেন শাশুড়িমাতাকে সান্ত্বনা দিতে। আমার ঘরখানি পবিত্র করে আমাদের কাছে বসে কতই আশ্বাসের কথা, ঠাকুরের প্রসঙ্গ সব শুনিয়ে গেলেন। সেইসময় পূজনীয়া গৌরী-মাও এসেছিলেন একদিন আমাদের বাড়িতে, শ্রীশ্রীঠাকুরের অনেক পুণ্যকথা আমাদের শুনিয়ে ধন্য করে গিয়েছিলেন। তাঁর স্কুল তখন নতুন শুরু হয়েছে গোয়াবাগানে। সেখানে আমার ছোট বোন-দুটি পড়ত, সেই সূত্রে তিনি আমার বাপের বাড়িও যেতেন এবং মধ্যে মধ্যে ঠাকুরের পুণ্যকথা সানন্দে বলতেন। সেইসব দিনের স্মরণে আজও আমার মনে হয়, তখন আমরা কত সৌভাগ্যেরই অধিকারী হয়েছিলাম!

তারপর থেকে আমার আকুলতা আরও বাড়ল। আমার আকুলতায় বোধহয় এইবার ঠাকুরের আসন টলল। একটি সুযোগ ঠাকুর দিলেন— ভক্তপ্রবর কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শিবরানী আমার আরেকটি দেবরের বধূ হয়ে আমাদের গৃহ কিছুদিনের জন্য পবিত্র করতে এসেছিল। বালিকাটি যেন মূর্তিমতী আনন্দ ছিল। সে আমায় ভারী ভালবাসত। আমার ঐ দেবরটি আগ্রা কলেজের অধ্যাপক ছিল। যখন তার বিয়ে হয় বধূটি নিতান্ত বালিকা, সুতরাং তিন-চার বছরের মধ্যে তাকে আগ্রা নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। যখন সে একটু বড় হলো, তার আগ্রা যাবার কথা হয়। সে তখন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর চরণে আশ্রয় নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করল। কিরণবাবুর বাড়িতে সর্বদাই স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ মহারাজদের যাওয়া-আসা ছিল; শ্রীশ্রীমাও ওঁদের কাশীর বাড়ি 'লক্ষ্মীনিবাসে' কৃপা করে নিজে গিয়ে কিছুদিন বাস করে তাঁদের ধন্য করেছিলেন। ওঁরা সর্বদাই মায়ের শ্রীচরণ দর্শন ও স্পর্শন করতে পেতেন। এইবার আমায় ঠাকুর সুযোগ করে দিলেন; শিবরানীর সঙ্গে সঙ্গে আমারও অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হলো। শাশুড়িমাতা মত দিলেন, আমাদের দীক্ষার দিন স্থির হলো।

তবু আবার বাধা হয়। রাধুর তখন শরীর বড় খারাপ, সে তখন কোন গোলমাল সহ্য করতে পারছে না। সেজন্য শ্রীশ্রীমা তাকে নিয়ে উদ্বোধনের বাড়ি ছেড়ে বোসপাড়া লেনে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের বোর্ডিংএ রয়েছেন। কাজেই আমাদের দীক্ষা দিতে তখন মা সম্মত হবেন কিনা সে একটা ভাববার কথা হলো।

কিন্তু শিবরানীর আগ্রা যাবার দিন পুনঃপুনঃ বদল হওয়ায় বাড়িতেও একটু গোলমালের সৃষ্টি হয়। করুণাময়ী মা সব শুনে সম্মতি দান করলেন। সে-কথা শুনে আনন্দে, আর কি যেন একটা অনির্বচনীয় ভাবে সমস্ত রাত্রি ঘুমাতে পারলাম না। রাত্রি থাকতেই স্নানাদি ও গৃহদেবতার পূজাদি সমাপন করে কম্পিতবক্ষে শাশুড়িমাতার সঙ্গে বোসপাড়া লেনে গেলাম। সেই অবগুণ্ঠনাবৃতই অবস্থা। সুতরাং রাধুর সম্বন্ধেও যে মাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করব তারও উপায় নেই।

যাই হোক, শুভ সময় এল; শ্রীশ্রীমা আমাদের একে একে ডাকলেন। সেই জীবনের শুভ মুহূর্ত, মা ও আমি নির্জন কক্ষে, আর কেউ নেই। জীবনে কখনো মাকে সম্বোধন করে একটি বাক্যও আমার মুখ থেকে উচ্চারিত হয়নি, আর সেই শুভ সময় যদি অসতর্ক হয়ে কাটিয়ে দিই, তবে আর তা নাও পেতে পারি। আমার অন্তর বলে উঠল ঃ ওরে মূর্খ! এই তোর সময়, এই তোর অবসর, করুণাময়ীর কাছে যা চাইবার চেয়ে নে, আর কখনো এমন সুযোগ পাবি না।

রাধুর অসুখ, মাও ক্ষিপ্রতার সহিত সব সেরে নিচ্ছিলেন। নিবেদিতা বিদ্যালয়ের বোর্ডিঙের ঠাকুরঘরে শ্রীশ্রীমা আমাদের একে একে নিয়ে প্রবেশ করলেন। সেখানে ঠাকুর ও নানা দেবদেবীর ছবি ছিল। মা আমার ইষ্টদেবীকে দেখিয়ে দিলেন, ঠাকুরকে দেখিয়ে বললেন ঃ "উনিই সব" এবং সবীজ মহামন্ত্র দান করলেন। আর বললেন ঃ "মা অনিবেদিত বস্তু কখনো খেও না, এক খিলি পান খেতে হলেও নিবেদন করে খাবে, আর শ্রাদ্ধের অন্ন কখনো খেও না।" কোন বিশেষ বাধা-নিষেধে মা আমাদের আবদ্ধ করেননি, শুধু এইটুকু মা নিজেই নিষ্ঠার সহিত রক্ষা করিয়ে আসছেন।

করুণাময়ী মা আমায় যেমন আশ্রয় দিলেন, তখনই তাঁর শ্রীচরণ-দুখানি চেপে ধরে কাতরে আমি বলে উঠলাম ঃ "মা! মা! শ্রীচরণে আশ্রয় দিলেন তো?" মাথায় হাত বুলিয়ে, চোখ মুছিয়ে দিয়ে করুণাময়ী বলে উঠলেন ঃ "হ্যাঁ মা, দিলুম বৈকি!" আর আমি কিছু মনে করতে পারলাম না। এখনো মনে মনে স্মরণ করলে জননীর সেই কোমল পাদপদ্মের স্পর্শ হৃদয়ে অনুভব করি। মার শ্রীচরণের অঙ্গুলিতে বোধ হয় বাতের জন্য একটি লোহার তারের আংটি ছিল, এখনো যেন সেইটিরও স্পর্শ অনুভব করি। তারপর যেন আচ্ছন্নের মতো বাইরে এলাম। মা আমাদের প্রসাদ দিয়ে একটু দুঃখিত হয়ে বললেন ঃ "আজ তো এখানে প্রসাদ পেতে হয়। কি করব মা, রাধু যে গোলমাল সহ্য করতে পারছে না।" আমাদের সেইসময়ই চলে আসবার ব্যবস্থা ছিল। কখন যে কিভাবে

গাড়িতে এসে বসেছি তা জানতেও পারিনি। এই আচ্ছন্ন ভাব আমার সপ্তাহকাল ছিল।

আমার জীবনে মার সঙ্গে এই প্রথম ও এই-ই শেষ কথা। এরপর আর আমি কখনো মাকে দর্শনও করতে পারিনি। অতি তুচ্ছ সাংসারিক কারণ মার শ্রীচরণ-দর্শনে বাধা ঘটিয়েছিল।

শিবরানী আগ্রা যাবার দু-তিন মাসের মধ্যেই শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে মিলিত হলো। বালিকা-বধূ বলে আমার শাশুড়িঠাকুরানী তার সঙ্গে আগ্রা গিয়েছিলেন। তিনি সেখানেই শুনেছিলেন যে, শিবরানীর বিয়োগে ব্যথিতা হয়ে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী সাশ্রুনেত্রে বলেছিলেন : "রানীর শাশুড়ি বর্ষীয়সী গৃহিণী হয়ে অন্তঃসত্ত্বা বধূকে তাজের গম্বুজে উঠতে দিলে কেন? বৃহস্পতিবারেই বা আগ্রা নিয়ে গেল কেন?"

আমার শাশুড়িঠাকুরানী বড়ই নিরীহ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। শ্রীশ্রীমা বিরক্ত হয়েছেন শুনে কলকাতায় এসে তিনি নিতান্ত ভীতা হয়ে উদ্বোধনে যেতে সঙ্কোচবোধ করতে লাগলেন। কাজেই আমারও আর যাওয়া হয়ে উঠল না। শ্রীশ্রীমার পার্থিব লীলা সংবরণ করার মধ্যে আর শাশুড়িঠাকুরানী সেখানে গেলেন না, আমারও আর শ্রীপাদপদ্ম দর্শনের সুযোগ হলো না।

আরও কিছুদিন পর যখন অশীতিপর পিতামাতা রেখে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কালগ্রাসে পতিত হলেন, তখন আমার শোকাতুরা মাতাকে নিয়ে পূজনীয় শরৎ মহারাজের নিকট আমি যাতায়াত করতে লাগলাম, তখন উদ্বোধন মা-শূন্য। প্রাণ হাহাকার করত; মনে মনে বলতাম : মাগো এই তো শাশুড়ি ছাড়া আসা হলো, তখন কেন আনলে না মা? আর যে তোমায় দেখতে পেলাম না। পূজনীয়া গোলাপ-মা, যোগীন-মা কত সান্ত্বনা দিতেন, কত যত্ন করতেন, কিন্তু অনেক দিন যাবৎ প্রাণের হাহাকার যায়নি, ক্রমে সব সয়ে গেল।

তখন পূজনীয় শরৎ মহারাজের কাছে বালিকা কন্যা-দুটির দীক্ষার জন্য প্রার্থী হলাম। মহারাজ সানন্দে সম্মতিদান করলেন। ছোটটি নিতান্ত বালিকা, তবুও কৃপা করলেন। যদি কোনদিন গিয়ে বলেছি :

"মহারাজ, ও আমার কথা শোনেনি", তখনই তিনি বলতেন : "ওদের মহারাজ ছোটবেলা কত দুষ্টু ছিল জান না তো মা!" তারপর তাকে বলতেন : "হ্যাঁরে, দুষ্টুমি করেছিস, তোকে বেড়ালছানার মতো খাটের পায়ায় বেঁধে রাখব। তোকে শাস্তি দিলুম—যা, সব ঠাকুরদের ছবিতে ধূপ দিয়ে আয় বলে একটি দীর্ঘ ধূপ জ্বালিয়ে ওর হাতে দিতেন। উদ্বোধনে তৎকালে ওর নাম ছিল 'মহারাজের বেড়ালছানা'। এত স্নেহ-যত্ন ওরা এত শিশুকালে পেয়েছিল যে, এখন হয়তো তা ভাল করে স্মরণ করতে পারে না।

এমনি করে সকল মাতৃহারা সন্তানদের ব্যথা বিশালবক্ষে শরৎ মহারাজ নিজে নিয়ে সকলকে সান্ত্বনা দিতেন। তাঁর স্নেহ-ভালবাসায় যেন মায়ের স্নেহেরই স্বাদ পেতাম। মায়ের প্রাণটি নিয়েই তিনি 'মায়ের বাড়ী'তে সকলের মন ভরিয়ে রাখতেন।

আমাদের মেয়েরা বাল্যকালে দীক্ষাহেতু গুরুসঙ্গ পায়নি বলাতে একদিন একজন প্রাচীন সন্ন্যাসী বলেছিলেন : "ঐসব সিদ্ধগুরুর সঙ্গের প্রয়োজন হয় না, ওঁদের একবার চোখের দেখা দেখলেও কাজ হয়।" তখন যেন মনের একটা কুয়াশা সরে গেল, নিজের সম্বন্ধে তখন মনে হলো—তাইতো, তবে দুঃখ করি কেন? শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন একবার হলেও তো হয়েছে!

মা অন্তরের অনুভূতির ধন; রোগে, শোকে, সাংসারিক নানা ঝঞ্ঝাটে মার স্পর্শ সদাই অনুভব করি, করুণারূপিণী স্নেহক্রোড়ে ধারণ করে রয়েছেন। সে তো বারেবারেই অনুভব করেছি, তারই দু-একটি কথা দিয়ে প্রসঙ্গ শেষ করব।

মা বেশি কিছু নিয়মে বাঁধেননি। শুধু দুটি কথা—"অনিবেদিত বস্তু খেও না ও শ্রাদ্ধান্ন খেও না।" আমরা দুই জায়ে প্রাণপণ নিষ্ঠার সহিত মায়ের কথাগুলি পালন করতে চেষ্টা করতাম। নিজের পিতৃশ্রাদ্ধেও সারাদিন উপবাসী থেকে রাত্রে বাড়ি এসে খেয়েছি। লোকে কত কিছু মন্তব্য প্রকাশ করত। পরে যখন 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' প্রকাশিত হলো, তাতে দেখি কৃপাময়ী মা জনৈক ভক্তকে

বলছেন ঃ "তা তোমরা সংসারী লোক, নিজের বাড়িতে হলে আর কি করবে? প্রসাদ খেও।" তখন আমরা বলাবলি করি, মা তো আমাদের এরকম বলেননি।

মা নিজে শ্রীমুখে বলেছেন ঃ "হ্যাঁ মা, আশ্রয় দিলুম বৈকি।" এ আশ্বাসের মর্ম বহুবার অনুভব করেছি অন্তরে। 'মায়ের কথা'য় দেখি, মা যেমন করে বাসনা থেকে রাধুকে রক্ষা করতেন, ঠিক তেমন করেই আমাদেরও রক্ষা করেন। রামনাদের রাজা কোষাগার খুলে দিতে চাইলে রাধু যেমন একটি পেন্সিল ভিন্ন কিছু চায়নি, সেইরকম [লখনৌতে থাকাকালীন] আমার লক্ষপতি পিতা একবার মার্কেটে নিয়ে গিয়ে আমায় যখন বললেন ঃ "তোমার যা ইচ্ছা নাও", সেইসময় দু-চার হাজার টাকার জিনিস কিনলেও কোন ক্ষতি হতো না, তখনি মনে হলো—মা নির্বাসনা হতে বলেছিলেন। আমার চোখের ওপর মাতৃমূর্তি ভেসে উঠল, বলে ফেললাম ঃ "কিছুই চাই না বাবা, সবই তো আছে, মিছামিছি এই লখনৌ থেকে কলকাতা অবধি বোঝা বাড়বে।" আমি বাড়ি এসে সকলের কাছে তিরস্কৃত হয়েছিলাম—এমন সুযোগ হারিয়েছি বলে। কিন্তু তারা তো জানে না, আমার প্রাণে বসে কে আমায় কিছু কিনতে দেননি! নীরবে আমি কৃপাময়ী মাকে স্মরণ করেছিলাম।

আরও একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করি মায়ের অপার কৃপা স্মরণ করে। যখন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী কৃপা করে আশ্রয় দিলেন, তখন থেকে কেবলই মনে হতো, কবে মা কৃপা করে আমার স্বামীর মতিগতি ঐ পথে নিয়ে যাবেন। মার কাছে নিয়ত সেই প্রার্থনা জানাতাম। আরও মনে হতো এই কারণে যে, বাড়ির অনেকে একে একে কেউ-বা পূজনীয় শরৎ মহারাজের কাছে, কেউ-বা তখনকার মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের কাছে দীক্ষা নিচ্ছে। একবার যখন একটি দেবরের ও তার বধূর দীক্ষার দিন স্থির হয়েছে মহাপুরুষজীর কাছে, তখন আমার স্বামী কার্যোপলক্ষে রয়েছেন সুদূর বিলাসপুরে। দীক্ষার আগের দিন আমার কেবলই

মনে হচ্ছিল—মা করুণাময়ী, করুণা করে ওঁর মতিগতি এই দিকে করে দাও মা। তখন মা বহুদিন লীলা-সংবরণ করেছেন। হঠাৎ সন্ধ্যার সময় স্বামী বিলাসপুর থেকে এসে পড়লেন। পরের দিন তিনি নিয়মিত প্রাতরাশের পর আমার অনুরোধে ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর দীক্ষা দেখতে আমাদের সঙ্গে মঠে গেলেন। তাদের দীক্ষা নিতে যাবার সময় আমি কাতরে মাকে আমার আবেদন জানাচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ আমার স্বামী এসে জানালেন যে, মহাপুরুষ মহারাজ তাঁকেও কৃপা করতে চেয়েছেন। অস্নাত, তার ওপর খেয়েও এসেছেন বলে তিনি ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। আমি তৎক্ষণাৎ বললাম : "তা হোক, কৃপালাভের কালাকাল নেই, এখনই দীক্ষা নাও।" এইভাবে মহাপুরুষজীর কৃপা লাভ করে রাত্রের গাড়িতেই [তিনি] কর্মস্থলে চলে গেলেন। আমি বিস্ময়ে জননীর অপার কৃপা স্মরণ করতে লাগলাম।

এই ঘটনার কিছুদিন পর আমরা আরেকদিন মঠে গিয়েছি, সাংসারিক নানা ঝঞ্ঝাটে আমার স্বামীর অন্তর অত্যন্ত বিচলিত। আমরা প্রণাম করে মাথা তুলতেই শিবপ্রতিম আশুতোষ মহাপুরুষ মহারাজ বলে উঠলেন : "তোর কি চাই? বল কি চাই?" তখন যেন বরাভয়কর হয়ে তিনি চতুর্বর্গ-প্রদানে উদ্যত! আমার মনে ভেসে উঠল ঠাকুরের সেই কথা—"রাজার সঙ্গে দেখা হলে কি লাউ-কুমড়ো চাইবে?" আর মা বলেছেন : "নির্বাসনা"। তখনো মহাপুরুষজী উত্তরের প্রতীক্ষায় আমার মুখপানে চেয়ে আছেন; মা বলালেন—"ঠাকুরের পায়ে যেন রতিমতি হয় মহারাজ, আর কিছু চাই না।" মহারাজ অত্যন্ত খুশি হয়ে বললেন : "হবে, হবে,—তোদের হবে!"

এই যে সাক্ষাৎ শিবের কৃপা হজম করা, একি মায়ের আশ্রয় না পেলে হতো? আশ্রয় দিয়েছেন বলেই, মা নিজ শ্রীমুখে স্বীকার করেছেন বলেই এই রকম করে সবসময় নিজের সন্তানকে রক্ষা করেন। তখন কিছু চেয়ে ফেললেই কত যে বাসনার জালে জড়িয়ে পড়তে হতো তা কে জানে?

আরেকবার পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজ—তখন তিনি মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ—আমার দেবরের লালগোলাস্থিত বাসাবাড়িতে কৃপা করে ১৯৩৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর তাঁর সারগাছির আশ্রম থেকে এসে সে-রাত্রি আমাদের কাছে রইলেন। অল্পপরিসর স্থান, মাত্র তিনটি ঘর। পূজনীয় মহারাজ পাশের ঘরেই, মধ্যে দরজা। ভোরবেলা দরজা খুলে তাঁকে প্রণাম করতেই রহস্য করে বললেন : "তোমাদের বাড়ি একবছর রয়েছি।" বিস্মিত আমি বলে উঠলাম : "সেকি মহারাজ!" তিনি হেসে বললেন : "৩৪ সালে এলাম, আজ ৩৫ সাল। একবছর হলো না?" আমরা সবাই হেসে উঠলাম।

প্রভাতে বাগানে ইজিচেয়ার পেতে সদানন্দ শিশুপ্রকৃতি মহারাজ আমাদের নিয়ে নানা গল্প করছেন, আমরাও তাঁর শিশুপ্রকৃতিতে নিঃসঙ্কোচ। অন্তরে বাইরে কোন অর্গল নেই। বলে বসেছি : "মহারাজ, ১লা জানুয়ারি আজ; আজকের দিনে ঠাকুর কল্পতরু হয়েছিলেন; আপনিও আজ আমাদের কল্পতরু হোন।" তখনই বালকসুলভ ভাব ছেড়ে গম্ভীর হয়ে মহারাজ বললেন : "বল, তোমার কি চাই।" অমনি করুণাময়ী জননীর পুণ্যবাণী মনে জেগে উঠল—"নির্বাসনা, নির্বাসনা"। তখন জননীই মুখে বলিয়ে দিলেন : "মহারাজ, আর কিছু নয়, আমি গরম গরম খাবার করে দেব, আর আপনি আমার কাছে বসে খাবেন।" মহারাজের রূপ যেন বদলে গেল, বলে উঠলেন : "বেশ তাই হবে; তুমি যা দেবে তাই খাব।" আমি আনন্দে আত্মহারা—জননী আমায় রক্ষা করেছেন। আর পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজও শিশুসুলভ প্রকৃতিতে বসে বসে গরম খাবার খেয়ে—আমার প্রাণের সেবা নিয়ে আমায় ধন্য করেছেন।* □

* উদ্বোধন, ৫৫তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৌষ ১৩৬০, পৃঃ ৬৭৫-৬৮০

মাতৃস্মৃতি

নির্মলনলিনী মিত্র

স্বামী সুবোধানন্দের ভাইঝি নির্মলনলিনী মিত্রের (স্বামীর নাম কালীকিঙ্কর মিত্র) বয়স বর্তমানে (ডিসেম্বর ১৯৯৬) ৯৪ বছর। তিনি নিজের হাতে তাঁর স্মৃতিকথাটি লিখেছেন।—সম্পাদক

আমার কাকা ছিলেন খোকা মহারাজ—স্বামী সুবোধানন্দ। মহারাজরা ছিলেন আট ভাই। মহারাজ ছিলেন ভাইদের মধ্যে তৃতীয়। আমার বাবা সুরেশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন তাঁর ওপরের ভাই—ভাইদের মধ্যে দ্বিতীয়।

১৩২১ সালের ফাল্গুন (১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি) মাসে ঠাকুরের জন্মতিথির দিন সকালে আমাদের বাড়ির সবাই ঘোড়ার গাড়ি করে বেলুড় মঠে গিয়েছিলাম। গিয়ে শুনলাম, মা আসবেন। আমরা সবাই পুরনো মন্দিরে ও স্বামীজীর ঘরে প্রণাম করে দোতলায় গঙ্গার দিকের বারান্দায় গিয়ে বসলাম। ঘণ্টাখানেক পর মা এসেছেন বলে সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। মা যে-ঘরে বসেছিলেন আমরা সবাই সেখানে তাড়াতাড়ি গেলাম। দেখলাম, আরও অনেক ভক্ত মাকে প্রণাম করার জন্য মায়ের পায়ে যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন। একজন, মনে হয় গোলাপ-মা, বললেন : "দাঁড়াও, মা আগে স্থির হয়ে বসুন। তারপর প্রণাম করবে।" প্রণাম শুরু হলো। আমাদের বাড়ির বড়দের সবাইকে মা চিনতেন। আমি যখন প্রণাম করছি তখন মা আমাকে দেখে আমার ন'কাকিমাকে (কাশীশ্বরী ঘোষ—ন'কাকা অর্থাৎ খোকা মহারাজের পরের ভাই, ভাইদের মধ্যে চতুর্থ, সিদ্ধেশ্বর

ঘোষের[১] স্ত্রী) প্রশ্ন করলেন : "এটি কে—আগে তো দেখিনি?" ন'কাকিমা বললেন : "আমার মেজ ভাসুরের ছোট মেয়ে।" মা বললেন : "ওমা, এর মধ্যে বিয়ে হয়ে গেছে! কোথায় শ্বশুরবাড়ি হলো?" ন'কাকিমা বললেন : "ভবানীপুরের মিত্তির বাড়ি। খুব ভাল বিয়ে হয়েছে।" তখন মা আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেন : "সুখী হও মা।" প্রসাদ পাওয়ার সময় মা নিজের হাতে পরিবেশন করে আমাদের খাওয়ালেন।

মায়ের গায়ের রঙ তখন যা দেখেছিলাম, খুব ফরসা ছিল না—তামাটের দিকে। তবে বয়সের জন্য তখন তাঁর গায়ের রঙ ঐরকম চাপা হয়ে গিয়েছিল, মা-কাকিমাদের কাছে শুনেছিলাম। আগে মায়ের গায়ের রঙ বেশ উজ্জ্বল ছিল। মায়ের মাথার চুল ছিল খুব দীর্ঘ, কালো এবং সুন্দর। ফিরে আসার সময় মা আমাদের সঙ্গে বাড়ির জন্য অনেক লুচি আর বোঁদে প্রসাদ দিয়েছিলেন। মাকে আমি সেই একবারই দেখেছিলাম। আমার বয়স তখন ১৩ বছর। কিন্তু সেই একবারের দেখার স্মৃতি এই ৯৪ বছর বয়সেও আমার কাছে অমলিন।* □

---

১ ঠাকুরের শেষ অসুখের সময় কাশীপুরে বালক সিদ্ধেশ্বর আসেন। বাবুরাম মহারাজ সিদ্ধেশ্বরকে ঠাকুরের কাছে নিয়ে যেতে চাইলে তিনি যাননি ; বলেছিলেন, দাদা সন্ন্যাসী হবেন, আবার তিনিও যদি হয়ে যান তাহলে বাড়িতে মায়ের কষ্ট হবে। বাবুরাম মহারাজ তখন ঠাকুরের প্রসাদী সুজির পায়েস সিদ্ধেশ্বরকে খেতে দেন। প্রসাদ পাওয়ার পর তাঁরও মনে হয়, বাড়ি ফেরা তাঁর পক্ষে অসম্ভব, তিনিও সাধু হবেন। পরে মায়ের কষ্ট হবে ভেবে মন শক্ত করে তিনি বাড়ি ফিরে আসেন। পরবর্তী কালে স্বামীজী তাঁকে দীক্ষা দিতে চাইলে তিনি উত্তর দেন : "আমি কোন মানুষের কাছে দীক্ষা নেব না।" স্বামীজী শুনে চোখ বড় বড় করে বললেন : "কী বললি, আমি মানুষ?" কিছুক্ষণ পর বলেন : "আচ্ছা, তোকে এখান (বেলুড় মঠ) থেকেই দীক্ষা নিতে হবে।" এর অনেক পরে একদিন মহাপুরুষ মহারাজ, খোকা মহারাজ এবং সিদ্ধেশ্বর কাশীর গঙ্গার ঘাটে বেড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ মহাপুরুষ মহারাজ তাঁকে দীক্ষা নেওয়ার কথা বলেন। সিদ্ধেশ্বরের সেই একই উত্তর। তখন খোকা মহারাজ বললেন : "উনি তো মানুষ নন, উনি মহাপুরুষ।" তখন সিদ্ধেশ্বর দীক্ষা নিতে রাজি হন। মহাপুরুষ মহারাজের আদেশে তিনি একটি রুদ্রাক্ষের মালাও কিনলেন। মহাপুরুষ মহারাজ তাঁকে বললেন : "আমরা মণিকর্ণিকা ঘাটে যাচ্ছি, তুমি সেখানে গিয়ে গঙ্গায় মালাটি ধুয়ে নাও।" সিদ্ধেশ্বর তাই করলেন। মহাপুরুষ মহারাজ তখন সেই মালাটি নিয়ে সূর্যের দিকে হাত তুলে (তখন দুপুর বারটা বাজে) [দীক্ষা-]মন্ত্র বলে মালাটি তাঁকে গলায় পরতে বললেন। তিনি অনুভব করলেন, তাঁর মধ্যে যেন একটা কি শক্তি এসেছে।—সম্পাদক

* উদ্বোধন, ৯৭তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪০২, পৃঃ ২১৭

মাতৃদর্শনের স্মৃতি

জিতেন্দ্রচন্দ্র দত্ত

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিক্ষা ও আদর্শে জীবন গঠন করার উদ্দেশ্যে এবং যুবকদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী আলোচনা করার জন্য আমরা কয়েকজন বন্ধু (বর্তমানে বাংলাদেশের) ময়মনসিংহে 'মহাকালী পাঠশালা'র একটি প্রকোষ্ঠে নিয়মিত সমবেত হতাম। সেটা ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ঘটনা। ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের মার্চে আমরা এই পাঠশালার পক্ষ থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম লীলাসহচর এবং ঈশ্বরকোটি স্বামী প্রেমানন্দকে ময়মনসিংহে নিয়ে আসি। তিনি এই সময় আমাদের বাড়িতেই সাত-আটদিন ছিলেন। এই কয়টা দিন তাঁর সেবাধিকার পেয়ে আমি ধন্য হয়েছিলাম। এরপরে তিনি যে-কয়টা দিন ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে ছিলেন, সেই দিনগুলিতেও তাঁর সঙ্গলাভ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এই বছরই দুর্গাপূজার পরে আমি পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর কৃপালাভ করি।

কার্যোপলক্ষে আমাকে বহুবার কলকাতায় আসতে হতো এবং সেই সুযোগে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন ও প্রণাম করার সৌভাগ্য হয়েছিল। বেশির ভাগ দিনই প্রণাম করার সময় ভক্তেরা উপস্থিত থাকত। তাই তাঁর সঙ্গে কথা বলার বিশেষ সুযোগ তখন পাইনি। কিন্তু একদিন শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করার সময় তিনি তাঁর হাত দিয়ে আমার মাথা স্পর্শ করে আশীর্বাদ করেছিলেন এবং তাতে আমি বড় কৃতার্থবোধ করেছিলাম। আরেকদিন তাঁর কাছে সাধন সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করাতে তিনি শুধু বললেন : "স্মরণ রেখ।" তাঁর এই কথা-দুটি শুনে আমার মনে হলো, তিনি আমাকে তাঁর কথাই স্মরণ রাখতে বলছেন। বুঝলাম, সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীজগদম্বা কৃপা করে আমার স্বরূপ আমার কাছে ব্যক্ত করলেন।

অন্য একদিন উদ্বোধনে এসে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে তাঁর পদপ্রান্তে বসে আছি। তিনি তখন খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসেছিলেন। এই সময় হঠাৎ তাঁর ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের যে-ফটো তিনি পুজো করতেন সেটি এবং দেওয়ালে টাঙানো শ্রীশ্রীকালীর পটের দিকে তাকিয়ে তিনি

বললেন ঃ "ইনি (অর্থাৎ শ্রীশ্রীঠাকুর) আর ইনি (অর্থাৎ শ্রীশ্রীকালী) এক।" 'এক' শব্দটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শরীরে একটা ঝাঁকুনি এল এবং তাঁর সমস্ত শরীর একেবারে শক্ত হয়ে গেল। তাঁর শরীর তখন একটু কাতভাবে ছিল। এভাবে নিষ্পলক দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীমা শ্রীশ্রীকালীর পটের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বেশ কিছুক্ষণ পর তাঁর শরীর আবার শিথিল হয়ে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হলো। আমি অবাক হয়ে শ্রীশ্রীমায়ের এই সমাধিমূর্তি দর্শন করছিলাম। মনে হচ্ছিল, এই সমাধি লাভ করা তাঁর পক্ষে কত সহজ! তিনি মুখে যা উচ্চারণ করেছিলেন, সেই সত্যকে তিনি তখনই প্রত্যক্ষ করেছিলেন—বুঝতে পারলাম।[১]

স্বামী প্রেমানন্দকে একদিন বলতে শুনেছিলাম ঃ "শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যে ভাব এবং মহাভাবের অদ্ভুত প্রকাশ সর্বদা দেখে আমরা ধন্য হয়েছি। শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যেও এই ভাব ও মহাভাব সর্বদা বিরাজ করছে। কিন্তু এ কী মহাশক্তি যে, সেই ভাব ও মহাভাবকে তিনি সর্বদা লুকিয়ে রেখেছেন, বাইরে তা বিশেষ প্রকাশ হতে দেন না!" প্রেমানন্দজীর এই কথার সত্যতা সেদিন আমি নিজেই উপলব্ধি করেছিলাম।* □

সংগ্রহ ঃ সুধীরা দত্ত

---

১ ভগিনী নিবেদিতাকে শ্রীমা বলেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কালীর অবতার (দ্রষ্টব্য নিবেদিতা লোকমাতা—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ১ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১ম সং, ১৯৬৮, পৃঃ ১৮৪-১৮৫)। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, শ্রীরামকৃষ্ণের দেহান্তের পর শ্রীমা তাঁকে "মা-কালী গো" বলে সম্বোধন করে কেঁদেছিলেন। তিনি যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ ও মা-কালীর মধ্যে অভেদত্ব ঘোষণা করেছেন, তেমনি তাঁর নিজের সঙ্গেও কালীর অভেদত্ব স্বীকার করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাইপো শিবরামের কাছে শ্রীমায়ের স্বরূপ-স্বীকারের ঘটনাটি স্মরণীয়। এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য প্রণীত 'শ্রীশ্রীসারদাদেবী' গ্রন্থে নিশিকান্ত মজুমদার এবং সুরেন্দ্র রায় উল্লেখিত দুটি ঘটনাও মনে আসে (দ্রঃ ১০ম সং, ১৩৯৩, পৃঃ ১১৭, ১২২)। শ্রীমায়ের মুখেই শোনা গিয়েছে যে, ডাকাত-বাবা তাঁকে বলেছিলেন তেলো-ভেলোর মাঠে তিনি শ্রীমায়ের মধ্যে মা-কালীকে দেখেছিলেন। শ্রীমায়ের অন্যতম সেবক স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ তাঁর ১২.৬.১৯৮৪ তারিখের চিঠিতে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দকে লিখেছিলেন ঃ "[শ্রীমায়ের স্বরূপ সম্পর্কে] একটি গোপনীয় বিষয় জানি। তিনি [শ্রীমা] একজনকে নিজের বীজ 'হ্রীং' নয়, 'ক্রীং' বলেছিলেন। মানে দুর্গার বীজ নয়, কালীর বীজ। যেমন পূজনীয় শিবু-দার কাছে কালী বলে স্বীকার করেছিলেন ; তেমনই একজনের কাছে... এটি স্বীকার করেছিলেন।"—সম্পাদক

* উদ্বোধন, ৯৬তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪০১, পৃঃ ২৪৫

মাতৃস্মৃতি

জিতেন্দ্রকুমার সাহা

জিতেন্দ্রকুমার সাহার বাড়ি ছিল অধুনা বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার খুপীপাড়া গ্রামে। পরবর্তী কালে তিনি পশ্চিমবঙ্গের নবদ্বীপে বাস করতেন। তাঁর জন্ম ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে। ৫ অক্টোবর ১৯৯৪ বাঁশবেড়িয়ায় (জেলা—হুগলী) ৯৬ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।—**সম্পাদক**

আমি তখন (১৯১৯) ২১ বছরের যুবক। হঠাৎ একদিন বন্ধু মন্মথ রায়ের কাছ থেকে চিঠি পেলাম—"চলে এস, মায়ের কাছে যেতে হবে।" মা তখন আছেন কোয়ালপাড়ার জগদম্বা আশ্রমে।

চৈত্র মাস। মাঠফাটা রোদে গরুর গাড়ি করে দুপুরবেলা চার বন্ধু যখন কোয়ালপাড়া আশ্রমের দোরগোড়ায় গিয়ে দাঁড়ালাম তখন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী কেশবানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "আপনাদের সবারই বাড়ি কি পূর্ববাংলায়?" আমরা বললাম ঃ "হ্যাঁ"। মহারাজ বললেন ঃ "মা সকালে বলছিলেন, 'পূর্ববঙ্গের আমার কটি ছেলে আসবে। ওরা মাছ ভালবাসে, ওদের জন্য কিছু মাছের জোগাড় করো।' "

মায়ের সঙ্গে আমাদের কোন পূর্বপরিচয় ছিল না। মাকে জানিয়েও আমরা আশ্রমে যাইনি। তবু মা জেনেছেন, আমরা আসছি! আমাদের আসার খবর পেয়ে বিদেশ থেকে অনেকদিন পরে সন্তান বাড়ি এলে মা যেমন ব্যাকুল হয়ে ওঠেন—ঠিক তেমনি মমতা নিয়ে মা কেশবানন্দ মহারাজকে বলেছিলেন ঃ "ওরা খুব কষ্ট করে এসেছে। ওদের জন্য কিছু দুধ, চিনি, সুজি এনে দাও। আমি খাবার তৈরি করে দেব।" সেই দারুণ গরমের মধ্যেও উননের আগুনের তাপ

অগ্রাহ্য করে মা নিজের হাতে এইসব সন্তানদের জন্য পিঠে পায়েস তৈরি করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আশ্রমে। মা ছিলেন কাছেই জগদম্বা আশ্রমে। সেদিন মায়ের দর্শন পাইনি। কেশবানন্দ মহারাজ বললেন : "কাল সকালে দর্শন পাবেন।" আমরা দীক্ষা নেবার বাসনা নিয়ে এসেছি বলায় কেশবানন্দ মহারাজ বললেন : "আজই কটি ছেলে ফিরে গেল। মা দীক্ষা দেননি—ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়নি বলে।" একথা শুনে আমরা একটু বিমর্ষ হয়ে পড়ি। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মায়ের কৃপাপ্রাপ্ত শৌর্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। তিনি ভরসা দিলেন : "মাকে ডাক। ঠিক হয়ে যাবে।"

সারা রাত ঘুম নেই। একই চিন্তা—রাত পোহালে মা কি বলবেন। কৃপা হবে কি হবে না? পাখিরা ডাকতে আরম্ভ করেছে। মহারাজ এসে ডাকলেন : "আপনারা উঠে পড়ুন। স্নান করে প্রস্তুত হয়ে থাকুন। নইলে মা যখন ডাকবেন, তখন আর সময় পাবেন না।" মহারাজের কথামত আশ্রম-সংলগ্ন পুকুরে স্নান সেরে শুদ্ধ মনে আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম সেই পরম লগ্নের জন্য, সেই পরম বাঞ্ছিত আহ্বানের জন্য।

অবশেষে সব দ্বিধা, সব দ্বন্দ্বের অবসান হলো। এল সেই ডাক। মা তখন ঠাকুরঘরে পূজা শেষ করে আসনে বসে আছেন, যেন ভক্তি মূর্তি ধরে বসে আছেন মাটির মন্দিরে। প্রণাম করতেই আমাকে মা জিজ্ঞাসা করলেন : "কোন্ মন্ত্র ভালবাস?"

আমি বললাম : "মা, আমি জানি না। আপনার কাছে এসেছি—আপনি যে-মন্ত্র দেবেন, জানি তাতেই আমার কল্যাণ, তাতেই আমার মঙ্গল হবে।"

মা বললেন : "তোমাদের কুলমন্ত্র—বৈষ্ণবমন্ত্র। বৈষ্ণবমন্ত্রই নাও।" হয়ে গেল দীক্ষা। দীক্ষা নেবার আগে আমি জানতাম না আমাদের কুলমন্ত্র। পরম পরিতৃপ্তি নিয়ে দু-একদিন পরে বাড়িতে ফিরে এলাম। বাড়ি এসে শুনলাম, আমাদের কুলমন্ত্র বৈষ্ণবমন্ত্র। বুঝলাম, মা অন্তর্যামিনী।

একজন বলেছিলেন, আমার হাতের করগুলি নাকি শুদ্ধ জপের উপযুক্ত নয়। তাই করে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে মন বড়ই ইতস্ততঃ করতে লাগল। ভাবলাম, মা যদি অনুমতি দেন, মালায় জপ করব ইষ্টমন্ত্র। মায়ের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে পত্র দিলাম, মালায় জপ করা যাবে কিনা। গেলে কোন্ মালায় জপ করব ইষ্টমন্ত্র।

দূরের কাছের সব সন্তানের মনের কথা যিনি জানেন, জানতে পারেন, তিনিই তো মা। পূর্ণিমার রাত। জ্যোৎস্নার ধবধবে আলোর প্লাবন নেমেছে পৃথিবীর বুকে। আমি গভীর নিদ্রায় মগ্ন। স্বপ্নে সাক্ষাৎ দিলেন মা। তুলসীর মালা হাতে নিয়ে দিব্যমূর্তিতে মা দাঁড়িয়ে আছেন আমার সম্মুখে। সেই আলোর ঝলকানিতে ঘুম ভেঙে গেল। স্বপ্ন শেষ। রাত শেষ। পরদিন এল কেশবানন্দ মহারাজের চিঠি—মা আমার জন্য তুলসীর মালা বরাদ্দ করেছেন।

একবার মনে উঠল, বাড়িতে জগদ্ধাত্রীপূজা করব। মা তখন অপ্রকট। একদিন রাত্রে দেখলাম—তিনি গ্রামের কালীমন্দিরের সামনে বসে আছেন। হঠাৎ মন্দির আলোয় আলোময় হয়ে উঠল। আমি তাকিয়ে আছি মন্দিরে মা-কালীর মূর্তির দিকে। মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল কালীমূর্তি—আমার সামনে সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রী-মূর্তি। তারপর সে-মূর্তিও মিলিয়ে গেল। এবার দেখলাম শ্রীশ্রীমায়ের মূর্তি। তারপর আবার সেই কালীমূর্তি, আবার জগদ্ধাত্রী-মূর্তি। বুঝলাম, যিনি জগদ্ধাত্রী, তিনিই কালী, তিনিই মা সারদা।* □

অনুলিখন ঃ হৃষীকেশ ভট্টাচার্য

---

* উদ্বোধন, ৯৭তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ ১৪০২, পৃঃ ১৮৪

মায়ের কথা

বাসনাবালা নন্দী

বাসনাবালা নন্দীর বাড়ি কামারপুকুরে (মুকুন্দপুরে)। বাবার নাম অধরচন্দ্র নায়ক, মায়ের নাম জ্যোতিবালা। বাসনাবালার জন্ম ১৩০৬/১৩০৭ সালে (১৮৯৯/১৯০০ খ্রীস্টাব্দে)। সুতরাং বর্তমানে (১৯৯৬) তাঁর বয়স ৯৬/৯৭ বছর। মাত্র ৭ বছর বয়সে হৃষীকেশ নন্দীর সঙ্গে বাসনাবালার বিবাহ হয়। বিবাহের কয়েকদিন পরেই তিনি বিধবা হন। স্বামীকে এখন তাঁর মনে পড়ে না, মনে আছে শুধু স্বামীর নামটি। তাঁর যখন বছর দশেক বয়স, তখন তিনি জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতে কাজ করতে আসেন। তারপরে মায়ের দেহান্ত পর্যন্ত তিনি মায়ের কাছেই ছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য জীবনের বিরল সাক্ষিরূপে অপটু শরীর নিয়ে বৃদ্ধা আজও (১৯৯৬) রয়েছেন আমাদের মধ্যে।—সম্পাদক

মায়ের কাছে অনেকদিন বাস করেছি—তা বছর দশেক তো বটেই। জয়রামবাটীতে মায়ের বাড়িতে আমি মায়ের কাজ করতাম। জয়রামবাটীতেই বেশি থেকেছি। কখনো কখনো বাগবাজারের 'মায়ের বাড়ী'তেও থেকেছি। মাকে আমি 'মা'-ই বলতাম। যেদিন ভরত মহারাজের[১] বাগবাজারের 'মায়ের বাড়ী'তে দীক্ষা হয় সেদিন ভরত মহারাজের পরে মা আমাকেও দীক্ষা দিয়েছিলেন।[২] সেদিন মায়ের কাছে আরও দু-একজন কৃপা পেয়েছিলেন। কামারপুকুরে আমি মাকে বড় একটা আসতে দেখিনি, তবে ঠাকুরের জন্মতিথির সময় একবার কামারপুকুরে তেরাত্তির ছিলেন—মনে আছে। আমার বাবা ঠাকুরদের 'লক্ষ্মীজলা' একসময় চাষ করতেন। মা কামারপুকুরে থাকতে পারেননি

---

১ স্বামী অভয়ানন্দ।—সম্পাদক

২ ভরত মহারাজের দীক্ষা হয় ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে।—সম্পাদক

ঠাকুরের আত্মীয়দের দুর্ব্যবহারের জন্য। কিন্তু কোনদিন তাঁর মুখে তাঁদের সম্পর্কে কোন কটু কথা কেউ শোনেনি। দেবতা না হলে কি ঐরকম ক্ষমার শরীর হয়? ঠাকুরের ভাইপোরা লক্ষ্মীজলার ধান-চালের ভাগ মাকে কিছুই দিতেন না। আমার বাবা লক্ষ্মীজলায় চাষ করতেন বলে বাবার মুখে আমি একথা শুনেছিলাম। কিন্তু মায়ের মুখে কখনো কিছু শুনিনি। আমি যদি মাকে বলতাম ঃ "তোমার হকের জিনিস কেন ওরা তোমাকে দেবে না?" মা শান্তভাবে বলতেন ঃ "দ্যাখ মা, অমন ঠাকুরই চলে গেলেন—কি হবে ঐ দুমুঠো ধান-চাল নিয়ে? ওরা যদি নিয়ে সুখী হয়, নিক না!"

কামারপুকুরে মা যখন থাকতেন তখন কতদিন মায়ের ভাতের ওপরে একটু তরকারি জোটাতে মাকে হিমসিম খেতে হতো! ঠাকুরের ঘরের সামনে একটুখানি জায়গায় মা নিজের হাতে শাক বুনেছেন। লক্ষ্মী-দিদি সে-শাক পা দিয়ে মাড়িয়ে দিতেন। মা নিষেধ করাতে তিনি মায়ের সঙ্গে খুব ঝগড়া করেছিলেন, অনেক রূঢ় ও কটু কথা মাকে শুনিয়েছিলেন। মা নীরবে সেসব সহ্য করেছিলেন। লক্ষ্মী-দিদি আমাকে বলেছিলেন ঃ "বাসনা, জয়রামবাটীতে কেন কষ্ট করে পড়ে আছিস? কাজ করতে চাস তো দক্ষিণেশ্বরে দাদাদের কাছে গিয়ে থাক। তাহলে ভাল খেতেও পাবি, পরতেও পাবি।" আমি বলেছিলাম ঃ "সে হবেনি। মার কাছে আমি খুব সুখে আছি। মাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাবনি।"

ঠাকুরের আত্মীয়দের কাছ থেকে ভাল ব্যবহার পাননি বলেই তো মাকে বাধ্য হয়ে বাপের বাড়ি জয়রামবাটীতে থাকতে হয়েছিল। ঠাকুর মাকে কামারপুকুরে থাকতে বলেছিলেন। ঠাকুরের শরীর যাবার পর কয়েক বছর মা কামারপুকুরে ছিলেন, কিন্তু ওদের ব্যবহারে শেষপর্যন্ত মায়ের আর কামারপুকুরে থাকা হলো না। মায়ের মা সব খবর পেয়ে মাকে জোর করে জয়রামবাটীতে নিয়ে এসেছিলেন। কামারপুকুরের লোকেদেরও দুর্ব্যবহার ছিল। তার পেছনে অবশ্য ঠাকুরের

আত্মীয়দের উস্কানিও ছিল, বাবার কাছে শুনেছি। কামারপুকুরের লাহাদের প্রসন্নময়ী আর দু-একজন মাকে খুব ভালবাসতেন। তাঁরাই মায়ের খোঁজ-খবর নিতেন।

বাবার কাছে শুনেছি, ঠাকুরের কোন জাত-বিচার ছিল না। তাঁর ঐ ব্যবহারের জন্য গাঁয়ের বামুন-কায়েতরা অনেকে ঠাকুরের সমালোচনা করত। তবে গাঁয়ের নীচুজাতের লোকেরা 'গদাই ঠাকুর' বলতে অজ্ঞান হতো! বামুনরা বলত : "বাপ কেমন ছিল, আর ছেলে কেমন হলো দেখ! শুদ্দুরের বাড়িতে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে! ও কি বামুনের ছেলে?" চিনু শাঁখারির বাড়িতে গিয়ে ঠাকুর খেতেন বলে চিনু শাঁখারিকেও বামুনরা বকা-ঝকা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। শুধু শুদ্দুরদের সঙ্গে নয়, মুসলমানদের সঙ্গেও ঠাকুরের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। মুসলমানদের বাড়িতেও ঠাকুর যেতেন। সেইসূত্রে কামারপুকুরের ভুতু শেখ আর মান্দারণের মিঞাদের দেখেছি জয়রামবাটীতে মায়ের কাছে আসতে।

ঠাকুরের বন্ধুদের মধ্যে লাহাদের রামদাস আর যোগীন্দ্র, ছুতোরদের দুঃখীরাম, লায়েকদের শিবু (শিবপ্রসাদ) এবং মোড়লদের নটবরকে আমি দেখেছি। আমি কামারপুকুরে এলে মা আমাকে তাঁদের খোঁজ নিয়ে যেতে বলতেন। প্রসন্নময়ীকেও আমি দেখেছি। তখন তিনি এবং ঠাকুরের সাথীরা সব বুড়ো হয়েছেন। এঁরা জয়রামবাটীতে মায়ের সঙ্গে দেখা করতেও আসতেন। মাকে তাঁরা প্রণাম করতে গেলে মা তাঁদের প্রণাম নিতেন না। বলতেন : "তোমরা হলে ঠাকুরের সাথী—ঠাকুরের বয়সী। তোমাদের প্রণাম কি করে নিই?"

কত জন্মের ভাগ্য যে, মায়ের সেবা করতে পেরেছি, তাঁর চরণ ছুঁতে পেরেছি। মায়ের বাসনমাজা, ঘরে ন্যাতা দেওয়া, দোকান করে আনা—কত কাজই আমি করতাম। রাতে মায়ের পায়ে বাতের তেল মালিশও করেছি। সে কি পা! নরম যেন তুলোর মতো। মানুষের পা তো অমন হয় না! কামারপুকুরের দুর্গা ময়রার জিলিপি

আর সতীশ ময়রার মতিচুর ঠাকুরের খুব পছন্দ ছিল। মা মাঝে মাঝে কামারপুকুর থেকে ঐসব আনিয়ে জয়রামবাটীতে ঠাকুরকে ভোগ দিতেন। কামারপুকুরের ব্রাহ্মণদের মধ্যে উপেন ঘোষাল, প্রসন্ন ঘটক এবং সত্য মুখুজ্যেকে মায়ের খোঁজখবর নিতে দেখেছি। ওঁরা মাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করতেন। মা শেষবার যখন জয়রামবাটী থেকে কলকাতায় গেলেন, তখন অন্যান্যদের সঙ্গে আমিও বাগবাজারে গিয়েছিলাম। মা সেবার খুব ভুগেছিলেন। মা যে-রাতে আমাদের সবাইকে ছেড়ে গেলেন, তার পরদিন বেলুড় মঠে দাহ হয়ে যাবার পর সে কী বৃষ্টি! শিলাবৃষ্টি হয়েছিল। আকাশ-বাতাস-পৃথিবী সব বৃষ্টিতে ভেসে গেল। সবাই যেন মায়ের দুঃখে কাঁদছে। ক'দিন বাগবাজারে থাকার পর মহারাজরাই আমাকে কামারপুকুরে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

মায়ের বাড়িতে আমি বাসন মাজতাম, ঘর-দোর পরিষ্কার করতাম। মা রান্না করতেন, ধান সেদ্ধ করতেন। মায়ের রান্না খুব সুস্বাদু ছিল। হিঞ্চে শাকের চচ্চড়ি আর আমরুল শাকের টক মা রান্না করতেন। সে যে কী অমৃত রাঁধতেন তা বলে বোঝানো যাবে না! রাতের বেলা মাঝে মাঝে মা মুড়কি-জল খেতেন।

মায়ের গায়ের রঙ ছিল উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। মাথায় চুল ছিল খুব, আর খুব লম্বা। আমার খুব কম বয়সে বাবা, মা ও স্বামী মারা যায়। তাই আমার কেউ ছিল না। মা বলতেন ঃ "তোর হারালেও খুইতে নেই, ম'লেও কাঁদতে নেই।"

মা খুব বিড়াল ভালবাসতেন। একবার মা খেতে বসেছেন কিন্তু খাওয়া শুরু করেননি। আমারও ভাত বাড়া হয়েছে। বিড়ালকে তখনো ভাত দেওয়া হয়নি। একটা বিড়াল এসে আমার ভাত খেয়ে নিয়েছে। মা কিন্তু বিড়ালকে কিছু বকলেন না। আমাকে বললেন ঃ "বাসনা, তুই আমার ভাতটা খা।" মায়ের ভাত আমি আর মা দুজনে খেলাম। তাই এখনো বিড়ালকে খাইয়ে তবে আমি খাই।

|থায় কষ্ট পেতেন। আবার মায়ের গায়ে আমবাত
য়ের পায়ে যেমন বাতের তেল মালিশ করতাম,
মামবাতেরও তেল মায়ের গায়ে লাগাতাম। মায়ের
ফুলের মতো একটা চিহ্ন ছিল। পায়ে তেল মাখানোর
খাঁটরাতাম। মা হাসতেন আর বলতেন ঃ "খোঁটরালে

' অনেকবার দেখেছি। ঠাকুর একদিন স্বপ্নে আমায়
ফুঁ দিয়ে আমার কানে কানে বলেছিলেন ঃ "হরি
এই মন্ত্র সবাইকে বলবি, কিন্তু তোর মা (শ্রীশ্রীমা)
িয়েছে তা কিন্তু কাউকে বলবি না।" এই বয়সেও
শুনতে পাই। আমার মনে হয়, ওই যে ঠাকুর
দিয়েছিলেন, সেজন্যই কানটা আমার এখনো এত
র যদি তখন কানে ফুঁ না দিয়ে চোখে ফুঁ দিতেন
াখ-দুটোয় ভাল করে দেখতে পেতাম। এখন চোখে
কুন্দপুরের বুড়ো শিব[৩] আমাকে স্বপ্নে বলেছেন ঃ
র্থ, রামকৃষ্ণও সেই পদার্থ; আর সারদা—দুর্গা,
,

ই ছিলেন। ঠাকুরও ছিলেন শিব—কৈলাসপতি।
স্বপ্নে ঠাকুর দেখা দেন, মা দেখা দেন। তাই
পঙ্গু শরীর নিয়েও মহানন্দে রয়েছি। আমি তো
লবিধবা। কিন্তু মায়ের আশীর্বাদে কখনো কোন

বুড়ো শিবের মন্দিরে চন্দ্রমণি 'উন্মাদ' গদাইয়ের (শ্রীরামকৃষ্ণের)
' দিয়েছিলেন। দু-তিন দিন পর তিনি স্বপ্নে দেবাদিদেবের দর্শন
। চন্দ্রমণিকে বলেছিলেন ঃ "তোমার পুত্র পাগল হয়নি, ঐশ্বরিক
স্থা হয়েছে।" দেবাদেশে আশ্বস্ত হয়ে চন্দ্রমণি গৃহে ফিরে আসেন।
শিবের কাছে কেউ কোন কামনা পূরণের জন্য হত্যা দিত না।
থেকে অনেকেই হত্যা দিতে শুরু করেন।—সম্পাদক

কষ্ট-অভাব হয়নি। মনে হয়, দেহ যাবার পর থেকে মা আমাকে যেন কোলে করে রেখেছেন। কিছুদিন আগেও শরীর যথেষ্ট শক্তপোক্ত ছিল। ঠাকুর আমাকে স্বপ্নে সেই কবেই বলেছিলেন : "তোর কোনকিছুর অভাব হবে না, তোর মা-ই তোকে দেখবে এবং শেষে নিজে এসে নিয়ে যাবে।" কবে তিনি আসবেন নিতে—সেই আশায় দিন গুনছি। তাঁর আসার পথ চেয়ে বসে আছি।* □

অনুলিখন : অধ্যাপক তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া, হুগলী), দেবাশিস মহন্ত (গোলপার্ক, কলকাতা) এবং সলিল মুখোপাধ্যায় (ডানকুনি, হুগলী)

মায়ের কথা

রসন আলী খাঁ

জয়রামবাটীর সন্নিকটস্থ শিরোমণিপুর গ্রামের বাসিন্দা রসন আলী খাঁর কাছ থেকে এই বিবরণটি সংগ্রহ করেছেন অধ্যাপক তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৪ মে ১৯৯৩। তখন রসন আলী খাঁর বয়স ছিল প্রায় ৯১ বছর।—**সম্পাদক**

আমি যখন শ্রীমাকে দর্শন করি তখন আমার বয়স ১৩।১৪ বছর হবে। আমাকে জয়রামবাটীতে মায়ের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল মফেতি শেখ ও হামেদি শেখ। তারা সম্পর্কে আমার চাচা। আমাদের বাড়ি শিহড়ের পাশে শিরোমণিপুরে এবং তাদের বাড়ি শিরোমণিপুরের পাশের গ্রাম পরমানন্দপুরে। এই শিরোমণিপুর ও পরমানন্দপুরের অনেক পুরুষ ও মহিলার সঙ্গেই শ্রীমার বিশেষ স্নেহের সম্পর্ক ছিল। শিরোমণিপুরের আমজাদ, আমজাদের স্ত্রী মতিজান বিবি ও আমজাদের মা ফতেমা বিবিকে মা খুব স্নেহ করতেন। মা-ই তো প্রায় ওদের সংসার চালিয়ে দিতেন। আমজাদ প্রায়ই গাঁয়ে থাকত না। তখন সংসারে অভাব-অনটন পড়লে আমজাদের মা ও তার বউ জয়রামবাটীতে মায়ের বাড়িতে হাজির হতো। মা ওদের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না। ওদের পেটভরে গুড়-মুড়ি খেতে তো দিতেনই, সেইসঙ্গে মাথায় মাখার তেল, চাল, কাপড়, জিনিসপত্র—অনেক কিছুই দিতেন।

শিরোমণিপুর ও পরমানন্দপুরে তখন তুঁতের চাষ হতো। ইংরেজরা জমিদারদের মাধ্যমে দাদন দিয়ে চাষীদের তুঁতচাষে বাধ্য করত। জমিতে অন্য ফসল ফলানোর সুযোগ তারা পেত না। জমিদার আর ইংরেজদের ভয়ে এই দুই গ্রামের লোকেদের দিন কাটাতে হতো। দুটি গ্রামে

মুসলমানদের বাসই ছিল বেশি। চাষবাস ঠিকমত করতে না পারায় তাদের অভাব লেগেই থাকত। শিহড়, জিবটা, জয়রামবাটী, ফুলুই, শ্যামবাজার এলাকার ধনী বা মধ্যবিত্ত—কারোর মনেই মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশা রেখাপাত করেনি। কেবল মা-ই পরম মমতায় আমাদের দুঃখে সমব্যথী হতেন। জাতপাত, ধর্মটর্মের ভেদ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তিনি আমাদের জন্যও তাঁর কোল পেতে দিয়েছিলেন।

হামেদি শেখ, মফেতি শেখ, রমজান পাঠান গরুর গাড়ির ব্যবসা করত। তারা গরুর গাড়ি করে যাত্রীদের বিষ্ণুপুরে পৌঁছে দিত। আমি দেখেছি, অনেকবারই তারা শ্রীমা ও তাঁর ভাইঝিদের কোয়ালপাড়া থেকে জয়রামবাটী পৌঁছে দিয়েছে অথবা জয়রামবাটী থেকে কোয়ালপাড়ায় নিয়ে গেছে। কখনো জয়রামবাটী থেকে বিষ্ণুপুরে পৌঁছে দিয়েছে কলকাতার পথে। গরুর গাড়ির গাড়োয়ান হিসাবে যোগাযোগ ছাড়াও তাদের সঙ্গে মায়ের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। মায়ের নতুন বাড়ি যখন তৈরি হয়, তখন মাটির দেওয়াল দেওয়ার মজুরদের বেশির ভাগ ছিল শিরোমণিপুর আর পরমানন্দপুরের লোক। শিহড়ের কাছে মায়ের ভাইদের কিছু জমি চাষ করত মফেতি শেখ। হামেদি শেখের স্ত্রী নফিজান বিবি ও মফেতি শেখের স্ত্রী মজিরন বিবির সঙ্গেও মায়ের বিশেষ স্নেহের সম্পর্ক ছিল। তারা মাঝে মাঝেই মায়ের বাড়ি যেত। মা তাদের বলতেন 'বিবি বউ'। তাদের পেটভরে খাওয়াতেন, সুখ-দুঃখের কথা শুনতেন।

মায়ের যখন নতুন বাড়ি হয় তখন শরৎ মহারাজ জয়রামবাটী এসেছিলেন।[১] ঐসময় তিনি শিরোমণিপুর ও পরমানন্দপুরেও

---

১ জয়রামবাটীতে মায়ের নতুন বাড়ির প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু হয় ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে স্বামী সারদানন্দের ব্যবস্থাপনায়। সেবার তিনি একমাস জয়রামবাটীতে ছিলেন। নতুন বাড়িতে মা গৃহপ্রবেশ করেন ১৫ মে ১৯১৬। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে মাকে কলকাতায় নিয়ে আসার জন্য স্বামী সারদানন্দ জয়রামবাটী পৌঁছান এবং ৮ জুলাই মাকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা ফিরে আসেন।—সম্পাদক

এসেছিলেন। আমি তাঁকে দেখেছি। বিশেষ করে মায়ের নতুন বাড়িই শিরোমণিপুর ও পরমানন্দপুরের লোকদের মায়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার সুযোগ করে দিয়েছিল। তখন জাতপাত নিয়ে খুব সঙ্কীর্ণতা ছিল ঐ অঞ্চলের হিন্দুদের মধ্যে। হিন্দুরা মুসলমানদের ঘরে ঢুকতে দিত না। মায়ের নতুন বাড়ি হওয়ার সময় মুসলমান মজুরদের কাজে লাগানোর জন্য জয়রামবাটীর গোঁড়া বামুনরা অনেক কথা বলেছিল। ওরা মাকে 'ম্লেচ্ছ' বলতেও দ্বিধা করেনি। মায়ের আত্মীয়রাও মাকে বাড়ি তৈরির কাজে আমাদের লাগাতে নিষেধ করেছিল। মা লোকের সামনে মাথায় কাপড় ঢাকা না দিয়ে বেরতেন না। খুবই আস্তে আস্তে কথা বলতেন, কিন্তু যা অন্যায় তার বিরুদ্ধে নির্ভয়ে প্রতিবাদ করতেন। এব্যাপারে কোন আপসের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। গ্রামের লোকদের চাপে দু-একদিন মায়ের ঘরের কাজ বন্ধ ছিল। পরে শুনেছি—মা বলেছিলেন, কেবল আমাদের দিয়েই কাজ করাবেন। শেষপর্যন্ত মায়ের জেদ ও সঙ্কল্পের কাছে গ্রামের গোঁড়াদের নতি স্বীকার করতে হয়েছিল। তারপর থেকে মায়ের বাড়িতে আমাদের খুব যাতায়াত হতে লাগল।

তখন জয়রামবাটীতে কিছু পাওয়া যেত না। বড় হাট বলতে বদনগঞ্জ আর কোতুলপুর। শিরোমণিপুরে একটি ছোট হাট বসত। গ্রামের সব ঘরেই কিছু আনাজের চাষ হতো। মফেতি-চাচা তার সবজিখেত থেকে প্রায়ই লাউ, কুমড়ো, সজনে ডাঁটা, কচু প্রভৃতি আনাজপাতি নিয়ে মায়ের বাড়ি যেত। তার মুখে একটা ঘটনার কথা আমি শুনেছিলাম। সে বলত : "মা মানুষ নন, বড় পীর-দরবেশ হবেন। আমি একবার লাউ নিয়ে মায়ের বাড়ি গেছি। গিয়ে দেখি, নতুন বাড়িতে মা পুজোয় বসেছেন। আমি মায়ের বাড়িতে হামেশাই যাতায়াত করতাম বলে আমার কোন আড়ষ্টতা ছিল না। আমি গিয়ে ডাক দিলাম, 'মা! লাউ এনেছি।' আমার ডাক শুনে একজন মেয়েলোক এসে বলল, 'একটু বস, মা পুজোয় বসেছেন।' আমি দূর থেকে দেখতে পেলাম যে, মা পুজোর আসনে বসে আছেন। আমি উঠোনের

এককোণে লাউ ও লাউশাক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ মায়ের পুজোর আসনের দিকে তাকিয়ে দেখি, মা সে-আসনে নেই, আর মায়ের বসে থাকা দেহটা যেন আসন থেকে দুহাত ওপরে। মা ঠিক সেইভাবেই বসে আছেন, আসনটা নিচে পড়ে রয়েছে। মা শূন্যে বসে জপ করছেন! আমি মনে মনে ভাবছি, ভুল দেখছি না তো! চোখ মুছে আবার তাকিয়ে দেখি সেই দৃশ্য! বোকার মতো তাড়াতাড়ি মহারাজদের যেই ডাকতে যাচ্ছি, দেখি আর কিছু নেই। তারপর মা আসন থেকে উঠে আসতে তাঁকে প্রণাম করলাম। কিন্তু প্রণাম করতে ভয় হচ্ছিল খুব। মা আমাকে মুড়ি-গুড়, মাথার তেল দিতে বললেন একজন মহিলাকে। সেসব নিয়ে চলে এলাম, কিন্তু মাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হলো না।"

মুসলমান পুরুষরাও যেমন মায়ের বাড়ি যেত, মুসলমান মেয়েরাও যেত। শিরোমণিপুরের কয়েকজন বিবি ফল ও সবজি বিক্রি করতে জয়রামবাটী যেত। প্রৌঢ়া সাবিনা বিবি ছিল তাদের মধ্যে একজন। সে প্রায়ই মায়ের বাড়িতে যেত। আম-কাঁঠালের সময় সে কোতুলপুর থেকে আম-কাঁঠাল এনে জয়রামবাটীতে বিক্রি করতে যেত। মায়ের মা-ও তাকে খুব ভালবাসতেন। মা তাকে বলতেন 'খুড়ি'।

আগে শিরোমণিপুর-শিহড় অঞ্চলে খুব খেজুরগাছ ছিল। তখনকার লোকেরা খেজুরগাছের মাথা চেঁচে খেজুররসের ভাঁড় ঝুলিয়ে দিত। প্রায় শ-খানেক খেজুরগাছ থেকে রোজ খেজুররস নামত। সেই রস থেকে খেজুরগুড় তৈরি হতো। শাজাহান খাঁ, মজির খাঁ, সাদেক আলি, রফি মিঞা—এমন অনেকেরই খেজুররসের ব্যবসা ছিল। কোতুলপুর, বদনগঞ্জ, কামারপুকুর চটি, গোঘাট ইত্যাদি জায়গায় তারা খেজুরগুড় বিক্রি করত। তাদের অনেকের সেটিই ছিল জীবিকা। খেজুরগুড় তৈরির কাজ খুব পরিশ্রমসাধ্য। আমাদেরও খেজুররসের ব্যবসা ছিল। আমি অনেকবার খেজুররস ও খেজুরগুড় নিয়ে মায়ের বাড়ি গেছি। মা খেজুরের জিরেন রস ও খেজুরগুড় খেতে খুব ভালবাসতেন। আমি খেজুরগুড় নিয়ে গেলে মা পয়সা দিতেন। পয়সা

নিতে না চাইলে মা বলতেন ঃ “বাবা, পয়সা নিতে হয়। ওটা যে পরিশ্রমের জিনিস।” পয়সা দিয়ে তার ওপর মা প্রচুর প্রসাদ, মুড়ি, মুড়কি দিতেন।

শিরোমণিপুরের দুদু ফকির ও সেলিম ফকিরও মায়ের বাড়িতে যেত। নবান্নের সময় তারা চামর দুলিয়ে ভিক্ষে করত। শ্রীমা তাদের খুব ভালবাসতেন ও ভক্তি করতেন। শিরোমণিপুরের পীরের দরগায় তিনি ঘোড়া ও সিন্নি মানত করতেন। হামেদি-চাচা ও মফেতি-চাচা বলত ঃ “মায়ের কী ভক্তি! আমাদের পাল-পরবে মা সিন্নি মানত করে, বাতাসা দেয়।” মফেতি-চাচা মাকে জিজ্ঞেস করেছিল ঃ “মা, মুসলমানদের পরবে আপনি সিন্নি-বাতাসা পাঠান কেন? আপনারা তো হিন্দু!”

মা বলতেন ঃ “বাবা! ঠাকুর কী আলাদা হয়? সবই এক। তোমরা তো জান বাবা, তোমাদের ঠাকুর ইসলামধর্মও সাধনা করেছিলেন। সেসময় নামাজ পড়তেন মুসলমানের মতোই। সবই এক বাবা! নামেই শুধু ভিন্ন।” মফেতি-চাচাকে এবং আমাদের সবাইকে মা যেমন বিশ্বাস করতেন তেমনই ভালবাসতেন।

অনেক আগে একবার মায়ের মন্দিরে বাজ পড়ে। কিশোরী মহারাজ (স্বামী পরমেশ্বরানন্দ) মফেতি-চাচাকে বলেছিলেন ঃ “হ্যাঁরে মফেতি, মায়ের মন্দিরে যে বাজ পড়ল! একবার আজান দিস তো!” মফেতি-চাচা মহারাজের কথামত মন্দিরের কাছে আজান দিয়েছিল। কিশোরী মহারাজ মায়ের কাছেই মানুষ। সত্যি! মায়ের শিক্ষায় ওঁরাও ছিলেন সব-ধর্মেরই লোক। আমরা ঠাকুর-মাকে পীর-পয়গম্বররূপেই দেখি। হামেদি-চাচা ও মফেতি-চাচাকে দেখেছি, ওরা মনে-প্রাণে ঠাকুর আর মাকে তা-ই ভাবত। ওঁদের মতো মানুষ কি আর আসবে? ওঁরা তো আল্লার দূত—বেহেস্তের ফেরেশতা! * □

---

* উদ্বোধন, ৯৮তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৪০৩, পৃঃ ৩৯৯-৪০০

আমরা শ্রীশ্রীমাকে বলতাম 'পিসিমা'

গোপালচন্দ্র মণ্ডল

যে-সময়ের কথা বলছি তা ১৯১৫ থেকে ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যবর্তী কাল। আমি তখন বেশ বড় হয়েছি। ১৬।১৭ বছর বয়স। সুতরাং বহু স্মৃতিই মনে আছে। মনে আছে, মায়ের নতুন বাড়ি হলো। শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) এসে রয়েছেন জয়রামবাটীতে। মনে আছে, মাস্টার মশাই (শ্রীম) এসেছেন জয়রামবাটীতে। রাধুর কথা, রাধুর স্বামীর কথা খুব মনে পড়ে। সর্বোপরি মনে পড়ে মা সারদা অর্থাৎ আমাদের 'পিসিমা'র কথা।

আমরা শ্রীশ্রীমাকে বলতাম 'পিসিমা'। আমার মাকে তিনি বলতেন 'বউ' আর ঠাকুমাকে বলতেন 'খুড়ী'। আমার বাবা ভূষণ মণ্ডল মায়ের চেয়ে বয়সে একটু ছোটই ছিলেন। তিনি ও মা পিসিমাকে 'দিদি' বলে ডাকতেন। আমার ঠাকুমা সত্যভামা মণ্ডল পিসিমাকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যেতেন। জয়রামবাটী থেকে কামারপুকুর বা শিহড়ে যাওয়ার সময়েও পিসিমা ঠাকুমাকে সঙ্গে নিতেন। পিসিমার নতুন বাড়ির পাশে যে পুণ্যিপুকুর, তার পাড়েই আমাদের বাড়ি। তিনি তো আমাদের কাছে ধরা দেননি, তবে পরে বুঝেছি, এত সাদাসিধে থাকাও বোধ হয় কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়! তাঁর জীবনের সাধারণ ঘটনাও আজ ভাবলে অস্বাভাবিক মনে হয়। তিনি তো মানুষ নন, তাই হয়তো তাঁর পক্ষে এমন নিরাভরণ—অতি সহজ—অতি সরল জীবনযাপন সম্ভব হতো!

আমাদের বাড়িতে তাঁর যাতায়াত ছিল খুব বেশি। খাওয়া-দাওয়ার পর বিকেলের দিকে এক-একবার আসতেন। মা-ঠাকুমার সঙ্গে গল্প করতেন। কখনো এমন ঘটত, হঠাৎ সন্ধ্যার সময় কলকাতা থেকে চার-পাঁচজন ভক্ত এসে গেছে। পিসিমা এসে মাকে বললেন :

"ও বউ, আনাজপত্তর কিছু থাকলে দাও, চারজন ছেলে এসেছে অনেক দূর থেকে।" মা তাড়াতাড়ি আলু, ঝিঙে, কুমড়ো যা থাকত দিতেন। মনে আছে, একবার আমি সন্ধ্যার সময় একটা লাউগাছ থেকে লাউ কেটে এনে তাঁকে দিয়েছিলাম। সামান্য জিনিসকে অসামান্য করেই তিনি যেমন ভাইদের সংসার আলো করে রাখতেন, তেমনি কোন ভক্তকেই বুঝতে দিতেন না যে, সংসারে কোন অস্বাচ্ছন্দ্য আছে! পিসিমার ভাইদের সংসার তো খুব বড় ছিল। অনেকগুলি বাচ্চাকাচ্চা। ভাইদের রোজগারও তেমন ছিল না।

তাঁর স্নেহ-মমতা যেমন মানুষের ওপর ছিল, তেমনি ছিল পশু-পাখিদেরও ওপর। তাঁর টিয়াপাখি গঙ্গারামের কথা তো তাঁর জীবনীতে সবাই পড়েছেন। তাঁর অনেকগুলি বেড়ালও ছিল। পাঁচ-ছয়টা হবে। পিসিমা যখন খেতে বসতেন, বেড়ালগুলিও তাঁর কাছটিতে চুপ করে বসে থাকত। পিসিমা খাওয়ার শেষে ওদের নিজের পাতের ভাত দিতেন। তারা কী ভাগ্যবান! পিসিমার চারটি গরু ছিল—মহন্ত, মহারাজ, লক্ষ্মীকান্ত ও ইন্দ্ররাজ। পিসিমা সংসারের সব কাজের মধ্যেও গরুগুলিকে একবার আদর করে যেতেন। ভাতের ফেন খাওয়াতে আসতেন। এসে তাদের গায়ে, গলায়, কপালে হাত বুলিয়ে দিতেন। কখনো তাদের শিঙে তেল মাখাতেন।

গরুগুলিকে সেবাযত্নের জন্য যে-ছেলেটি ছিল, তার নাম দীনু। সে আমাদের বয়সীই ছিল। যদি সে আজ বেঁচে থাকত তবে তার কাছে সবাই পিসিমার সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারত। পিসিমা তাকে খুব স্নেহ করতেন। দীনুর একটা ঘটনা মনে পড়ছে। দীনু জলখাবার খেয়ে বেলা ৯টা নাগাদ মাঠে গরু নিয়ে চরাতে যেত। ফিরত বেলা ১টা নাগাদ। তারপর গরুগুলিকে বেঁধে চান করে খেতে বসত। পিসিমা কিন্তু সবার খাওয়া হয়ে গেলেও দীনুর জন্য অপেক্ষা করতেন। একদিন দীনুর আসতে খুব দেরি হয়েছে। দীনু মাঠে গিয়ে অন্যান্য রাখাল ছেলেদের সঙ্গে গুলি খেলত। খেলতে খেলতে সেদিন ফিরতে দেরি হয়েছে। পিসিমা অনেকক্ষণ অপেক্ষা

করে—যখন বেলা তিনটে পেরিয়ে গেছে—বাড়ির মেয়েদের অনুরোধে দীনুর খাবার বেড়ে ঢাকা দিয়ে সবে খেতে বসেছেন, তখনই দীনু ফিরল। দীনুকে দেখে পিসিমা বললেন ঃ "কিরে বাবা, এত দেরি করলি! দেখ না, ওরা জোর করে আমায় খেতে বসাল। আমি তোর খাবার বেড়ে রেখেছি। তুই চান করে ঢাকা তুলে খাবার নিয়ে নে।" দীনু ঝটপট চান করে খেতে বসল, পিসিমাও খাচ্ছেন। দীনুর খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এল। পিসিমা বললেন ঃ "বাবা দীনু, আর দুটো ভাত নিবি?" দীনু ইতস্ততঃ করতে লাগল। কারণ, পিসিমা খাচ্ছেন, কাছে কেউ নেই যে ভাত দেবে। পিসিমার তখনো খাওয়া শেষ হয়নি। বয়স হয়েছে, দাঁত নেই সব। তাই খেতে দেরি হয়। ব্যাপারটা বুঝে পিসিমা দীনুকে বললেন ঃ "বাবা, থালাটা কাছে আনত।" দীনু থালাটা কাছে আনলে পিসিমা তাঁর থালা থেকে কিছু ভাত দীনুকে তুলে দিলেন। পরম তৃপ্তিতে দীনু তা খেল। পরের দিন পিসিমাকে আড়ালে পেয়ে দীনু জিজ্ঞাসা করল ঃ "আচ্ছা মা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?" পিসিমা বললেন ঃ "বল না বাবা, কি বলবি।"

দীনু—আচ্ছা মা, তোমাদের কি আলাদা করে রান্না হয়? আমাদের ভাত কি আলাদা?

পিসিমা—সে কি বাবা? ওকথা কেন বলছিস?

দীনু—তবে কাল তোমার পাতের ভাত অত সুন্দর লাগল কেন? অমন ভাত তো মা, জীবনে কখনো খাইনি!

পিসিমা—না বাবা! একই হাঁড়িতে ভাত হয়। যে-হাঁড়ির ভাত তোকে দিয়েছি—সেই হাঁড়ির ভাত তো আমিও নিয়েছি।

পিসিমা চেপে গেলেন তাঁর দৈবী ঐশ্বর্যের কথা। তাঁর প্রসাদী অন্ন যে অমৃতে পরিণত হয়েছে তা দীনু বুঝবে কি করে! দীনু মহাভাগ্যবান—সে পেয়েছিল তাঁর মহাপ্রসাদ!

পিসিমা যাত্রা দেখতে খুব ভালবাসতেন। তখনকার দিনে গ্রামে এখনকার মতো রেডিও বা সিনেমার প্রথা ছিল না। ফলে গ্রামে

কোন পালাপার্বণকে কেন্দ্র করে বাউলগান, তরজা, যাত্রা, রামায়ণগান, চব্বিশ প্রহর, মনসার পাঁচালী প্রভৃতি হতো। চব্বিশ প্রহরে ভাগবত কথকতার জন্য গাইতে আসত নদীয়ার নারাণপুরের দল, পশ্চিমের রামডিয়ার দল ও বরণডাঙার দল। জ্যৈষ্ঠ মাসে গ্রামে শীতলা-মায়ের পুজো হতো। তখন হতো চব্বিশ প্রহর ও যাত্রা। আশ্বিন-কার্তিক মাসে সিংহবাহিনীতলায় রামায়ণগান ও যাত্রা হতো। রামায়ণগান গাইতে আসতেন পুকুরিয়ার বাঁকু ঘোষাল ও ভুরসুবোর সতীশ আচার্য। তাঁরা পিসিমাকে খুব শ্রদ্ধা-ভক্তি করতেন। দুরকমের যাত্রা হতো—কৃষ্ণযাত্রা আর সাধারণ যাত্রা। কৃষ্ণযাত্রা গাইতে আসতেন শিহড়ের রাম ছুতোরের দল এবং বেজো সন্তোষপুরের নলিনী মণ্ডল ও অনুকূল মণ্ডলের দল। জগদ্ধাত্রীপূজার সময় অনেকবার কৃষ্ণযাত্রা হতে দেখেছি। যতদূর স্মরণ হয়, তখন সাধারণ পালাগুলি হতো প্রহ্লাদচরিত, ধ্রুবচরিত, নিমাইসন্ন্যাস, নবাব সিরাজদৌল্লা ইত্যাদি। হ্যাজাক জ্বেলে যাত্রা হতো। সাধারণ যাত্রার জন্য কুমুড়সে-কানপুরের দল, রামজীবনপুরের দল, বগছড়ির দল জয়রামবাটীতে যাত্রা করে গেছে। বাউলগান ও তরজা হতো জগদ্ধাত্রীপূজার সময়। বাউলগান গাইতে আসতেন ক্ষুদিরাম গোদ ও সাতবেড়ের লালু জেলে। লালুকে পিসিমা খুব ভালবাসতেন। তরজা গাইতেন সাতবেড়ের পাঁচু রায়, মুইদাড়ার মৃগেন্দ্র ধাড়া প্রভৃতি। মনসাতলায় মাঝে মাঝে মনসার পাঁচালীগান ও মনসার ভাসানের গান হতো। দলের নাম মনে নেই, তবে লোকে বলত বেঙ্গাই-এর পাঁচালী-দল। পিসিমা এইসমস্ত খুব আনন্দ করে শুনতেন। ছোটবেলায় অনেকবারই পিসিমাকে যাত্রা, রামায়ণগান, বাউলগান, তরজা প্রভৃতি শুনতে দেখেছি। ঐসময় জলের ঘটি ও পানের ডিবা তাঁর সঙ্গে থাকত। গোটা অনুষ্ঠান দেখে তবে বাড়ি ফিরতেন। তখনকার দিনে ঐসমস্ত অনুষ্ঠান শুরু হতো বেশ রাতেই। শেষ হতো শেষরাতে। রাত জেগে যাত্রা দেখেও তিনি ঠিক ভোরবেলা উঠতেন, নিত্যপূজা ও সংসারের কাজ সারতেন।

আমি পিসিমার সব ভাইঝি ও তাদের স্বামীদের দেখেছি। রাধু তো পিসিমাকে জ্বালাতনের একশেষ করে ছেড়েছে। দেখে আমাদের খুব কষ্টও হতো, আবার রাগও হতো। ললিতবাবু[১], শরৎ মহারাজ, মাস্টার মশাই যখন আসতেন তখন জয়রামবাটীতে যেন আনন্দের হাট বসে যেত! কলকাতা থেকে এখন রোজ কত লোকই তো আসে জয়রামবাটীতে। কিন্তু তখনকার সে-পরিবেশ ছিল একেবারেই অন্যরকম। প্রথমদিকে পিসিমার বাড়িতে গরু ছিল না। কলকাতা থেকে ভক্তরা এলে চা করতে হবে—দুধ চাই। পিসিমা তখন ছুটতেন গয়লাপাড়ায়। লবু নাগ, শ্রীরাম নাগ, বিহারী মাল—এরা দুধের ব্যবসা করত। গয়লাবউ আহ্লাদিনী, নয়না—এরা পিসিমাকে বলত 'মা-ঠাকরুন'। গয়লাবউদের সঙ্গে পিসিমার খুব ভাব ছিল। এমনিতেই কারো গরুর বাছুর হলে তারা পিসিমার বাড়িতে ঠাকুরের ভোগের জন্য দুধ দিয়ে যেত। হঠাৎ দুধের প্রয়োজন হলে পিসিমাকে কেউ ফেরাত না। পিসিমার ভাই বা ভাইঝিদের কিন্তু কেউ সহজে কিছু দিতে চাইত না। পিসিমাকে সবাই সব জিনিস দিতে চাইত। দিয়ে যেন তারা বর্তে যেত।

একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ঠাকুমার মুখে শুনেছি। ঠাকুমা বলতেন ঃ "ওরে, মুখুজ্যেদের সারু যে-সে নয়, পরে দেখবি। ও হলো দেবতা! একবার পর পর দুবছর খরা গেল। আকাশে বৃষ্টি নেই। মাঠের ফসল মাঠেই শুকিয়ে গেছে। কিছু জমির ধান আমোদরের পাশে কোনরকমে টিকেছিল। সেগুলিও মরে যেতে বসেছে। ভাদুরে আকাশে একটুও জল নেই। গ্রামের সব মোড়লরা

---

১ ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর তেজস্বী স্বভাবের জন্য ভক্তমহলে তিনি 'কাইজার' নামে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি সস্ত্রীক শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। শ্রীশ্রীমাকে সেবার জন্য তিনি সর্বদা তৎপর থাকতেন। জয়রামবাটীতে তিনি শ্রীশ্রীমাকে শোনানোর জন্য প্রথম সেখানে গ্রামোফোন নিয়ে গিয়েছিলেন। মায়ের বাড়িতে গ্রামোফোন শোনার জন্য গ্রামের লোকেরা ভিড় করত।—**সম্পাদক**

(তখনকার দিনে গ্রামের মুরুব্বিরা ছিলেন—রাজকুমার মুখোপাধ্যায়, শিবরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশ সামুই, কেদার ঘোষ, কৈলাস মণ্ডল, মাখন মণ্ডল, যোগীন্দ্র বিশ্বাস, নগেন্দ্র বায়েন, ভূপতি ঘোষ প্রমুখ।) একদিন আলোচনা করছিল, এখন বৃষ্টি না হলে বাচ্চা-কাচ্চারা না খেয়ে মারা যাবে। তারা সারুকে গিয়ে ধরল। সারু বলল, 'ঠাকুরকে জানাব।' পরের দিন মুষলধারে বৃষ্টি নামল। সে-বছর ঐ জমিগুলোতে যা ফসল হয়েছিল এমন আর কখনো হয়নি। বুঝলি, দেবমাহাত্ম্য কাকে বলে!" ভানুপিসির মুখেও এই ঘটনা আমরা শুনেছি।

এখন আমার বয়স প্রায় ৯৬ বছর।[২] এখনো তো ভালভাবেই বেঁচে আছি। তা আছি পিসিমার আশীর্বাদেই। আমাদের ভিটেতে পিসিমার পায়ের ধুলো পড়েছে। কখনো দেখতাম তিনি রান্নাঘরের কাছে মায়ের সঙ্গে কথা বলছেন, কখনো দেখতাম উঠানে ঠাকুমার সঙ্গে কথা বলছেন। চোখ বন্ধ করলেই সব জীবন্ত হয়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আমরা তখন ঠিক বুঝিনি, কিন্তু সাক্ষাৎ জগজ্জননীকে তো দেখেছি, তাঁর চরণ ছুঁয়েছি! তাই তো এত বয়সেও এত ভাল আছি। কত কালের কথা, কিন্তু সব মনের মধ্যে থরে থরে সাজানো রয়েছে। আমি জানি, তাঁর কৃপা আমাদের ঘিরে রয়েছে। আমাদের সংসারে আজ যে বাড়বাড়ন্ত তাও পিসিমার আশীর্বাদেই ঘটেছে। পরলোকে যেন পিসিমার চরণে আশ্রয় পাই। তাঁর কাছে সেই প্রার্থনাই জানাই।* □

সংগ্রহ : অধ্যাপক তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সংগ্রহকাল : ১,২ জানুয়ারি ১৯৯৫

---

২ গত ৬ জুলাই ১৯৯৫ তিনি মারা যান।—**সম্পাদক**

* উদ্বোধন, ৯৮তম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, কার্তিক ১৪০৩, পৃঃ ৫৮৩-৫৮৫

শ্রীশ্রীমায়ের চরণাশ্রয়ে

দীনেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত ভরাকর গ্রামে [অধুনা বাংলাদেশ] আমাদের বাড়ি। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন বাগবাজারে 'মায়ের বাড়ী'তে আমি এবং আমার স্ত্রী রাজবালা শ্রীশ্রীমায়ের চরণাশ্রয় লাভ করি। আমার স্ত্রীর বয়স তখন কুড়ি বছর। আমার ত্রিশ বছর। আট বছর আগে ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে আমাদের বিবাহ হয়েছিল। স্ত্রীর বয়স তখন ছিল বার বছর। ঐ সময় পর্যন্ত আমাদের কোন সন্তানাদি না হওয়ায় আমার স্ত্রীকে আত্মীয়-পরিজনের কাছে অনেক গঞ্জনা সহ্য করতে হতো। এতে সে অত্যন্ত মানসিক কষ্টে ও দুঃখে দিন কাটাত। আত্মীয়-পরিজনদের সমালোচনার হাত থেকে বাঁচতে এবং নিজের দুঃখ-কষ্ট ভুলে থাকতে সে বাড়িতে সেলাই-ফোঁড়াইয়ের কাজ এবং গ্রামের প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের অবৈতনিক শিক্ষিকার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখত। আমি ঢাকায় কবিরাজী করতাম। একদিন আমার স্ত্রী রাত্রে স্বপ্নাদেশ পায় যে, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহধর্মিণী সারদাদেবীর কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিলে তার মনোবাসনা পূর্ণ হবে এবং মনে শান্তি আসবে।

আমাদের পাশের গ্রাম কলমাতে আমার জ্ঞাতিভ্রাতা বিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত থাকতেন। তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রীকে (ইন্দুবালা) দাদা-বৌদি বলতাম। তাঁদের কাছে আমার স্ত্রী শ্রীশ্রীমায়ের কথা শুনেছিল। তাঁরা উভয়ে ইতিপূর্বে শ্রীশ্রীমায়ের কৃপালাভ করেছিলেন।

স্বপ্নাদেশ পাওয়ার পর শ্রীশ্রীমায়ের কাছে দীক্ষাগ্রহণের জন্য আমার স্ত্রী অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়ে। কিন্তু আমাদের বংশে ছিল কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নেওয়ার রীতি। সেজন্য আমার মা শ্রীশ্রীমায়ের কাছে স্ত্রীর দীক্ষা নেওয়ার বিপক্ষে ছিলেন। আমিও এব্যাপারে আমার

মাকেই সমর্থন করেছিলাম। আমাদের সমর্থন না থাকলেও আমার স্ত্রী কিন্তু তার নিজ সঙ্কল্পে অটুট ছিল। সে নিজেই শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে পত্রমাধ্যমে যোগাযোগ করে এবং তার মনোবাসনা নিবেদন করে। শ্রীশ্রীমা তাকে গুরুজনদের অনুমতি নিয়ে কলকাতায় আসতে বলেন। স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে তাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে আমাকে রাজি হতে হয়। নৌকায় পদ্মা পার হয়ে স্টীমারে আমরা রাত্রে আসি গোয়ালন্দে। গোয়ালন্দ থেকে সারারাত ট্রেনে কাটিয়ে ভোরবেলা শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছাই। অপরিচিত জায়গা এবং কোন পরিচিত আত্মীয় না থাকায় স্টেশন থেকে আমার স্ত্রীকে সঙ্গে করে সোজা বাগবাজারে 'মায়ের বাড়ী'তে পৌঁছাই। স্ত্রীকে 'মায়ের বাড়ী'তে পৌঁছে দিয়ে আমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকি। শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করার কোন আগ্রহ আমার ছিল না।

মাতাঠাকুরানীর কাছে আমার স্ত্রী নিজের দুঃখের কারণ এবং তাঁর কাছে মন্ত্রদীক্ষা নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি বললেন : "ভেবো না মা, তোমার অবশ্যই ছেলেমেয়ে হবে। তুমি কুলগুরুর কাছে যখন মন্ত্র নাওনি তখন আমিই তোমাকে মন্ত্র দেব। তুমি কার সঙ্গে এসেছ?" স্ত্রী বলে : "আমার স্বামীর সঙ্গে।" মা বললেন : "ছেলে কোথায়?" আমার স্ত্রী বলল : "তিনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন।" মা বললেন : "তাকে বাইরে রেখে এসেছ কেন? ছেলেকে আমার কাছে নিয়ে এস।" স্ত্রী তৎক্ষণাৎ দৌড়ে এসে আমাকে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে ডেকে নিয়ে গেল। আমি বাধ্য হয়ে এবং অত্যন্ত দ্বিধাগ্রস্তভাবে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। মা অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে আমাকে বললেন : "হ্যাঁ বাবা, তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলে কেন? আমার কাছে মন্ত্র নিতে চাও না? তুমি কি তোমার কুলগুরুর কাছে মন্ত্র নিয়েছ?" আমি অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে বললাম : "না, আমি কুলগুরুর কাছে মন্ত্র নিইনি, আর এব্যাপারে আমার মায়ের কাছে আমি কোন অনুমতিও নিয়ে আসিনি।" শুনে মা স্নেহসিক্ত কোমলকণ্ঠে বললেন : "বাবা, তুমি সব কাজই

কি তোমার মায়ের অনুমতি নিয়েই কর?” আমি মাথা নিচু করে চুপ করে থাকলাম। মা শান্ত কিন্তু দৃঢ়ভাবে বললেন ঃ “দ্বিধা করো না, বাবা। যাও, দুজনে গঙ্গায় স্নান করে এস, আমি তোমাদের দীক্ষা দেব। আমার কাছে দীক্ষা নিলেও কুলগুরুর যা প্রাপ্য তা অবশ্যই তাঁকে দেবে।” মায়ের এই কথা শুনে আমি বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম। এক অপূর্ব অনাস্বাদিত আনন্দের অনুভূতিতে আমার হৃদয় পূর্ণ হয়ে গেল। আমার দুই চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় জল পড়তে লাগল। আমি মায়ের দুই চরণ স্পর্শ করে তাঁর পদপ্রান্তে মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে রইলাম। তিনি কি বুঝলেন কে জানে, বললেন ঃ “আমি সব বুঝতে পারছি, বাবা। তোমার কোন চিন্তা নেই। আমি তোমাদের দুজনকেই দীক্ষা দেব।”

সেদিন ছিল কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো (১৯১৩ খ্রীস্টাব্দ)। শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশমত আমরা দুজনে গঙ্গাস্নান করে এলাম এবং মা আমাদের দুজনকে একইসঙ্গে মন্ত্রদীক্ষা দান করে কৃতকৃতার্থ করলেন।

১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসের শেষদিকে আমার প্রথম পুত্রের জন্ম হয়। আমাদের প্রথম সন্তানকে শ্রীশ্রীমাকে দেখানোর জন্য আমার স্ত্রী অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠে। অবশেষে ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আমার প্রথম পুত্রের বয়স যখন আড়াই বছর, তখন আমার স্ত্রী তাকে বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে নিয়ে আসে। পুত্রকে দেখে তিনি খুব খুশি হন এবং আশীর্বাদ করেন। আমার স্ত্রী যখন তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল, সেসময়ে এক ফাঁকে আমার পুত্রটি মায়ের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে এবং সিঁড়িতে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পায়। কিছু রক্তপাতও হয়। আমার স্ত্রী দৌড়ে এসে ক্রন্দনরত পুত্রকে কোলে নিয়ে তার কান্না থামানোর চেষ্টা করে, কিন্তু তার কান্না আর থামে না। তখন শ্রীশ্রীমা নিজে এসে স্ত্রীর কোল থেকে আমার শিশুপুত্রকে নিজের কোলে নিয়ে আদর করতে থাকেন। শ্রীশ্রীমায়ের কোলে সে একেবারে শান্ত হয়ে বসে থাকে। আমার এই পুত্রটি চার-পাঁচ বছর বয়সে কলেরায় আক্রান্ত হয়। তার সঙ্গে

আমার বড়দার দুই ছেলেও কলেরায় আক্রান্ত হয়। আমার পুত্রটি সুস্থ হয়ে উঠলেও আমার ঐ দুই ভ্রাতুষ্পুত্র কিন্তু মারা যায়। আমি নিশ্চিত যে, মায়ের অভয় স্পর্শের ফলেই আমার পুত্র সেবার মৃত্যুর কবল থেকে ফিরে এসেছিল।[১] এই পুত্রের পরে আমার আরও দুই পুত্র এবং তিনটি কন্যার জন্ম হয়। মায়ের আশীর্বাদে আমার স্ত্রীর সন্তানকামনা পূর্ণ হয়েছিল। শুধু সন্তানকামনাই নয়, আমাদের জীবনকে সমস্ত দিক থেকেই পরিপূর্ণ করে দিয়েছিলেন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী।* □

১ লেখকের এই পুত্রের নাম নিখিলরঞ্জন সেনগুপ্ত। কলকাতা পুরসভার অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনীয়ার নিখিলরঞ্জনবাবু এখনো জীবিত—বর্তমানে (ডিসেম্বর, ১৯৯৬) বয়স ৮২ বছর। ওঁর বিশ্বাস, 'সারদা-সরস্বতী' ওঁকে কোলে নিয়েছিলেন—সেই সৌভাগ্যে উনি আজীবন শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সক্রিয় ও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকতে পারছেন।—সম্পাদক

* উদ্বোধন, ৯৮তম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৪০৩, পৃঃ ৬৩৬-৬৩৭। দীনেশচন্দ্র সেনগুপ্তের (মৃত্যু ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬১) এই মাতৃস্মৃতিটি আমরা পেয়েছি তাঁর মধ্যম পুত্র শিশিররঞ্জন সেনগুপ্তের (সল্টলেক, কলকাতা-৯১) সৌজন্যে। লেখকের স্ত্রী রাজবালা সেনগুপ্তকে (মৃত্যু ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫) শ্রীশ্রীমায়ের লেখা চারটি চিঠি শিশিররঞ্জন সেনগুপ্তের সৌজন্যে এবং দুটি চিঠি লেখকের দ্বিতীয়া কন্যা নিবেদিতা দত্তগুপ্তের (বাঘাযতীন, কলকাতা-৩২) সৌজন্যে আমরা পেয়েছি। চিঠিগুলি বর্তমান গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।—সম্পাদক

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিসৌরভ

অভয়শঙ্কর রায়

আমার ছোট ভ্রাতৃবধূ হেমপ্রভা শ্রীশ্রীমায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেছিল। তারই কাছে আমি এবং আমার স্ত্রী (দ্বিতীয়পক্ষের) নিরুপমা শ্রীশ্রীমায়ের কথা শুনি। আমাদের পৈতৃক বাড়ি ছিল মানিকগঞ্জ জেলার [অধুনা বাংলাদেশের] তেওতা গ্রামে। কলকাতাতে ৪৪, ইউরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেনে [বর্তমানে আব্দুল হালিম লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৬] আমাদের বাড়ি।

আমার দীক্ষা নেওয়ার কোন ইচ্ছাই ছিল না। এব্যাপারে আমার ভ্রাতৃবধূই সব ব্যবস্থা করে। তার যোগাযোগে আমার স্ত্রী নিরুপমার শ্রীশ্রীমায়ের কাছে দীক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল। শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশমত নির্দিষ্ট দিনে খুব সকালে বাগবাজারে 'মায়ের বাড়ী'তে সস্ত্রীক পৌঁছালাম। আগেই বলেছি, আমার নিজের দীক্ষা নেওয়ার কোন ইচ্ছাই ছিল না। কিন্তু সেদিন শেষরাত্রে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। আমি তখন বিছানায়। অর্ধজাগ্রত অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখলাম আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে বললেন : "এখনো তোর দ্বিধা গেল না? যা যা, তুইও একইসঙ্গে দীক্ষা নিয়ে নে।" কথাগুলি বলে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ঠাকুরের দর্শন এবং তাঁর কথা শোনার পর খুব আনন্দ হলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার একটু দমেও গেলাম। কারণ, একটু পরেই স্ত্রীকে নিয়ে বাগবাজারে যাওয়ার কথা। তার দীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসের ব্যবস্থা করা আছে, কিন্তু আমার তো নেই! এত তাড়াতাড়ি সেসব সংগ্রহ করব কি করে? যাই হোক, স্বপ্নে পাওয়া ঠাকুরের নির্দেশমত স্ত্রীকে নিয়ে মায়ের বাড়ীতে উপস্থিত হলাম। মাকে প্রণাম করতে মা স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বললেন : "আর তো তোমার দ্বিধা নেই বাবা! যাও, গঙ্গাস্নান

করে এস। বৌমার জিনিস দিয়েই তোমাদের দুজনের দীক্ষা হবে।" মায়ের মুখে এই কথা শুনে আমি আর অশ্রু সম্বরণ করতে পারলাম না। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, মা কি করে আমার স্বপ্নের কথা এবং আমার সমস্যার কথা জানতে পারলেন? তবে কি মা সত্যিই জগজ্জননী—অন্তর্যামিনী? যথাসময়ে আমার ও আমার স্ত্রীর মায়ের কাছে দীক্ষা হয়ে গেল। এই ঘটনা ১৩১৬ সালের (১৯১০ খ্রীস্টাব্দের)।

দুঃখের বিষয়, যার জন্য আমরা শ্রীশ্রীমায়ের চরণাশ্রয় লাভ করেছিলাম, আমার সেই ভ্রাতৃবধূ হেমপ্রভা অল্পবয়সে দুই পুত্র রেখে মারা যায়। হেমপ্রভার মৃত্যুর কয়েক বছর পর তার ছেলেদুটিও মারা যায়। অত্যন্ত ব্যক্তিত্বময়ী, কুসংস্কারমুক্ত এবং মাতৃগতপ্রাণা হেমপ্রভা শ্রীশ্রীমায়ের অনেক স্নেহ পেয়েছিল। আমাদের পরিবারের ওপরে হেমপ্রভার প্রভাব ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আমার স্ত্রী নিরুপমারও মায়ের অনেক স্নেহ লাভ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। ১৯১৫ থেকে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে নিরুপমা শ্রীশ্রীমায়ের কাছ থেকে অন্ততঃ ৪০।৪৫টি পত্র পেয়েছে।[১] আমার বড় ছেলে ও মেয়ে প্রায়ই অসুস্থ থাকত। নিরুপমা তাদের সুস্বাস্থ্য কামনায় শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ চেয়ে পাঠাত। মা-ও করুণাপরবশ হয়ে আশীর্বাদ জানাতেন শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে। সেই আশীর্বাদের জোরে আমার ঐ দুই ছেলেমেয়ে শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠেছিল।

শ্রীশ্রীমায়ের পত্রগুলির মধ্যে অধিকাংশই জয়রামবাটী থেকে লেখা। সেগুলির অধিকাংশই নলিনী-দিদির হাতে লেখা। এছাড়া রাসবিহারী মহারাজ ও ব্রহ্মচারী জ্যোতিপ্রকাশের হাতে লেখা চিঠিও আছে।

শ্রীশ্রীমাকে ঠাকুর বলেছিলেন : "এ (নিজেকে দেখিয়ে) আর কী করেছে? তোমাকে ঢের বেশি করতে হবে।" মায়ের জীবন

---

১ এই চিঠিগুলির মধ্যে ৩৮টি চিঠি বর্তমান গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। চিঠিগুলি আমরা পেয়েছি লেখকের তৃতীয় পুত্র গৌতমশঙ্কর রায়ের সৌজন্যে।—সম্পাদক

আলোচনা করলে আমরা দেখি, সত্যিই মা ঠাকুরের অবর্তমানে কত কাজ করেছেন, কত আর্ত, অসহায় ও দুঃখী মানুষের জীবন শীতল করেছেন। আমরা যেমন মায়ের ৪০।৪৫টি চিঠি পেয়েছি এরকম চিঠি মায়ের কত সন্তানই তো পেয়েছেন। মায়ের চিঠিগুলিতে সন্তানদের জন্য তাঁর ব্যাকুলতা, তাঁর মমতা জ্বলন্তভাবে ফুটে উঠেছে দেখতে পাওয়া যায়। বাগবাজারে মায়ের শেষ অসুখের সময়ে আমার স্ত্রীকে তার পত্রের উত্তরে জানানো হয়েছিল : "শ্রীশ্রীমার অবস্থা পূর্ববৎ আছে। কোনরূপ পরিবর্তন হয় নাই, দৈনিক ২ বার করিয়া জ্বর আসিতেছে। পেটের ও পায়ের ফুলা কিছু কমিয়াছে। এই অষ্টমী, একাদশী না কাটিলে কিছু বুঝা যাইবে না।" চিঠিটির তারিখ ২৪ আষাঢ় (১৩২৭)—৮ জুলাই ১৯২০। এর মাত্র বারদিন পর শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী স্থূলদেহ ত্যাগ করেন।* □

---

* উদ্বোধন, ৯৮তম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৪০৩, পৃঃ ৬৩৮। লেখকের এই স্মৃতিকথাটি আমরা সংগ্রহ করেছি তাঁর তৃতীয় পুত্র গৌতমশঙ্কর রায়ের সৌজন্যে। লেখক ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে পরলোকগমন করেন। তাঁর স্ত্রী নিরুপমা দেবীর মৃত্যু হয় ২৪ আগস্ট ১৯৬৫।—সম্পাদক

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি

সুহাসিনী দেবী

আমার মা সুহাসিনী দেবী উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমাকে দেখেছিলেন। শ্রীশ্রীমা যেসব কথা ভক্ত মহিলাদের বলতেন এবং আমার মাকেও যা বলতেন সেগুলি তিনি খাতায় লিখে রাখতেন। গৌরী-মা এবং ঠাকুরের কয়েকজন সন্তানের সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্যও তাঁর হয়েছিল। ঠাকুরের সন্তানদের মধ্যে যাঁদের সান্নিধ্য মা লাভ করেছিলেন তাঁরা হলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ এবং স্বামী অভেদানন্দ। মা তাঁদের কথাও তাঁর খাতায় লিখে রাখতেন। মায়ের এই খাতা একদিন সরলাদেবী (পরবর্তী কালে প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা) দেখেছিলেন। তিনি খুব খুশি হয়ে বলেছিলেন : "এটা তুমি খুব ভাল কাজ করেছ। একদিন মা-ও তো ঠাকুরের কাছে চলে যাবেন। তখন তো আমরা আর তাঁর মুখের কথা শুনতে পাব না। লেখা থাকলে মাঝে মাঝে মন খারাপ হলে পড়ে শান্তি পাবে। তুমি পড় বা যে-ই পড়ুক তারই মনে ভক্তি-ভালবাসা ও পবিত্রতার ভাব জেগে উঠবে।" মা তাঁর খাতায় শ্রীশ্রীমায়ের সম্পর্কে যা লিখে রেখেছিলেন তা এখানে তুলে ধরছি।—**নীলিমা চট্টোপাধ্যায়, আরামবাগ, জেলা—হুগলী।**

আমার প্রথম সন্তান (কন্যা) শান্তি হওয়ার পর দুটি যমজ মেয়ে হয়। কিছুদিন পর মেয়ে-দুটি মারা যায়। স্বাভাবিকভাবেই আমার মন তখন খুব খারাপ। আমার বাল্যবন্ধু সরলা-দি আমাকে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে নিয়ে যায়। এটি ১৯১৮ সালের কথা। সরলা-দি তখন বোসপাড়া লেনে ভগিনী নিবেদিতার স্কুলে থাকত। এই সরলা-দিই পরবর্তী কালের সারদা মঠের প্রথম অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা। নিবেদিতার স্কুল থেকে সরলা-দি এসে মায়ের সেবা করত। মা তাকে খুব স্নেহ করতেন। সরলা-দি আমাকে উদ্বোধনে নিয়ে যায়। তখন 'মায়ের বাড়ী'

এতটা বড় ছিল না। মা তখন দোতলায় তাঁর ঘরে পুজো করছিলেন। বারান্দা (তখন বারান্দাটি ছোট্ট একফালি ছিল) থেকে মাকে দেখা যাচ্ছিল। দেখলাম মা গভীর ধ্যানমগ্না। আমি ধ্যানরতা মাকে এবং সিংহাসনে ঠাকুরকে দেখছিলাম। মাকে সেই আমার প্রথম দর্শন। দেখে মনে হলো, সত্যিই মা যেন জগজ্জননী। দেখতে খুব সুন্দরী নন, তবে কী এক জ্যোতিঃ যেন তাঁর সারা মুখে মাখানো। সেই মুখে অপূর্ব করুণার ভাব। কিছুক্ষণ পর মা চোখ মেলে ফুল, নৈবেদ্য দিয়ে একমনে ঠাকুরের পুজো করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পর ভোগ নিবেদন করে মা বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। সরলা-দি এবং আমি মায়ের পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করলাম। মা সরলা-দিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "মেয়েটি কে?" সরলা-দি বলল ঃ "আমার ছোটবেলার বন্ধু। কাছেই থাকে।" বলেই সে আমার বাবা-মার পরিচয় দিল। তারপর বলল ঃ "কিছুদিন হলো ওর দুটি যমজ মেয়ে মারা গেছে। খুব মন খারাপ। তাই আপনার কাছে আনলাম।" শ্রীশ্রীমা মমতা-মাখা কণ্ঠে বললেন ঃ "আহা বাছারে!" বলে আমার মাথায় হাত রেখে বললেন ঃ "বেশ তো, তুমি মাঝে মাঝে যখনই সময় পাবে আমার কাছে চলে এসো মা।" মায়ের সেই স্নেহস্পর্শে এবং মমতা-মাখানো কথায় আমার শরীর-মন যে কী হয়ে গেল তা আমি ভাষায় বোঝাতে পারব না। কী স্নেহ ও করুণা-মাখা সেই অপূর্ব দুটি চোখ আর কী প্রাণজুড়ানো সেই করস্পর্শ! মনে হলো যেন কত জন্ম-জন্মান্তরের আমার মা তিনি—কত স্নেহ, কত মমতা, কত করুণা পূর্ণকুম্ভের মতো বুকের মধ্যে নিয়ে বসে আছেন শুধু আমারই জন্য। মা গোলাপ-মাকে বললেন আমাদের প্রসাদ দিতে। গোলাপ-মা আমাদের ফল-প্রসাদ দিলেন। মা বললেন ঃ "খাও মা। প্রসাদ খেয়ে হাত ধুয়ে চরণামৃত খেও।" আমরা তাই করে মায়ের ঘরে এসে বসলাম। মা কত কথা বললেন। সরলা-দি চুপি চুপি আমাকে বলল ঃ "এবার আমাদের যেতে হবে, নইলে মায়ের জলখাবার খেতে দেরি হয়ে যাবে। গোলাপ-মা বকাবকি

করবেন।” ইচ্ছে না থাকলেও উঠতে হলো। মাকে প্রণাম করতে মা দুহাত মাথায় দিয়ে বললেন ঃ “এসো মা। ঠাকুর তোমার মনে শান্তি দিন। আবার এসো।” জীবন্ত জগজ্জননীকে প্রাণভরে দেখতে দেখতে সেদিনের মতো বিদায় নিলাম।

তারপর প্রায়ই যেতাম উদ্বোধনে মায়ের কাছে। কখনো সরলা-দির সঙ্গে, কখনো একাই, আবার কখনো সুধীরা-দি (সুধীরা বসু) কিংবা প্রফুল্ল-মাসির (বালবিধবা—সরলা-দির ছোটমাসি) সঙ্গে। যতক্ষণ মার কাছে থাকতাম, খুব ভাল লাগত। তারপর আমার ছেলে হরু হলো। তখন আমরা এখনকার নিবেদিতা লেনের বাড়িতে। হরুর বয়স তিন-চার মাস হতে সরলা-দি বলল ঃ “চল, মাকে তোমার ছেলে দেখিয়ে আনি।” গেলাম। আমাকে দেখেই মা বললেন ঃ “এতদিন আসনি কেন গো?” আমি হরুকে মায়ের পায়ের কাছে রেখে বললাম ঃ “এই যে মা—ছেলে হয়েছে বলে। একে আপনার পায়ের ধুলো দিন।” মা বললেন ঃ “আহা, বাছাকে মাটিতে শোয়াচ্ছ কেন? দাও, আমার কোলে দাও।” হরুকে কোলে নিয়ে মা বললেন ঃ “বাঃ, বেশ ছেলে!” হরুর মাথায় হাত বুলিয়ে মা আশীর্বাদ করছেন দেখে আমি একেবারে অভিভূত হয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পর মাকে প্রণাম করে ফিরে এলাম। মায়ের কাছ থেকে যখনই চলে আসতাম তখনই খুব মন খারাপ লাগত। কে জানে আবার কবে কখন আসতে পারব! আসার সময় মা মাথায় হাত দিয়ে, চিবুক স্পর্শ করে আদর করতেন। মায়ের এই ছোঁয়াটুকু যেন সবসময় লেগেই থাকত।

মা ছিলেন অন্তর্যামিনী। রোজ ভাবতাম—আহা, এতদিন মার কাছে যাচ্ছি, কখনো একটু মায়ের পদসেবা করার ভাগ্য হলো না! একটা দিনও যদি মায়ের পায়ে একটু হাত বুলিয়ে দিতে পারতাম! মনের এই আকুতি মায়ের কাছে কখনো মুখ ফুটে বলতে পারিনি গোলাপ-মার ভয়ে। বললে হয়তো মা নিজেই এটুকু সেবার অধিকার দিতেন। মনের ইচ্ছে মনেই চেপে কাঁদতাম আর মনে মনে বলতাম ঃ “মাগো, ঠাকুরকে তো দেখিনি—তোমার দয়ায় তোমাকে দেখলাম।

তোমার কথা শুনলাম। তোমার চরণ স্পর্শ করলাম। আমার মাথায়, মুখে তোমার স্পর্শ পেলাম, কিন্তু সংসারী বলে কি আমার একটু সেবা নেবে না? তোমার পায়ে একটু হাত বুলিয়ে দেবার অধিকারও কি আমার নেই?"

এরপরে একদিন মায়ের কাছে গেছি। সেদিন শান্তি আমার সঙ্গে ছিল। ঘরে ঢুকে দেখি, মা শুয়ে আছেন। দু-তিনজন ভক্ত মেয়ে মেঝেতে মাদুরে বসে। আমি দূর থেকে মাটিতে মাথা রেখে মাকে প্রণাম করতেই মা সস্নেহে বললেন ঃ "এসেছ মা, বোসো। শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। শরৎ, গোলাপ, যোগীন, সরলা সবাই ব্যতিব্যস্ত আমাকে নিয়ে। আমার নিজেরই লজ্জা লাগছে। তবে কি জান মা, দেহধারণ করলে দেহের ভোগ তো করতেই হবে।" এই কথা বলে মা চুপ করে রইলেন। আমি মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছি। কিছুক্ষণ পর আমার দিকে তাকিয়ে মা বললেন ঃ "বুড়ো হয়েছি, বাতে ধরেছে। হাতে পায়ে বাতের ব্যথা। একটু টিপে দিলে আরাম হয়। তুমি একটু টিপে দেবে?" একজন ভক্ত মহিলা তৎক্ষণাৎ উঠে বললেন ঃ "মা, আমি দিচ্ছি।" মা সস্নেহে তাঁর দিকে চেয়ে বললেন ঃ "তুমি বোসো মা। তুমি তো সেদিন কতক্ষণ দিলে। আজ সুহাস দিক।" আমার মনের ভিতর তখন ঝড় বইছে। আনন্দে বিস্ময়ে আবেগে আমি আর নিজেকে সামলাতে পারছিলাম না। সঙ্গে সঙ্গে মায়ের পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মনে মনে বলছি ঃ "মাগো, তুমি অন্তর্যামিনী। তুমি আমার অন্তরের চাওয়া জেনেছ মা!" চোখের জল উপচে পড়তে চাইছিল। আমার পরম পাওয়ায় বুক-ভরা আনন্দের কান্না চেপে রেখে মাটিতে বসে মায়ের চরণে হাত বোলাতে থাকলাম। একটু পরেই মা বললেন ঃ "ওকি! মাটিতে ওভাবে বসে কি হয় মা? তুমি উঠে এই তক্তপোশেই বসে একটু জোরে জোরে টেপ।" মায়ের আদেশ! মনে মনে ঠাকুর ও মায়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে তক্তপোশে বসে অনেকক্ষণ মায়ের তুলতুলে নরম পা-দুটি কোলে তুলে নিয়ে দেবতা, ঋষি, মুনির আরাধ্যা ও দুর্লভা

আদ্যাশক্তির পদসেবা করলাম। একটু পরেই পাশ ফিরে শুয়ে মা বললেন ঃ "খুব আরাম হচ্ছে।" মা পাশ ফিরে শুয়ে আছেন, আমি শান্তিকে ইশারায় ডেকে চুপি চুপি বললাম ঃ "আয়, তুইও একটু মায়ের পায়ে হাত বুলিয়ে দে।" শান্তি তার কচি হাতে মায়ের পায়ে হাত বুলোচ্ছে দেখে মা হেসে বললেন ঃ "ও মা, তুই! তোকে আর বুলোতে হবে না।" বলে ওকে একটু আদর করে চুমু খেয়ে পাশে বসতে বললেন।

বেশ কিছুক্ষণ পর গোলাপ-মা এসে ঘরে ঢুকলেন। গোলাপ-মাকে দেখেই ভয়ে আমার হাত আপনা থেকেই থেমে গেল। এই বুঝি গোলাপ-মা বকুনি দেবেন মায়ের তক্তপোশে বসেছি বলে। মা চোখ বুজে ছিলেন। আমার হাত থেমে যেতে মা চোখ চেয়ে বললেন ঃ "কি হলো গো?" তারপর গোলাপ-মাকে দেখে বুঝতে পারলেন সব। গোলাপ-মা মাকে বললেন ঃ "আমাকে ডাকনি কেন?" মা কোমল কণ্ঠে বললেন ঃ "তোমরা তো সবসময়েই করছ। এদেরও তো মনে ইচ্ছে হয়। তাই আমিই বলেছি। তক্তপোশে বসে পা টিপতে আমিই ওকে বলেছি।" গোলাপ-মা একটু হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ "দাও গো মেয়ে, দাও।" এই প্রথম গোলাপ-মাকে হেসে এভাবে কথা বলতে দেখলাম। গোলাপ-মা হাসিমুখে মার ঘর থেকে চলে গেলেন। তার পরেও কিছুক্ষণ মায়ের পদসেবা করলাম। সন্ধ্যার মুখে মা বললেন ঃ "থাক মা, থাক। এখন খুব আরাম লাগছে।" কিছুক্ষণ পর মাকে প্রণাম করে বাড়ি ফিরলাম। বাড়ি ফিরে হাত-দুটো দিয়ে আর কোন কাজ করতে ইচ্ছে করছিল না। মনে হচ্ছিল—মায়ের পায়ের ছোঁয়া লেগে রয়েছে হাত-দুটোতে, অন্য কিছুতে হাত দিলে সেই ছোঁয়া হারিয়ে যাবে। সেদিন রাত্রে আনন্দে আর ঘুম হয়নি। অন্তর্যামিনী মায়ের করুণার কথা ভেবে বারবার চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছিল। তারপরেও দু-তিনদিন ধরে হাত-দুটো দিয়ে কোন কিছু করতে ইচ্ছে করছিল না।

শ্রীশ্রীমায়ের কাছে সন্ধ্যাবেলা শুনতাম—"দুর্গা দুর্গা, শিব শিব, লক্ষ্মী-নারায়ণ, হরিবোল হরিবোল, গুরুদেব গুরুদেব, রাধা-শ্যাম, গঙ্গা গঙ্গা ব্রহ্মবারি, গোবিন্দ গোবিন্দ, জয় মা জগদম্বা।" মায়ের কাছে যে-ভালবাসা পেয়েছি তার কোন তুলনা হয় না। একদিন একজনকে মা বললেন ঃ "সবসময় ঠাকুরের কথা চিন্তা করবে। দেখবে মন আপনা-আপনি শান্ত হয়ে যাবে।" মায়ের এই কথাটি আমি সবসময় মনে রেখেছি। জীবনে যখনই দুঃখ-কষ্ট পেয়েছি, তখনই মায়ের কথাগুলি স্মরণ করে শান্তি পেয়েছি, শক্তি পেয়েছি।

একদিন 'মায়ের বাড়ী'তে গিয়ে দেখি, মায়ের ঘরে বেশ কয়েকজন ভক্ত মহিলা বসে আছেন। মা শুয়েছিলেন। আমাকে দেখে হাসিমুখে মা বললেন ঃ "এস, এস। আজ যে মেয়েকে নিয়ে আসনি? ওরা সব ভাল আছে তো?" আমি বললাম ঃ হ্যাঁ মা, সবাই ভাল আছে। মেয়েকে আনলে বড় জ্বালাতন করে আপনাকে। অতিষ্ঠ করে তোলে সবাইকে। তাড়াতাড়ি চলে যেতে হয়। তাই আজ ওকে রেখে এসেছি।" মা হেসে বললেন ঃ "কই, আমি তো বাপু বুঝতে পারি না আমাকে বিরক্ত করে। তাছাড়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা একটু দুষ্টুমি তো করবেই। এই যে রাধিকে দেখছ—ও কি কম বিরক্ত করেছে? ওর মা তো পাগল! ওর যত কিছু আবদার আহ্লাদ সব আমার কাছেই। আর কী যে বায়না! কথায় বলে না, 'ভিজে চিনি শুকিয়ে খাব, শুকনো চিনি ভিজিয়ে খাব'—সেইরকম বায়না রাধির। বায়না না মেটাতে পারলে শুরু করে দিত চিৎকার, কান্না। কত কিল চড় যে আমাকে দিয়েছে কী বলব! আমার ওপরে রাধির অত্যাচার দেখে আমার মা অস্থির হয়ে যেত। গজর গজর করে বলত, 'নিজের পেটের তো একটা হলো না, যত সব পরের ঝঞ্ঝাট নিয়ে কেমন করে যে তুই হাসিমুখে থাকিস বাপু তা বুঝিনে।' আমি আবার মাকে কতরকম বলে তবে শান্ত করতাম।" কথাগুলি বলে মা একটু চুপ করে থাকলেন। ঐ সময়ে একটি ভক্ত মেয়ে হাসতে হাসতে বলল ঃ "আচ্ছা মা, আজ যদি দিদিমা থাকতেন

তাহলে আরও কত অধৈর্য হতেন। আজ কত ছেলেমেয়ে 'মা মা' বলে এসে আপনাকে এত বিরক্ত করছে! আমরাও তো আপনার পেটে হইনি, তা বলে কি আমরা আপনার ছেলেমেয়ে নই?" একথা শুনেই মা উঠে বসলেন। তপ্তস্বরে বললেন ঃ "কী বললে, আমার পেটে হওনি? তবে কার পেটে হয়েছ? আমার ছেলেমেয়ে নও? তবে কার ছেলেমেয়ে? আমি ছাড়া মা আর কেউ আছে নাকি? সব মেয়ের ভিতরেই আমি, সব মায়ের মধ্যেই আমি রয়েছি। যে যেখান থেকেই আসুক সব্বাই আমার ছেলেমেয়ে। এটা সত্যি সত্যি জানবে। 'মা' বলে ডেকে যারাই আমার কাছে আসে তারা সবাই আমার ছেলেমেয়ে। আমার মা-ও শেষ জীবনে বুঝেছিলেন নরেন, রাখাল, শরৎ, সারদা, যোগেন, নিরঞ্জন, গিরিশবাবু, নিবেদিতা—এদের দেখে। তাদের 'মা' ডাক শুনে কত খুশি হয়েছিলেন মা। বলতেন, 'আহা আমার মনের সাধ মা-দুর্গা এতদিনে মিটিয়েছেন। আমার সারদার কত ছেলেমেয়ে! ওরা যখন আমাকে 'দিদিমা' বলে ডাকে আমার প্রাণটা জুড়িয়ে যায়। ওরা যখন আবদার করে আমার কাছে খেতে চায়, কথা বলে, গল্প করে তখন কত যে আনন্দ আমার হয় তা কি আর বলব!' মা কত খুশি হয়ে ছেলেদের নাড়ু-মুড়ি দিতেন আর ওরা একসঙ্গে হৈহৈ করে খেত। মা বসে বসে দেখতেন আর হাসতেন। মায়ের মুখে কী যে তৃপ্তি তখন দেখেছি! তখন অবশ্য মেয়েরা এত ছিল না, আর জয়রামবাটীতেও মেয়েরা এত যেত না। জয়রামবাটীতে যখন মেয়েদের যাওয়া শুরু হলো তখন মা চলে গেছেন। কিন্তু যাবার সময় আমার 'মা' হওয়া দেখে বড় আনন্দ নিয়ে গেছেন গো।"

যে-মেয়েটি মাকে প্রশ্ন করেছিল সে বোধহয় একটু সঙ্কুচিত বোধ করছিল। মা থামতেই মায়ের পা ধরে সে খুব কাঁদতে লাগল। মা তার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন ঃ "এখনো সময় আসেনি মা সবকিছু বুঝে নেবার। তাই তো আমার ছেলেমেয়েরা অবুঝের মতো কথা বলে। সময় হলেই সব বুঝতে পারবে।" আসলে

'আমরাও তো আপনার পেটে হইনি'—এই কথাটা মায়ের কাছে ছিল অসহ্য। মহিলাটি বারবার মায়ের কাছে ক্ষমা চাইছিল। মা কিন্তু ক্ষমার মূর্তি হয়ে হাসছিলেন আর তাকে বোঝাচ্ছিলেন। দৃশ্যটি দেখে ওখানে সকলের চোখে জল আসছিল। মা কিছুক্ষণ পর বললেন : "দেখ মা, সবাই কি সহজে বুঝতে পারে? সংসারে মানুষের কত কষ্ট! এইসব কষ্ট দেখেই তো ভগবান বারবার নেমে আসেন। কিন্তু ভগবানের অবতারদের কজন চিনতে পারে, কজন বুঝতে পারে? যখন তাঁরা চলে যান তখন লোকে ক্রমশঃ বোঝে।" মা কি বলতে চাইছিলেন, স্বয়ং জগদম্বা পৃথিবীতে নেমে এসেছেন তাঁর রূপে?—তাঁকে জগতের মা বলে এখন সবাই চিনতে পারছে না, কিন্তু ক্রমে পারবে? সেদিন আর কোন কথা হলো না। একটু পরে মাকে প্রণাম করে প্রসাদ নিয়ে সবাই চলে এলাম।

দু-চারদিন মায়ের কাছে না গেলে মন খুব খারাপ হয়ে যেত। একদিন 'মায়ের বাড়ী'তে গেছি। দেখলাম, মা পা ছড়িয়ে পাশের ঘরে মেঝেয় বসে আছেন। একটি মেয়ে মায়ের পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আমাকে দেখে মা হেসে বললেন : "এস মা। (আমার সঙ্গে শান্তিকে দেখে) আজ যে দেখছি আমার পল্টন এসেছে।" শান্তি মাকে প্রণাম করতে মা তার চিবুকে হাত দিয়ে চুমু খেয়ে বললেন : "শিশুদের ভিতরে ভগবানের আসন পাতা। তাদের মধ্যে তাঁর প্রকাশ বেশি, কারণ তারা সরল ও পবিত্র। তাই তো ঠাকুর বলতেন, শিশুর মতো মাকে ডাকলে মা ছুটে আসবেনই।" একটু চুপ করে যেন অন্তর্মুখী হয়ে মা বললেন : "আহা, ঠাকুরের ঠিক এমনটিই হয়েছিল! তখন আমি জয়রামবাটীতে—খুব ছোটটি নই। শুনতাম, গঙ্গার পাড়ে মুখ ঘষে 'মা, মা' বলে কাঁদেন, 'দেখা দে, দেখা দে' বলে মাকে ডাকেন। লোকে তো বুঝত না কিছু। তাই পাগল বলে রটাত। শুনে আমার খুব কষ্ট হতো। কাউকে কিছু লজ্জায় বলতেও পারতাম না, শুধু ভানু-পিসির কাছে গিয়ে ছলছল চোখে বসলেই সব বুঝতে পারত। আমাকে জড়িয়ে ধরে

আদর করে, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে সে বোঝাত—'লোকের কথায় কান দিয়ে কেন মন খারাপ করিস? অমন শিবের মতো স্বামী তোর! আমি বাসরঘরেই চিনেছি। তুই ভাবিস না। একদিন দেখবি, ঐ পাগলই জয় করবে সবার মন। সে তো মায়ের নামে পাগল। মা-ই সব ঠিক করে দেবেন।' এরকম কত কথা বলে কাছটিতে শোয়াত। তাঁর মতো মাকে আর কি কেউ ডাকতে পেরেছে বা পারবে, মা? তিনি জগৎকে দেখিয়ে শিখিয়ে দিয়ে গেছেন কেমন করে সব ভুলে শুধু 'মা, মা' বলে ডাকলে মাকে পাওয়া যায়। সেজন্যই তো তিনি বলতেন, 'শিশুর মতো সরল মনে মাকে ডাকলে মা যেমন সব কাজ ফেলে দিয়ে ছুটে আসে, ভগবানকেও তেমনি আন্তরিকভাবে ডাকলে আসবেনই আসবেন।' তোমরাই বল না, সংসারের কাজে যতই ব্যস্ত থাক, যখন ছেলে বা মেয়ে 'মা, মা' বলে চেঁচিয়ে কাঁদে তখন কি সব কাজ ফেলে রেখে আগে তাকে কোলে নাও না? মায়ের কথা শুনে আমরা সবাই হাসতে থাকলাম। মা-ও হেসে বললেন : "কি, ঠিক বলিনি? আমরা হেসে বললাম : "ঠিক বলেছেন মা।"

আমি হঠাৎ বলে ফেললাম : "আচ্ছা মা, তুমি যে—"। বলেই জিভ কেটে চুপ করে গেলাম। মা বললেন : "কি হলো, জিভ কাটলে কেন?" আমি লজ্জিত হয়ে বললাম : "মা, আপনাকে 'তুমি' বলে ফেলেছি—ক্ষমা করবেন।" মা জোরে হেসে বললেন : "দেখ পাগলী মেয়ের কাণ্ড, তাতে কী হয়েছে? নিজের মাকে লোকে 'তুমি' বলে না তো কি 'আপনি, আজ্ঞে' করে বলে? আমি তো তোমাদের সকলের মা, সত্যিকারের মা। আমাকে 'তুমি'-ই তো বলবে।" মায়ের স্নেহ-বিগলিত কথাগুলি এবং মা যে আমাদের 'সত্যিকারের মা'—একথা তাঁর নিজের মুখ থেকে শুনে আমার সারা শরীর যেন কেমন হয়ে গেল, চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। আমি মায়ের পায়ের ওপরে নিজের মাথা রেখে পা-দুটি ধরে খুব কাঁদছি। মা আমার মাথায় হাত দিয়ে হাসতে হাসতে বলছেন শুনতে

পেলাম : "দেখ, মেয়ে আমার কেঁদে আকুল। বল, কি জিজ্ঞাসা করছিলে।" ততক্ষণে আমি উঠে বসেছি। আমি কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই গোলাপ-মা এসে মাকে ঠাকুরের বৈকালী ভোগ দেবার কথা বলতে মা আমাদের বসতে বলে ঐ ঘর থেকে ঠাকুরঘরে (যেটি তাঁর নিজের ঘরও) গেলেন। সেদিন সুধীরা-দিও ছিলেন। মা উঠে যেতেই সুধীরা-দি আমাকে বললেন : "তুমি আজ করলে কি গো—আজ মায়ের নিজের মুখ থেকে মা যে জগতের সকলের মা এবং সকলের সত্যিকারের মা তা আমাদের সবাইকে জানবার ও শুনবার সৌভাগ্য করিয়ে দিলে! মা তো সবসময় নিজেকে গোপন করে রাখেন, ধরা দিতে চান না।" আমি বললাম : "তাই তো সুধীরা-দি, আমরা কতটুকু মাকে বুঝতে পারি। তবু তো আপনি, সরলা-দি মাকে অনেক বেশি পান। আমি তো সংসারী—কখনো দুই-একদিন বাদে, আবার কখনো সাতদিন বাদে একটুখানি সময়ের জন্য মাকে কাছে পাই।" এরকম আমাদের কথাবার্তা চলছে, কিছুক্ষণ পর মা হাসিমুখে ফিরে এলেন। বললেন : "কি গো, কি সব কথা হচ্ছে তোমাদের?" সুধীরা-দি বললেন : "সুহাস আপনার কাছে বেশি আসতে পারে না, তাই দুঃখ করছিল।" মা বললেন : "দুঃখ কেন মা, সংসার তো ঠাকুরই দিয়েছেন। ওটা তো তোমাদের কর্তব্য। কর্তব্য সেরে তবে তো আসবে। এই যে সুধীরা, সুমতি, সরলা—এরাও তো নিজের নিজের কাজ সেরে তবে আসে। ইচ্ছে হলেই তো হয় না মা। ইচ্ছে পূরণ তো মানুষের হাতে নয়। তাঁর ইচ্ছেয় সব হয়।" বিকেল প্রায় শেষ হয়ে আসছে দেখে চলে আসতে হলো। সুধীরা-দিরা বসে রইলেন। আমার আসতে মোটেই ইচ্ছে করছিল না। মায়ের কাছ ছেড়ে কখনোই আসতে ইচ্ছে হয় না।

চার-পাঁচদিন পর আবার গিয়েছি মায়ের কাছে। সেদিন ছিল ছুটির দিন। একাই গিয়েছি। মায়ের ঘরে ঢুকে দেখি অনেকে এসেছেন। মাকে প্রণাম করতে মা হাসিমুখে মাথায় হাত দিয়ে, চিবুকে চুমু

খেয়ে বললেন ঃ "বোসো মা।" সরলা-দি, সুধীরা-দিও ছিলেন। ওঁরাও হেসে ওঁদের পাশে আমাকে বসতে বললেন। সুধীরা-দি বললেন ঃ "তুমি সেদিন মাকে কি একটা কথা বলতে গিয়ে থেমে গিয়েছিলে। সে-কথাটা কি?" আমি সঙ্কুচিত হয়ে বললাম ঃ "সে এমন কিছু নয়। মা শিশুদের কথা বলছিলেন। তাদের সরলতার কথা, পবিত্র স্বভাবের কথা। ঐ প্রসঙ্গে আমি মাকে জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিলাম, সব শিশুর মনে কি জানার আগ্রহ থাকে? কোন কোন ছেলেমেয়েকে দেখি, কেমন যেন জবুথবু। কিভাবে তাদের মনে স্বাভাবিক কৌতূহল জাগানো যায়? কিভাবে তারা স্বাভাবিক ছেলেমেয়ের মতো হবে?" মা হেসে বললেন ঃ "সে কি গো, তোমরা মা হয়েছ আর কিভাবে ছেলেমেয়েদের মনের খবর জানবে তা তোমাদের বলে দিতে হবে? শোন, ওদের সাথে খুব সহজ সরল ভাবে মিশতে হয়। গল্প করতে হয়। ওদের বয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলা করতে দিতে হয়। ওদের বেশি বকা-ঝকা করতে নেই, মারতে নেই। ওদের বেশি বকা-ঝকা করলে, মারধর করলে ওরা ভয়ে জবুথবু হয়ে যাবে, দূরে সরে যাবে। ওদের ভালবেসে বুঝিয়ে দিলে ওরা সহজে বুঝবে। ওদের প্রশ্নকে ধমক দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে থামিয়ে দিতে নেই। ধমক দিলে বা ভয় দেখালে ওরা কোনকিছু জিজ্ঞেস করতে ভয় পাবে। ওদের মনের স্বাভাবিক বিকাশ বাধা পাবে।"

একদিন এক ভক্ত মহিলা মাকে প্রশ্ন করল ঃ "আচ্ছা মা, ঠাকুর তো কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করতে বলেছেন বারে বারে, কিন্তু যারা সংসারে রয়েছে তারা যদি সবাই স্ত্রী-পুত্র-পরিজন ত্যাগ করে চলে যায় তাহলে তাদের অবস্থা কি হবে? আর সংসারে আছি বলে কি আমরা ঠাকুরের ভালবাসা পাব না? তিনিই তো সব করেছেন—গৃহী এবং সাধু, মেয়ে এবং পুরুষ! তাহলে আমরা কি পাব না তাঁর কৃপা?" মা যেন একটু উত্তেজিতভাবে বললেন ঃ "সেকি কথা, মা? সংসারী হলে তাঁর স্নেহ, ভালবাসা, কৃপা তোমরা পাবে

না—একথা মনে আনছ কেন? বরং ত্যাগী ছেলেমেয়েদের চেয়েও বেশি করে তিনি গৃহী ভক্তদের জন্য ভাবতেন। বলতেন, 'ওরা বড় দুঃখী, অনেক জ্বালা পায় সংসারে। অনেকে বেরিয়ে আসার জন্য হাঁকপাঁক করে, কিন্তু বেরিয়ে আসতে পারে না। অনেকে মনে মনে বড় ব্যাকুল হয় তাঁকে পাবার জন্য, কিন্তু সংসার-জালে জড়িয়ে পড়ায় কিছু করে উঠতে পারে না।' জান মা, ঠাকুর বলতেন, 'সংসারীদের বড় জ্বালা। তাই মাকে বলি—মা, ওদের মনে ভাব-ভক্তি দাও; তাতে ওরা শান্তি পাবে।' 'কথামৃতে' পড়েছ তো ঠাকুরের কথা—'একহাতে ভগবানকে ধর, আর একহাতে সংসারের কাজ কর'। সাধুরা তো ভগবানের জন্য সব ছেড়েছুড়ে সংসার থেকে বেরিয়ে আসে। তাদের আর পিছুটান থাকে না। সংসারীদের কত মায়া-মোহ, দায়িত্ব-কর্তব্যের মধ্যে থাকতে হয়। তাদের পিঠে যেন বিশমন বোঝা। তাই ঠাকুর সংসারীদের জন্য বেশি ভাবতেন। তাঁর কাছে স্ত্রী-পুরুষের ভেদ ছিল না। পুরুষ ভক্তদের জন্য যেমন ভাবতেন, তেমনি ভাবতেন মেয়ে ভক্তদের জন্যও। তোমাদের তিনি খুব ভালবাসেন মা—একথা সবসময়ে মনে রেখ।"

আরেকদিন মায়ের কাছে বসে আছি অনেকে। সেদিন একজন ভগবান যীশুখ্রীস্টের কথা তুলেছেন। মা শুয়েছিলেন। যীশুর কথা ওঠায় উঠে বসে দুটি হাত জোড় করে যীশুর উদ্দেশে প্রণাম করে বললেন : "নিবেদিতার কাছে যীশুখ্রীস্টের কথা আমি অনেক শুনেছি। ওদের যে বই আছে 'বাইবেল', তা থেকে সে আমাকে যীশুর কত সুন্দর সুন্দর কথা পড়ে শুনিয়েছিল। আহা, জগতের লোককে উদ্ধার করতে এসে যীশুকে কত দুঃখ-কষ্টই না ভোগ করতে হয়েছে, তবু হাসিমুখে তিনি সব সহ্য করেছেন—সবাইকে ভালবেসে অত অত্যাচারের পরও নিঃশর্তে ক্ষমা করে গেছেন! নিজের শিষ্যই তো তাঁকে ধরিয়ে দিলে! আহা, হাতে পায়ে বুকে পেরেক বিঁধে কত যন্ত্রণা দিয়ে তাঁকে তারা মারল! অত যন্ত্রণা, অত লাঞ্ছনা সত্ত্বেও হাসিমুখে সবাইকে ক্ষমা করে গেলেন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা

করলেন, তিনি যেন তাদের অপরাধ না নেন। এই ভালবাসা, এই সহ্যশক্তি, এই ক্ষমা—এ কি মানুষের পক্ষে সম্ভব? ভগবান ছাড়া এরকম আর কে সহ্য করতে পারে? ভগবানই তো যীশুর রূপে এসে জগৎকে প্রেমের শিক্ষা দিলেন। তাই তো দেখ না, ওদেশের মেয়ে নিবেদিতা এদেশে এসে আমাদের ঘরের মেয়েদের জন্য কত অপমান, লাঞ্ছনা সহ্য করেও হাসিমুখে কাজ করেছে, কত কষ্ট করে এখানে থেকে তাদের লেখাপড়া শেখাতে চেষ্টা করেছে। লোকের বাড়ি গেলে তারা অপমান করেছে, ঘরে ঢুকতে দেয়নি—যদি-বা ঢুকেছে, চলে আসতে না আসতে অথবা চলে আসার পর গোবরজল, গঙ্গাজল ছিটিয়েছে। চোখে দেখেও কিছু মনে করেনি। হাসিমুখে বেরিয়ে এসেছে। তার তো কোন দরকার ছিল না বাপু নিজের জীবনকে তিল তিল করে ক্ষয় করে, এত অসম্মান, লাঞ্ছনা সহ্য করে এদেশের মেয়েদের জন্য কাজ করার! কিন্তু মেয়ের আমার এমন সুন্দর মন যে, যেহেতু নরেন চেয়েছে—তার গুরু চেয়েছে, গুরু বলেছে—তাই এদেশের মেয়েদের শিক্ষার ভার সে তার নিজের কাঁধে নিয়েছে। দুঃখ-কষ্ট, অপমান কোন কিছুকেই গ্রাহ্য করেনি, অথচ যাদের জন্য সে নিজেকে তিল তিল করে ক্ষয় করেছে তারাই তাকে দূর-দূর করেছে। আমাদের দেশের মেয়েরা কি এই পরিস্থিতিতে গুরুর জন্য এতখানি ত্যাগ করতে পারত?—বলত, 'বয়ে গেছে আমাদের'! তাই তো বলি, ঠাকুর যে কিভাবে কখন কাকে দিয়ে কী করিয়ে নেন তা তিনি ছাড়া কেউ জানে না, বোঝে না।"

একদিন একজন ভক্ত মহিলা মাকে বললেন ঃ "মা, আমরা তো সারা দিনরাত সংসার নিয়ে, সংসারের সকলের ফরমাস আর চাহিদা মেটাতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ি। সারা দিন-রাতে পাঁচটা মিনিটও ঠাকুরকে ডাকতে সময় পাই না। আমাদের কী হবে মা? আমাদের ওপর কি তাঁর দয়া হবে না?" মা বললেন ঃ "নিশ্চয় হবে মা। তিনি তো অন্তর্যামী। সবার বুকের মাঝে তিনি সবসময় আছেন। তোমার ভিতরে আকুতি থাকলে তা তিনি বুঝবেনই বুঝবেন। তাছাড়া

সংসারের কাজ কি তোমরা কর মা? তিনিই করান। এ সংসার তো তাঁরই। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কি কিছু হয় মা? তাঁর ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতাটিও নড়ে না। 'কৃষ্ণ-ইচ্ছা বিনা কোন কর্ম নাহি হয়।' তোমার মধ্যে এই যে ব্যাকুলতাটা এসেছে, জানবে তাঁর ইচ্ছাতেই এসেছে। যে তাঁকে ভালবাসে, তাকে তিনি রক্ষা করেন। তাঁকে ভালবাস আর নাই বাস, তিনি তোমাকে ভালবাসেন। সংসারে সাধুও আছে আবার গৃহীও আছে। তবে গৃহীর জন্যই তিনি বেশি ভাবেন। সাধু তো তাঁকে ডাকবেই, কিন্তু গৃহীর যে পিঠে বিশমন বোঝা, ঠাকুর বলতেন। তাই গৃহীর জন্যই তাঁর চিন্তা বেশি। শুধু একটু স্মরণ-মনন করলেই হলো। মনে-প্রাণে ব্যাকুলভাবে তাঁকে ডাক। তাঁর স্মরণ-মনন কর। দিনান্তে দুফোঁটা চোখের জল ফেলে তাঁর নাম কর। ঐ দুফোঁটা চোখের জল ছাড়া তোমাদের কি-ই বা আছে বল? আর সবই তো তাঁর। ঐ দুফোঁটা জল শুধু তোমার। ওটুকুই তাঁকে দিও। তোমাদের কাছে বাঁধা হয়ে থাকবেন তিনি। ভয় কি মা, ঠাকুর এসে এবার তোমাদের জন্য ভগবানকে পাওয়ার এই সহজ পথ বলে দিয়ে গিয়েছেন।"

একদিন মায়ের কাছে গিয়েছি। মনটা খুব খারাপ। মাকে বললাম : "মনে যে কিছুতেই শান্তি পাই না, সংসারের জ্বালায় শেষ হয়ে যাচ্ছি। আপনার সঙ্গে কথা বলে শুধু শান্তি পাই।" আমার চোখে জল দেখে মা বললেন : "তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন মা, যাকিছু হচ্ছে সবই ঠাকুরের ইচ্ছেয় হচ্ছে! এই যে আমার কাছে আসা—এও তো তাঁরই ইচ্ছেয়। ভগবানকে ভালবাস, ছেলেমেয়েদের ভগবানকে ভালবাসতে শেখাও। তাঁকে যেন আপনার জন মনে করে তারা ভালবাসতে শেখে। পৃথিবীতে যখন জীব আসে তখন যে যার পূর্বজন্মের প্রাক্তনকে নিয়ে আসে। তাই অনেককে দেখা যায়, ছেলেবেলা থেকে ভগবানকে ভালবাসে। কেউ হয়তো বড় হয়ে বিপথে যায়। সবই নিজের নিজের প্রাক্তন কর্মের ফল। তবে তাঁর কৃপা হলে তাঁর নিজের লেখা তিনি কেটে দেন। নিজের লেখা নিজে কাটেন।

এজন্যই তো তাঁকে বলে 'কপালমোচন'। সবই যখন তাঁরই হাতে তখন তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ করবে।"

বড় তৃপ্তি নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। দু-দিন যেতে পারিনি। তারপরে যখন গেলাম, দেখলাম মা তাঁর ঘরে বসে আছেন। ঠাকুরের কথা বলছেন, নিজের কথাও বলছেন ঃ "বিয়ের পর জয়রামবাটীতেই থেকেছি বেশি। ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বর থেকে কামারপুকুরে আসতেন তখন শাশুড়ি-মা লোক পাঠিয়ে আমাকে নিয়ে যেতেন। তখন তো ছোটটি ছিলাম। যে যেমন বলত সেইমত করতাম। ওরা শিখিয়ে দিত কিভাবে শাশুড়ির সেবা করতে হয়, স্বামীর সেবা করতে হয়। শাশুড়ি-মা আমাকে বড় ভালবাসতেন। সন্ধ্যাবেলা পাড়ার সব মেয়ে-পুরুষ বাড়িতে আসত ঠাকুরের কথা শুনতে, তাঁর গান শুনতে। ঠাকুর কত কথা বলতেন—কত মজার মজার কথা। আবার তিনি কখনো কখনো গান গাইতেন। আমি চুপটি করে একপাশে বসে শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তাম। কেউ ডাকলে ঠাকুর বলতেন, 'ওকে ডেকো না, ও ঘুমোক।' তারপরে তো দক্ষিণেশ্বরে গেলাম। দক্ষিণেশ্বর থেকে যখন দেশে আসতাম তখন ঠাকুরের জন্য খুব মন খারাপ করত। জয়রামবাটীতে থাকলে ভানু-পিসির কাছেই বেশি থাকতাম। সে আমার মনের কথা বুঝত। পরের দিকে দক্ষিণেশ্বরে নহবতে থাকলেও ঠাকুরের সঙ্গে বেশি দেখা হওয়ার সুযোগ ছিল না। তখন তো তাঁর কাছে লোকের ভিড় হয়ে গেছে। তারপর তো সব ছেলেরা একে একে এসে গেল।" একজন হঠাৎ বলে উঠল ঃ "আচ্ছা মা, ঠাকুর যখন তোমাকে ষোড়শীপূজা করেছিলেন, তখন তোমার কী মনে হয়েছিল?" মা একটু সলজ্জ হেসে বললেন ঃ "কি জানি মা, আমি যেন কিছু বুঝতেই পারিনি। যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম। মা-ভবতারিণী বোধহয় আমার ওপর ভর করেছিলেন। তাই বোধহয় কি হচ্ছে সেবিষয়ে আমার কোন হুঁশ ছিল না। ঠাকুর যে আমাকে সাজালেন, পায়ে আলতা পরালেন, পুজো করলেন, প্রণাম করলেন—আমি সব দেখছি, কিন্তু কিছুই যেন আমার মনে

রেখাপাত করছে না। নইলে ঠাকুর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন, আর আমি স্থির হয়ে বসে রইলাম! অনেক পরে যখন স্বাভাবিক হয়েছিলাম তখন মনে মনে বারবার তাঁকে প্রণাম করে মার্জনা চেয়ে নিয়েছি।" কথাগুলি বলে মা যেন কেমন স্থির হয়ে গেলেন। অনেকটা সময় চোখ বুজে চুপ করে বসে রইলেন। অন্যরা তখন কি ভাবছিল জানি না, আমি কিন্তু তখন মনে মনে বলছিলাম : "মা, তুমি যতই লুকোতে চেষ্টা কর না কেন, ঠাকুরের দয়ায় বুঝেছি তুমিই স্বয়ং মা ভবতারিণী।"

ঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই দেখতাম মা যেন অন্য জগতের হয়ে যেতেন। একদিন ঠাকুরের কথা বলছেন : "দক্ষিণেশ্বরে যখন প্রথম তাঁর কাছে এসেছি, তাঁর কাছে রয়েছি তখন 'ভাব', 'সমাধি'—এসব তো কিছু বুঝতাম না। দেখতাম, সারারাত ঠাকুর বসে আছেন। তাঁকে ঘিরে রয়েছে এক অপূর্ব আলো। তাঁর সর্বাঙ্গ নিস্পন্দ, নিথর। মুখে অপূর্ব হাসির রেখা। আমি তো ভয়ে কাঁটা হয়ে যেতাম। জড়সড় হয়ে বসে থাকতাম। কি করব বুঝতে পারতাম না। প্রথম প্রথম ভাগনেকে (হৃদয়কে) ডাকতাম। সে এসে ঠাকুরের কানে মায়ের নাম শোনাত। দেখতাম, ঠাকুর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছেন। রাত্রে আমার ঘুম হয় না বুঝতে পেরে কিছুদিন পর ঠাকুর আমাকে নহবতে পাঠিয়ে দিলেন। আমাকে অবশ্য শিখিয়ে দিয়েছিলেন কিরকম ভাব হলে কোন্ নাম শোনাতে হবে। আমার জন্য কত চিন্তা করতেন। কিসে আমি ভাল থাকব তা ভেবে ব্যস্ত হতেন। কী ভালবাসাই না তাঁর ছিল! লোকে তো পাগল বলে গুজব ছড়িয়ে দিয়েছিল। আমার মা-বাবার মনে কতই না ভাবনা হয়েছিল! পরে সব দেখেশুনে তাঁরা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন।"

কয়েক মাস মায়ের সান্নিধ্যে মহানন্দে কেটে গেল। তারপর আনন্দের দিন শেষ হয়ে গেল। মা দেশে চলে গেলেন। কারণ, রাধু দেশে যাবার জন্য বায়না ধরেছিল। রাধু ছিল তখন সন্তানসম্ভবা। বছরখানেক পর যখন মা কলকাতায় ফিরলেন তখন তিনি খুবই অসুস্থ। ফলে

মায়ের সঙ্গে বিশেষ কথা বলার সুযোগ হয়নি। কিছুদিন পর দেখলাম মায়ের শরীর মোটেই ভাল যাচ্ছে না। সরলা-দিকে মায়ের সেবার অনেকখানি দায়িত্ব নিতে হয়েছে। তাকে বেশির ভাগ সময় উদ্বোধনে মায়ের কাছেই থাকতে হয়। দেখে আমার মনে হলো, আমি যদি এই সংসারজালে জড়িয়ে না পড়তাম তাহলে আমিও তো মায়ের সেবা করতে পারতাম! মায়ের শরীর ভাল নয় বলে মায়ের দর্শন প্রায়-বন্ধ ছিল। মায়ের জন্য খুব মন খারাপ করত। একদিন সরলা-দি আমাদের বাড়িতে এল। বলল ঃ "মা আগের চেয়ে একটু ভাল। এখন মাকে দর্শন করতে যেতে পার।" পরের দিনই মাকে দর্শন করতে গিয়েছি। দেখলাম, মা খুবই দুর্বল। কথা বলতে কষ্ট হয়, বেশিক্ষণ বসতে পারেন না। কিছুক্ষণ মায়ের কাছে বসে বসে মাকে দেখলাম। আসার সময় প্রণাম করতেই মাথায় হাত রাখলেন এবং অপূর্ব স্নেহের সঙ্গে মধুমাখা কণ্ঠে বললেন ঃ "প্রসাদ নিয়ে যেও মা।"

কিছুদিন পর মা আরও অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মায়ের দর্শন বন্ধই হয়ে গেল প্রায়। আমরা গিয়ে দূর থেকে মনে মনে তাঁকে প্রণাম করে চলে আসতাম। কখনো কখনো মা চোখ খুলে আমাদের দেখতেন। তার মধ্যেও দেখতাম, ইশারায় গোলাপ-মাকে অথবা সরলা-দিকে বলতেন সবাইকে প্রসাদ দিতে। একদিন দেখি, সদর দরজার কাছে শরৎ মহারাজ স্বয়ং দাঁড়িয়ে আছেন। সেদিন অনেক পুরুষ ও মহিলা ভক্তকে দেখলাম 'মায়ের বাড়ী'তে। মহারাজ বলছেন ঃ "কেউ ওপরে যাবেন না। মায়ের শরীর একেবারেই ভাল নেই।" কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে এলাম। দু-একদিন পরে এল শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিন। খবর পেয়ে ভোরবেলা 'মায়ের বাড়ী'তে গেলাম। লোকে লোকারণ্য। সকলের চোখে জল। মেয়েরা ডুকরে কাঁদছে। আমারও বুক ফেটে কান্না এল। দেখলাম, মায়ের ঘরে ফুলে ফুলে ঢাকা মায়ের ভাগবতী তনু। মুখখানা জ্যোতির্ময়—করুণায় ঢলঢল।

মাকে দেখেই মন ভরে থাকত। মায়ের কাছে দীক্ষা নেওয়ার কত সুযোগ ছিল। কিন্তু তখন দীক্ষা নেওয়ার কথা তেমন মনে ওঠেনি। ছেলেমেয়ে সামলাতেই হিমসিম খেতাম। ভাবতাম, দীক্ষা নিয়ে পুজো-জপ কিছুই করতে পারব না। সরলা-দিকে দু-একবার বলেছিলাম। সে বলত ঃ "ব্যস্ত হয়ো না, সময় হলেই সব হবে।" তারপর তো মা চলেই গেলেন। পরে মায়ের 'ভারী', 'বাসুকি' শরৎ মহারাজের চরণে আশ্রয় পেলাম। মাকে হারিয়ে তাঁর মধ্যে আবার মাকেই ফিরে পেয়েছিলাম।* □

* দ্রঃ উদ্বোধন, ৯৮তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৌষ ১৪০৩, পৃঃ ৬৬৮-৬৭৪

পিসিমার কথা

শান্তিরাম দাস

জয়রামবাটীর পাশের গ্রাম হলদিতে আমাদের বাড়ি। জাতিতে আমরা দুলে। শ্রীশ্রীমাকে আমরা 'পিসিমা' বলতাম। তার কারণ, আমার বাবা তাঁকে 'দিদি' বলত। আমার বাবা যোগীন্দ্র দাস পিসিমার পালকিবেহারাদের সর্দার ছিল।[১] বাবার নিজের পালকি ছিল—আট বেহারার পালকি। আমার মায়ের নাম লক্ষ্মী। মা পিসিমার বাড়িতে কাজ করত। ঘর-দোর পরিষ্কার করত, বাসন মাজত, কাপড় কাচত। মাকে পিসিমা 'মাঝি-বউ' বলতেন, কখনো বলতেন 'লক্ষ্মী-বউ'। পিসিমা বাবাকে 'যোগীন' বলতেন, মহারাজরা বলতেন 'যোগে'। পিসিমা যখন জয়রামবাটী থেকে কোয়ালপাড়া অথবা কলকাতার পথে বিষ্ণুপুরে যেতেন তখন বাবার পালকিতে যেতেন। বাবা খুব ডাকাবুকো ছিল। লোকে সমীহ করে চলত বাবাকে। বাবা কিন্তু পিসিমাকে খুব ভয় করত। পিসিমা যদি একবার বাবাকে ডেকে পাঠাতেন, তাহলে বাবা তটস্থ হয়ে পিসিমার বাড়িতে হাজির হয়ে বলত : "দিদি, আমাকে ডেকেছ গো?" পালকিবেহারার কাজ ছাড়া বাবা আমোদরে নৌকা-মাঝির কাজও করত এবং নদীতে মাছও ধরত। ঠাকুরের ভোগে মাছ দেওয়া হতো। সেই মাছ যোগাড় করার দায়িত্ব পিসিমা দিয়েছিলেন বাবার ওপর। আমার মা-ও কখনো কখনো আমোদর থেকে চুনোমাছ ধরে পিসিমাকে দিয়ে যেত। বাবাকে যখন

---

১ স্বামী ঈশানানন্দের 'মাতৃসান্নিধ্যে' গ্রন্থে হলদি গ্রামের পালকিবেহারাদের সর্দার 'যোগে দুলে'র উল্লেখ আছে। সেখানে একথাও বলা আছে যে, যোগে দুলে মায়ের "খুব অনুগত"। জয়রামবাটী থেকে কলকাতায় শেষবার আসার সময় মা এই যোগে দুলের পালকিতেই জয়রামবাটী থেকে বিষ্ণুপুর এসেছিলেন। (দ্রঃ মাতৃসান্নিধ্যে, ৫ম সং, ১৯৮৯, পৃঃ ১৭৪-১৭৬)। এই 'যোগে দুলে'ই শান্তিরাম দাসের বাবা যোগীন্দ্র দাস।—সম্পাদক

পালকিবেহারার কাজে বাইরে যেতে হতো তখন পিসিমার বাড়িতে মাছ পৌঁছানোর দায়িত্ব পড়ত মায়ের ওপর। আমি নিজেও ছোটবেলায় পিসিমার বাড়িতে অনেকবার মাছ দিয়ে এসেছি।

আমরা ছয় ভাই-বোন। আমার ওপরে দুই দিদি, আমার পরে এক ভাই, দুই বোন। প্রথমে পর পর দুই মেয়ে হওয়ায় বাবা-মার মনে খুব দুঃখ ছিল। পাড়ার লোক, আত্মীয়-স্বজন ছেলে না হওয়ায় আমার মাকে নানা গঞ্জনা দিত। বাবাও ঐ কথা তুলে মাকে বকা-ঝকা করত, মদ খেয়ে এসে কখনো কখনো আবার মারতও। একদিন রাত্রে মদ খেয়ে বাবা মাকে বেদম মারল। পরদিন সকালে পিসিমার বাড়িতে কাজ করতে এসে মা কাঁদতে কাঁদতে সব কথা পিসিমাকে বলে। পিসিমা শুনে তৎক্ষণাৎ বাবাকে ডেকে পাঠান। বাবা এসে ভয়ে ভয়ে পিসিমার সামনে দাঁড়াল। পিসিমা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বাবাকে বললেন : "যোগীন, ঐভাবে বউকে মেরেছিস কেন?" ম্লান হেসে বাবা বলল : "ও তোমার কাছে আমার নামে নালিশ করে দিয়েছে! কি করব বল দিদি, বংশ থাকবে না—এই দুঃখে ওকে মেরেছি।" পিসিমা দৃঢ়ভাবে বললেন : "আর কখনো বউয়ের গায়ে হাত তুলবি না বলে দিলাম। কোন গঞ্জনা দিবি না। ছেলে হয়নি বলে তোর যদি দুঃখ হয়ে থাকে, ওরও তো দুঃখ থাকতে পারে। ও বেচারা কি করবে?" বাবা আর কি বলবে, মাথা হেঁট করে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ পিসিমা বললেন : "যা, আমি বলছি, ঠাকুরের কৃপায় এবার তোদের ছেলে হবে। বউকে কিন্তু আর কখনো মারবি না।"

এর পর আমার জন্ম হয়। বাবা আনন্দে ডগমগ হয়ে পিসিমার কাছে ছুটে আসে আমার জন্মের সংবাদ জানাতে। পিসিমা খুব খুশি হয়ে হেসে বললেন : "এবার শান্তি হলো তো! পরপর দুটো মেয়ে হয়েছিল বলে খুব তো মাথা গরম করেছিলি।" বাবা মনে করল, পিসিমা আমার নাম রাখলেন 'শান্তি'। বাড়িতে গিয়ে বলল : "দিদি ছেলের নাম রেখেছে শান্তি।" তাই আমার নাম শান্তি—পোশাকী

নাম শান্তিরাম। আমার বাবা ও মা বলত, পিসিমার বরেই তারা ছেলের মুখ দেখেছে। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা বলি। আমি তখন মায়ের পেটে। মা একদিন পিসিমার নতুন বাড়ির সংলগ্ন পুণ্যিপুকুরে মাছ ধরছে। পিসিমার শিষ্য বাঁকুড়ার বিভূতিবাবু (বিভূতিভূষণ ঘোষ) তখন জয়রামবাটীতে রয়েছেন। মাকে তিনি চিনতেন। কারণ, বিভূতিবাবু প্রায়ই পিসিমার বাড়িতে আসাযাওয়া করতেন। মাকে পুকুরে ছোট জাল দিয়ে মাছ ধরতে দেখে বিভূতিবাবু পিসিমাকে বললেন ঃ "মা, লক্ষ্মী পোয়াতি মানুষ। ও ঐভাবে পুকুরে মাছ ধরছে, ওর পেটের বাচ্চার কোন ক্ষতি হবে না তো?" পিসিমা বললেন ঃ "না বাবা। ওদের বর দেওয়া আছে।"

আমার জন্মের দু-তিন মাস পর পিসিমা বাবাকে একদিন বললেন ঃ "যোগীন, মুখেভাতের দিন তোর ছেলেকে আমার কাছে নিয়ে আসবি। আমি তোর ছেলেকে প্রসাদ খাইয়ে দেব।" বাবা বলত, মুখেভাতের দিন সকালে বাবা-মা আমাকে কোলে করে পিসিমার বাড়িতে নিয়ে আসে। পিসিমা রাধু-দির বাটিতে দুধ-ভাত মেখে নিজে আমাকে খাইয়ে দিয়েছিলেন। সেদিন পিসিমা আমাকে একজোড়া রুপোর বালাও দিয়েছিলেন। বালাজোড়া আজও আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি। এখনো বেশ চকচকে আছে। কিশোরী মহারাজ (মায়ের সেবক স্বামী পরমেশ্বরানন্দ) আমাকে বলেছিলেন ঃ "ওরে শান্তি, তোর ঐ বালাজোড়া মা তোকে নিজের হাতে দিয়েছিলেন। ওর একটা আলাদা মূল্য আছে। তুই বালাজোড়া আমাদের দিয়ে দে—বেলুড় মঠে দিয়ে দেব। মায়ের নিজের হাতে দেওয়া জিনিস তো!" আমি কিন্তু মহারাজকে বালাজোড়া দিতে পারিনি। যতদিন প্রাণ থাকবে কাউকে দিতে পারবও না। অনেক সাধু, ভক্ত ঐ বালাজোড়ার কথা শুনে দেখতে চান। আমি এনে দেখালে তাঁরা মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করেন। পিসিমার আশীর্বাদের স্মৃতি আমার জীবনের অমূল্য সম্পদ, তাই যক্ষের ধনের মতো বালাজোড়াকে আগলে রেখেছি। রোজ মাথায় ঠেকাই।

ছেলেবেলা থেকেই মায়ের সঙ্গে পিসিমার বাড়িতে আসছি। তবে পিসিমাকে পুরনো বাড়িতে দেখার কথা মনে পড়ে না। আমার স্মৃতিতে নতুন বাড়িতে পিসিমাকে দেখার কথাই মনে আছে। সেই দেখা প্রথম, যখন আমার বয়স সাত-আট বছর। পিসিমার যে পা-ছড়ানো ছবিটা আছে, ঐরকম অবস্থায় পিসিমাকে আমি প্রথম দেখি। বাবা বলায় আমি বারান্দায় উঠে পিসিমাকে প্রণাম করলাম। পিসিমা আমার চিবুক ধরে আদর করলেন। তারপর হাত ভর্তি করে খাবার দিলেন। এই খাবারের লোভেই আমি এবং আমার ওপরের দিদি পিসিমার বাড়িতে প্রায়ই আসতাম। এলেই হাতভর্তি খাবার পেতাম। 'খাবার' মানে খইনাড়ু, তিলনাড়ু, গুড়ের জিলিপি, তেলেভাজা—এইসব। তখন তো আর জয়রামবাটীতে এখনকার মতো ছানার মিষ্টি পাওয়া যেত না। শুধু আমরাই নই, পিসিমার বাড়িতে গেলে পিসিমা সবাইকে হাত ভর্তি করে নাড়ু ও খাবার দিতেন।

রাধু-দির মার মাথায় গোলমাল ছিল। তাঁকে আমরা 'ক্ষেপী ঠাকরুন' বলতাম। তিনি পিসিমাকে মাঝে মাঝেই খুব গালাগাল দিতেন। একবার চেলাকাঠ দিয়ে পিসিমাকে মারতে গিয়েছিলেন। এই ঘটনা অবশ্য আমার দেখা নয়, আমি শুনেছিলাম। পিসিমা তো কাউকেই কখনো শক্ত কথা বলতে পারতেন না। সেদিন কিন্তু পিসিমার মুখ দিয়ে খুব শক্ত কথা বেরিয়েছিল। রাধু-দির মাকে চেলাকাঠ হাতে নিয়ে মারতে আসতে দেখে পিসিমার সেবক বরদা মহারাজ (স্বামী ঈশানানন্দ) তাঁর হাত থেকে ওটি কেড়ে নেন। নইলে সেদিন যে কী হতো কে জানে! রাধু-দির মার কাণ্ড দেখে সেদিন পিসিমা বলেছিলেন ঃ "পাগলী, এ তুই কি করছিলি! তোর ঐ হাত যে খসে পড়বে!" বলার পরে পিসিমার অনুশোচনার অন্ত ছিল না। কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন ঃ "ঠাকুর, এ তুমি আমার মুখ দিয়ে কী বলালে! এ আমি কী করলাম! এই মুখ দিয়ে তো কখনো অভিশাপ বেরোয়নি! তুমি ওকে ক্ষমা কোরো।" কিন্তু তখন তো যা হবার হয়ে গিয়েছে। পিসিমার মুখের বাক্য তো ভগবানেরও কাটার সাধ্য নেই। আমরা

নিজের চোখে দেখেছি, রাধু-দির মার হাতে গলিত কুষ্ঠ হয়েছিল। পিসিমা তো মানুষ ছিলেন না, ছিলেন সাক্ষাৎ ভগবতী।

পিসিমার গলার স্বর ছিল আলাদা। বড় মিষ্টি। থেমে থেমে আস্তে আস্তে কথা কইতেন। পিসিমার নতুন বাড়িতে একটি টিয়াপাখি ছিল—গঙ্গারাম। অনেকগুলি বেড়াল ছিল—পাঁচ-ছটা হবে। কোনটা সাদা, কোনটা সাদা-কালো, কোনটা সোনালী-সাদা, কোনটা ছাই রঙের। পিসিমা যখন খেতে বসতেন, বেড়ালগুলো পিসিমার থালার চারপাশে চুপ করে বসে থাকত। খাওয়া শেষ হলে পিসিমা বেড়ালগুলোকে দুধ-ভাত মেখে খেতে দিতেন। বেড়ালগুলোর ভাগ্য দেখে হিংসে হতো। এখনো ভাবলে হিংসে হয়। গঙ্গারামকেও পিসিমা নিজে হাতে করে খেতে দিতেন। গরুগুলোকেও দিতেন।

পিসিমার ভালবাসার কথা ভোলা যাবে না। ছোটজাতকে পিসিমা কখনো ছোট করে দেখেননি। দুলে, বাগদি, বারুই, ডোম সবাই নিঃসঙ্কোচে পিসিমার বাড়িতে যাতায়াত করত। সবাই যে কাজের জন্য পিসিমার বাড়িতে যেত তা নয়, ভালবাসার টানে যেত। সেযুগে বামুনদের বাড়ির ছাঁচতলায় ঢোকার অধিকার আমাদের ছিল না। জয়রামবাটীর বামুনরাও আমাদের ছোঁয়া থেকে শতহাত দূরে থাকত। সেযুগে জয়রামবাটীর বুকে আমরা পিসিমার একেবারে কাছে যাওয়ার অবাধ অধিকার পেয়েছি। পিসিমা আমাদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন। নীচু জাতের লোকেদের নিজের হাতে পরিবেশন করে খাইয়েছেন, এমনকি উচ্ছিষ্টও পরিষ্কার করেছেন। এইজন্য গাঁয়ের মোড়লরা, বামুনরা তাঁকে একঘরে করে দেবার হুমকি দিয়েছেন বারবার, জরিমানা করেছেন। কিন্তু পিসিমা কোন কিছুকেই গ্রাহ্য করেননি। তিনি আমাদের মতো সাধারণ মানুষ ছিলেন না। তাঁর সবকিছুই ছিল আলাদা।

পিসিমাকে দু-একবার হলদি গ্রামে কেনাকাটা করার জন্য আসতে দেখেছি। পালকি করে এসেছিলেন। তখনকার দিনে হলদিতেই ছিল রামকুমার যুঁইয়ের মুদিখানার বড় দোকান আর উপেন্দ্র যুঁইয়ের কাপড়ের

দোকান। পিসিমার সঙ্গে একজন কি দুজন মেয়েলোক থাকত। হলদিতে এসে তিনি বসতেন কালীমন্দিরে। পিসিমার সঙ্গে যে বা যারা আসত, সেই মেয়েলোকেরাই জিনিসপত্র দোকান থেকে কিনত। শুনেছি, আরও আগে যখন কলকাতা থেকে হঠাৎ হঠাৎ জয়রামবাটীতে ভক্তরা এসে উপস্থিত হতো তখন পিসিমা শেষরাত্রে একজন কি দুজন কাজের মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে হলদি বা অন্য কোথাও জিনিসপত্র, সবজি ইত্যাদি কিনতে আসতেন। ভক্তরা ঘুম থেকে ওঠার আগেই আবার হেঁটেই ফিরে যেতেন। পিসিমা যখন হলদির কালীমন্দিরে এসে বসতেন তখন গাঁয়ের ছোট ছেলেমেয়েরা এবং বড়রাও এসে জড় হতো। পিসিমা সকলের সঙ্গে সহজভাবে মিশে যেতেন। জগদ্ধাত্রীপুজোর সময় সকলকে পুজো দেখতে ও প্রসাদ পেতে জয়রামবাটীতে আসতে বলতেন।

বাবার কাছে শুনেছি যে, সেসময় পশ্চিম থেকে মেয়েমদ্দ কুলিরা ঐ অঞ্চলে আসত। তারা ধানচাষের সময় এবং ধানকাটার সময় শ্রমিকের কাজ করত। গ্রামের বাইরে মাস-ভর কুঁড়ে বেঁধে থাকত। দিনের কাজ শেষ হলে সন্ধ্যাবেলা কুলিরা পিসিমার বাড়িতে অনেকেই আসত। একবার কামিনদের মধ্যে একজনের সন্তান প্রসব হয়। শিশুকে পাশে শুইয়ে রেখে কামিনটিকে ধানঝাড়ার কাজ করতে দেখে পিসিমার খুব কষ্ট হয়েছিল। পিসিমা মেয়েটিকে ডেকে একটি নতুন কাপড় দিয়েছিলেন। শিশুটির জন্য তাঁর চিন্তার শেষ ছিল না। কাজ শেষ হলে গাঁ ছেড়ে যাবার আগে কুলি-কামিনরা পিসিমার সঙ্গে অবশ্যই দেখা করে যেত। তিনি তাদের সকলকে গুড়-মুড়ি, পুরনো কাপড় দিতেন।

তিনি যখন শেষবারের মতো জয়রামবাটী ছেড়ে কলকাতা গেলেন তখন আমার বয়স দশ বছর। পিসিমার সেই যাওয়ার ছবিটি আমার চোখের সামনে আজও ভাসে। সেবার পিসিমা শিহড় হয়ে বিষ্ণুপুর গিয়েছিলেন যথারীতি আমার বাবার পালকিতেই। পিসিমার সঙ্গে তাঁর ভাইঝিরা এবং সেবক বরদা মহারাজ ছিলেন। তখন জয়রামবাটী

থেকে কোয়ালপাড়া-কোতুলপুর যাওয়া যেত দুটো পথে। একটা আমোদর পেরিয়ে দেশড়া হয়ে, অন্যটা শিহড়-শিরোমণিপুর হয়ে। প্রথম পথটা দূরত্বে কম হলেও পথের অবস্থা ছিল খুব খারাপ এবং দ্বিতীয় পথটা দূরত্ব বেশি হলেও পথের অবস্থা ছিল ভাল। বর্তমানে দ্বিতীয় পথটি আর চালু নেই। সেবার পিসিমা যখন পালকি করে জয়রামবাটী থেকে যাত্রা করেছিলেন তখন গ্রামের অনেকেই শিহড় পর্যন্ত তাঁকে এগিয়ে দিতে গিয়েছিল। আমিও শিহড় পর্যন্ত পিসিমার পালকির পিছন পিছন গিয়েছিলাম। শিহড়ে শান্তিনাথের মন্দিরে পিসিমা পুজো দিয়ে সবাইকে প্রসাদ দিলেন। পিসিমার হাত থেকে শেষবারের মতো আমিও সেদিন প্রসাদ পেয়েছিলাম। তারপর কোয়ালপাড়ার পথে পিসিমার পালকি রওনা হলো। পিসিমাকে আমার সেই শেষ দেখা।

পিসিমার দেহরাখার খবর শুনে খুব কেঁদেছিলাম। কিশোরী মহারাজ আমায় কাঁদতে দেখে বলেছিলেন : "কাঁদছিস কেন রে বোকা! মা কি কোথাও গেছেন? এখানেই তো আছেন।" মহারাজের সেই কথা এখনো আমার কানে বাজে। আমি বিশ্বাস করি, পিসিমা আজও জয়রামবাটীতে তাঁর নতুন বাড়িতে আগের মতোই রয়েছেন। আজ আমার বয়স নব্বইয়ের কাছাকাছি। এখন খাটার ক্ষমতা নেই, তবু এখনো রোজ জয়রামবাটী আসি হলদি থেকে। পিসিমার উঠোনটা ঝাঁট দিই। আমার বিশ্বাস, পিসিমা এখনো এই উঠোন দিয়ে হাঁটেন। মহারাজরা আমার প্রসাদ পাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তাঁরা বলেন : "তোমাকে এই বয়সে এত কষ্ট করে আর ঝাঁট দিতে হবে না। তোমার যখন খুশি আসবে এবং প্রসাদ পাবে।" আমি এখনো রোজ আসি, প্রসাদ পাই, কিন্তু ঝাঁট দেওয়া বন্ধ করিনি। কারণ, ঐ উঠোন দিয়ে যে পিসিমা এখনো হাঁটেন। তাই প্রাণের তাগিদে উঠোন ঝাঁট দিই। পিসিমার নতুন বাড়িতে এলে আমি যেন আবার আমার সেই ছোটবেলায় ফিরে যাই। চোখের সামনে বেড়ালগুলোকে দেখতে পাই, দেখতে পাই পিসিমার টিয়াপাখি গঙ্গারামকেও। দেখি—পিসিমা

যেন নতুন বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে বলছেন : "বাবা শান্তি, দেখে আয় তো গরু চরিয়ে ছেলেটা (রাখাল) ফিরে এল কিনা। বড় দেরি হয়ে গেল। ও না খেলে আমি তো খেতে পারব না।"

পিসিমার পা-ছড়িয়ে-বসা ছবিটা আমার চোখের সামনে যেন জীবন্ত হয়ে ভাসে। বৃদ্ধা—কিন্তু দুচোখে কী মমতা! তবে আমি কিন্তু একদিন পিসিমাকে এক অন্য মূর্তিতেও দেখেছিলাম। আমি আর আমার এক দিদি সেদিন পিসিমার নতুন বাড়িতে গিয়েছি। পিসিমা বাড়ির বারান্দায় বসেছিলেন। হঠাৎ দেখলাম পিসিমা উঠে দাঁড়ালেন। অবাক হয়ে দেখলাম, পিসিমার মতো দেখতে, কিন্তু এ কোন্ পিসিমা? যুবতী, ঢলঢল দিব্য কান্তি, পিঠের দিকে চুল সব খোলা—যেন পায়ের কাছে ভুঁয়ে ঠেকে গেছে। ঠিক যেন মা-কালীর মতো। দিদিকে ভয়ে ভয়ে চুপিচুপি বললাম : "দিদি, পিসিমাকে দ্যাখ। কত চুল পিসিমার মাথায়।" দিদিও একই দৃশ্য দেখতে পেল। ভয়ে একছুটে দুজনে বাড়ি চলে গেলাম। পিসিমার সেই মূর্তি আজও আমার মনে আছে।

পিসিমা আমার নাম রেখেছিলেন 'শান্তি'। আজ শুধু আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা—কখন পিসিমা আমাকে কোলে তুলে নিয়ে পুরোপুরি শান্তি দেবেন[১]।* □

সংগ্রহ : কার্তিক সেন (ভদ্রকালী, জেলা—হুগলী) এবং অধ্যাপক তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া, জেলা—হুগলী)

সংগ্রহকাল : জানুয়ারি ১৯৯৫; স্থান : জয়রামবাটী

---

১ শান্তিরাম দাসের মৃত্যু হয় ১ আশ্বিন ১৪০৩ (১৯৯৬), বুধবার, ভোর চারটের সময়।

—সম্পাদক

* উদ্বোধন, ৯৮তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৌষ ১৪০৩, পৃঃ ৬৭৫-৬৭৮

করুণা-নির্ঝরিণী মা

সুরেশচন্দ্র চৌধুরী

আমরা পূর্ববঙ্গের লোক। ফরিদপুর জেলার ডহরপাড়া গ্রামে আমাদের বাড়ি ছিল। আমার বাবা গোপালগঞ্জে সরকারি উকিল ছিলেন। সেজন্য আমার শৈশব ও কৈশোর গোপালগঞ্জেই কাটে। স্কুলে পড়ার সময়েই আমি 'অনুশীলন সমিতি'র সদস্য হই এবং স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়ি। কিছুদিন পর রাজদ্রোহের অপরাধে আমাকে পুলিস গ্রেপ্তার করে এবং বছর দেড়েক কারাগারে কাটাই। জেলে থাকার সময় সহবন্দী এক যুবক ডাক্তারের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়। তিনিও ছিলেন একজন স্বদেশী। ডাক্তার বন্ধুটির কাছে সবসময় শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের কথা শুনতাম। অনুশীলন সমিতির সভ্য হিসাবে এবং স্বদেশী করার সুবাদে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি আমি আগে থেকেই অনুরক্ত ছিলাম, কিন্তু ডাক্তার বন্ধুটির সান্নিধ্যে তাঁদের প্রতি অনুরাগ আমার বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। তাঁর কাছেই আমি প্রথম জানতে পারি যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী তখনো স্থূলদেহে বর্তমান আছেন এবং তিনি মাঝে মাঝে কলকাতার বাগবাজারে তাঁর বাসভবনে থাকেন। একথা শোনার পর থেকে আমার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান হয় কখন এবং কেমন করে আমি শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন লাভ করব। জেলে যে সামান্য মাসোহারা পেতাম তা আমি একটু একটু করে জমিয়ে রাখতাম মুক্তি পেলে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে যাবার পথ-খরচের জন্য।

১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের মে মাসের এক সুন্দর সকালে খুলনা জেলার দৌলতপুর কারাগার থেকে আমাকে মুক্তি দেওয়া হলো। মুক্তি পেয়েই একবস্ত্রে প্রাণের আবেগে বেরিয়ে পড়লাম শ্রীশ্রীমাকে দর্শনের জন্য।

আমার তখন গন্তব্য বাগবাজারে উদ্বোধন কার্যালয় তথা 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'। অবশেষে সেখানে পৌঁছালাম, কিন্তু মা তখন সেখানে ছিলেন না। তিনি কোথায় রয়েছেন সেকথা কাউকে জিজ্ঞাসা না করেই আমি চলে গেলাম শ্যামবাজারে গৌরী-মার শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমে। আমি তখন ছেলেমানুষ, ভেবেছিলাম মায়ের নামে আশ্রম যখন তখন মাকে নিশ্চয় সেখানে দেখতে পাব। বলা বাহুল্য, মা সেখানে ছিলেন না, তবে সেখানে গৌরী-মার দর্শন পেলাম। গৌরী-মা আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললেন। আমার সব কথা শুনে গৌরী-মা আমাকে বিপ্লবের পথ পরিত্যাগ করতে উপদেশ দিলেন। গৌরী-মাকে প্রণাম করে আমি আবার বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু আমি যে মাকে দর্শন করতে এসেছি এবং মা কোথায় রয়েছেন তা সেখানে কাউকেই, এমনকি গৌরী-মাকেও জিজ্ঞাসা করিনি। ভেবে নিলাম, মা নিশ্চয়ই কামারপুকুরে আছেন। সুতরাং এবার গন্তব্য কামারপুকুর। আমার সম্বল মাসোহারার মাত্র কয়েকটা টাকা। তার কিছুটা ইতিমধ্যেই খরচ হয়ে গেছে। তখন কলকাতা থেকে অনেক হাঙ্গামা করে কামারপুকুর যেতে হতো। কিছুটা ট্রেনে, অনেকটা পায়ে হেঁটে। আমি সমস্ত পথ হেঁটেই চললাম।

জ্যৈষ্ঠ মাস। প্রখর রৌদ্রে কলকাতা থেকে পায়ে হেঁটে চলেছি আমার আরাধ্যা দেবীপ্রতিমার দর্শনে। খিদে পেলে খাই দু-পয়সার মুড়ি-বাতাসা আর রাস্তার ধারে পুকুরের জল। গ্রীষ্মের দাবদাহে দেহ জ্বলেপুড়ে যাচ্ছিল। রাস্তার পাশের পুকুরে ডুব দিয়ে দেহ শীতল করি। ভিজে জামাকাপড় গায়েই শুকিয়ে যায়। তিনদিন পর দুপুরবেলা কামারপুকুর এসে পৌঁছালাম। খুঁজে খুঁজে ঠাকুরের বাড়িতে গিয়ে শিবু-দাদার সঙ্গে দেখা হলো। শিবু-দাদা বললেন ঃ "মা তো এখানে নেই। মা তো কোয়ালপাড়ায়।" হালদারপুকুরে স্নান সেরে শিবু-দাদার কাছে দুটি ডাল-ভাত খেয়ে কোয়ালপাড়া যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। যাবার সময় শিবু-দাদাকে প্রণাম করতে তিনি বললেন ঃ "ঠাকুরের নিজের হাতে লাগানো গাছের এই আমগুলি মাকে দিও।" আমের

পুঁটলিটি নিয়ে কোয়ালপাড়ার পথে বেরিয়ে পড়লাম। যখন কোয়ালপাড়া পৌঁছালাম তখন পড়ন্ত বিকেল। আশ্রম-বাড়ির সামনে গিয়ে যখন দাঁড়ালাম তখন আমার রুক্ষসূক্ষ্ম চেহারা ও মলিন বেশভূষা দেখে কেউ কেউ কিঞ্চিৎ অবাক হলেন বলে মনে হলো। তারপরে যখন জানলেন, আমি সদ্যমুক্ত জেলফেরৎ আসামী তখন তাঁদের মুখে আতঙ্কের ছাপ দেখা গেল। বললেন : "এমনিতেই রোজ পুলিস এখানে এসে খোঁজখবর নেয়। নতুন কাউকে দেখলে নানারকম জেরা করে। তোমাকে দেখলে তো আর কথাই নেই। তোমাকে তো বেঁধে নিয়ে যাবেই, সেইসঙ্গে মাকেও উটকো ঝামেলায় জড়িয়ে দেবে। সুতরাং তুমি এখুনি এখান থেকে চলে যাও।' এইরকম যখন বাক্যালাপ চলছে তখন একটি ছোট ছেলে এসে বলল : "কলকাতা থেকে যে-ছেলেটি এখুনি এসেছে, মা তাকে ভিতরে ডাকছেন।" ঐ একটি বাক্যেই আমার মন-প্রাণ করুণার নির্ঝরিণীধারায় যেন স্নাত হয়ে গেল। দু-ফোঁটা জলও চোখের কোণে জমল—বোধহয় মায়ের উদ্দেশে পাদ্য-অর্ঘ্য হয়েই।

বাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখি মা বারান্দায় বসে আছেন। যেন কতদিনের চেনা, সেভাবে মধুর কণ্ঠে বললেন : "যাও বাবা, হাত-মুখ ধুয়ে নাও। তারপর মুখে কিছু দাও।" শিবু-দাদার দেওয়া আমের পুঁটলিটি মায়ের পায়ের কাছে রাখতে রাখতে বললাম : "এই আমগুলো শিবু-দাদা পাঠিয়েছেন আপনার জন্য।" শিবু-দাদার বাড়িতে দুপুরে খেয়ে এসেছি বললে মা বললেন : "তা হোক, একটু কিছু মুখে দাও।" হাত-মুখ ধুয়ে আসতে মা তাঁর পাশে পাতা আসনে আমাকে বসতে বললেন এবং আমাকে কিছু খাবার দিতে বললেন। খাবার দেখতে সামান্যই—একবাটি মুড়ি, আরেকটা ছোট বাটিতে গোটা চারেক নারকেল নাড়ু। মা বললেন : "শিবুর ওখানে ভাত খেয়েছ। এখন এই খাও বাবা, রাত্রে ভাল করে খাওয়াব।" আহার্য সাধারণ, কিন্তু অসাধারণ তার আস্বাদ। খাওয়া হলে মা বললেন : "রাত্তিরটা কাছেই কষ্ট করে কাটাও। কাল সকালেই স্নান করে তৈরি হয়ে

থেক। আমি ডেকে নেব। এখন তুমি বিশ্রাম কর গিয়ে। বরদা তোমাকে থাকার জায়গা দেখিয়ে দেবে।" মায়ের নির্দেশে একটি ছেলে কাছেই কোলেদের চণ্ডীমণ্ডপে রাত্রে বিশ্রাম করার জন্য আমাকে নিয়ে গেল। ছেলেটির নাম বরদা—পরবর্তী কালে স্বামী ঈশানানন্দ।

পরদিন সকালে স্নানাদি সেরে তৈরি হয়ে রয়েছি। সকাল ছ'টা নাগাদ বরদা এসে আমায় ডাকল। বলল ঃ "মা ডাকছেন।" মাঝ রাস্তায় মায়ের সঙ্গে দেখা। প্রণাম করতে আমাকে ইঙ্গিতে রাস্তাতেই এক আঁটি খড়ের আসন পেতে বসতে বললেন। বসলাম। মা বসলেন আর একটি খড়ের আসনে। মা বললেন ঃ "বাবা, ঠাকুরকে মনে মনে প্রণাম কর।" 'ঠাকুর' বলতে যে শ্রীরামকৃষ্ণকে মা বোঝাচ্ছেন তা আমি বুঝতে পারিনি। ফলে আমি ঠিক করতে পারছিলাম না কাকে প্রণাম করব। তখন আমি মাকেই প্রণাম করলাম এই ভেবে যে, তিনিই আমার ঠাকুর। আমি মুখে কিছু না বললেও মার মুখে দেখলাম মধুর হাসি। তারপর মা আমাকে কৃপা করে মহামন্ত্র দান করলেন। কেমন করে করজপ করতে হবে তা দেখিয়ে তাঁর সামনে আমাকে জপ করতে বললেন। তারপর বললেন ঃ "এখন এখানেই বসে একটু জপ কর।" কিছুক্ষণ পর বললেন ঃ "তুমি বাবা, এখনি এখান থেকে জয়রামবাটী রওনা হয়ে যাও। এখানে পুলিসের খুব উৎপাত। ওরা প্রায় রোজ এসে খোঁজখবর নিয়ে যায়। নতুন কোন ছেলে এলে তাকে জেরা করে, কখনো কখনো থানাতেও নিয়ে যায়। তোমাকে দেখলে ওরা তোমাকে থানায় ধরে নিয়ে যেতে পারে।"

মাকে প্রণাম করে আশ্রমে এলাম, দেখলাম বারান্দায় আমার জন্য আসন পাতা। আসনে বসলাম, একজন মহিলা আমাকে খাবার দিলেন। খাওয়া শুরু করার আগে মা এলেন। এসে এক-টুকরো মিছরি জিভে ঠেকিয়ে প্রসাদ করে আমার হাতে দিলেন। খাওয়ার সময় মা পাশে বসে রইলেন। খাওয়া শেষ হলে মাকে পুনরায় প্রণাম করে রওনা হলাম। মা আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ

করলেন, চিবুকে হাত দিয়ে চুমো খেলেন। রাস্তায় যখন আসছি, পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম মা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। চোখে জল। যতক্ষণ আমাকে দেখা গেল ততক্ষণ আমাকে দেখছেন দেখলাম।

আনন্দে ভরপুর হয়ে আমি পথ চলেছি। জয়রামবাটী, কামারপুকুর দর্শন করে স্থির করলাম, সোজা বেলুড় মঠে যাব। বেলুড় মঠে এসে উপস্থিত হলাম। মঠে তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ছিলেন না। সাধুরা আমাকে মহাপুরুষ মহারাজের কাছে নিয়ে গেলেন। মহাপুরুষ মহারাজকে আমার সবকথা বললাম। মায়ের কৃপা পেয়েছি শুনে এবং মঠে ব্রহ্মচারিরূপে থাকতে চাই জেনে তিনি আমাকে মঠে থাকার অনুমতি দিলেন। কিছুদিন মঠে ছিলামও ব্রহ্মচারী হিসাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ি। মঠে তখন চিকিৎসার সুবিধা ছিল না। মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে বললেন ঃ "তুমি এখন বাড়িতে গিয়ে ভাল করে খাওয়া-দাওয়া কর এবং চিকিৎসা করাও। এখানে তো খাওয়াও নেই, চিকিৎসারও সুবিধা নেই।" বাড়ি ফিরে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলাম ঠিকই, কিন্তু বাড়ির চাপে, বিশেষ করে বৃদ্ধ বাবার চাপে আর বেরিয়ে আসতে পারলাম না। মহাপুরুষ মহারাজকে পরিস্থিতি জানিয়ে চিঠি লিখলাম এবং এমতাবস্থায় তাঁর কি নির্দেশ তা জানতে চাইলাম। উত্তরে মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে লিখলেন ঃ "এটাই মায়ের ইচ্ছে জানবে। তুমি এখন বাড়িতেই থাক। বাবা-মায়ের সেবা কর। সৎ গৃহস্থ হও। সৎ গৃহীরও দরকার আছে, নাহলে ঠাকুরের পরিবার থাকবে কি করে?" মায়ের সঙ্গে পরবর্তী কালে আমার আর দেখা হয়নি, কিন্তু ঐ সামান্য দর্শনের স্মৃতিই আমার জীবনের প্রধান সম্বল।* □

---

* উদ্বোধন, ৯৮তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৌষ ১৪০৩, পৃঃ ৬৭৯-৬৮০। এই স্মৃতিকথাটি লেখকের কন্যা বীণা চৌধুরীর (বনহুগলী, কলকাতা—৭০০ ০৩৫) সৌজন্যে আমরা পেয়েছি। স্বামী ঈশানানন্দের 'মাতৃসান্নিধ্যে' গ্রন্থেও (৫ম সং, ১৯৮৯, পৃঃ ১০৩-১০৪) লেখকের দীক্ষা প্রসঙ্গ বিবৃত হয়েছে।—সম্পাদক

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি

ব্রহ্মগোপাল দত্ত

শ্রীমার সঙ্গে বাগবাজারের দত্ত-পরিবারের সম্বন্ধ ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তাঁর পদধূলিদানে পবিত্র হয়েছিল বাগবাজারের দত্ত-পরিবারের বাসভবন—'লক্ষ্মীনিবাস'—১নং লক্ষ্মীদত্ত লেন। এছাড়া কাশীর 'লক্ষ্মীনিবাস'-এও শ্রীশ্রীমা দীর্ঘ আড়াইমাস বাস করেছিলেন। এই পরিবারে তাঁর মন্ত্রশিষ্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আমার পিতৃদেব কিরণচন্দ্র দত্ত, যিনি একাধারে ছিলেন তাঁর সেবক এবং রসদ্দার। কিরণচন্দ্রের কন্যা শিবরানী ও দুই ভ্রাতুষ্পুত্র সুধাংশুমোহন ও বিভূতিভূষণও শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা পেয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে আমার জ্ঞান প্রধানতঃ শ্রুতিনির্ভর, তবে কিছুটা স্মৃতিনির্ভরও। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে শ্রীশ্রীমা বাগবাজারের 'লক্ষ্মীনিবাস'-এ প্রথম পদার্পণ করেন যতীন্দ্রনাথ মিত্রের বৈষ্ণব-পদাবলী গান শোনার জন্য। শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে ছিলেন গোলাপ-মা, যোগীন-মা এবং কয়েকজন মহিলা-ভক্ত। 'মাথুর' পালা শুনে মা গভীর ভাবসমাধিতে মগ্ন হন। ভাবাবিষ্ট মায়ের নির্দেশে গোলাপ-মা গৃহস্থের কল্যাণ-কামনায় মিলনের গান গেয়ে পালা শেষ করতে বলেন। কীর্তনশেষে দেখা গেল মা ভাবাবেশে সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন হয়ে রয়েছেন। ঐ অবস্থায় মায়ের মুখে একটু মিষ্টান্ন দিয়ে সেই ধ্যানস্থ অবস্থায় কোনরকমে তাঁকে গোলাপ-মা ও যোগীন-মা গাড়িতে তুলে তাঁর তৎকালীন বাসগৃহ ২/১ বাগবাজার স্ট্রীটে নিয়ে যান। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কিরণচন্দ্র ঐ বাড়িতে যান মায়ের খবর নেবার জন্য। যোগীন-মা তাঁকে বলেন : "বৃন্দাবনে মার এই ভাবসমাধি দেখেছিলুম। আজ আবার দেখলুম, আর কখনো দেখিনি।" এই বাড়িতে তাঁর দ্বিতীয়বার শুভাগমন হয় ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে আন্দুলের কালীকীর্তন শোনার জন্য। দোতলার

ঠাকুর ঘরে বসে তিনি সামনের মাঠে আয়োজিত কালীকীর্তন শোনেন। এই পরিবারের ইতিহাসে সবচেয়ে আনন্দের ঘটনা ঘটেছিল তাঁর তৃতীয়বার আগমনে—মঙ্গলবার ২৬ মার্চ, ১৯১২ (১৩ চৈত্র ১৩১৮) তারিখে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা-পূজা উপলক্ষে। ঐদিন দোতলার ঠাকুরঘরে তিনি স্বয়ং শ্রীহস্তে ঠাকুরের ছবি পূজা করে অন্নভোগ নিবেদন করেন এবং বলেন : "ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করে দেখি তিনি গ্রহণ করেছেন।" এইভাবে তিনি আপন 'অন্নপূর্ণা-স্বরূপ' প্রকাশ করে এই ভক্ত কায়স্থ-পরিবারকে দিয়ে গেলেন ঠাকুরকে অন্নভোগ প্রদানের অধিকার। তাঁর নির্দেশে ও অশেষ আশীর্বাদে এই পূজা আজও দত্ত-পরিবারে চলছে। এইসমস্ত কথা আমার পিতৃদেবের ডায়েরীতে লিখিত রয়েছে।

আমেরিকার হলিউড কেন্দ্রের প্রয়াত অধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দ মহারাজ একটি চিঠিতে আমাকে লিখেছিলেন : "শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে একটি কথা জানাই। পূজনীয় হরি মহারাজের কাজে শুনেছি, শ্রীশ্রীমা সর্বদা সমাধিস্থ অবস্থায় থাকতেন অথচ বাহ্যিক সব কাজকর্ম করতেন। তাঁর মন বিশুদ্ধচক্রের নিচে নামত না। ইহাই বিশেষ আশ্চর্য!"

একদিন শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজ এসেছেন বাগবাজারে 'মায়ের বাড়ী'তে (উদ্বোধনে)। সঙ্গে আছেন শ্রীশ্রীমহারাজের সেবক স্বামী বরদানন্দ। 'মায়ের বাড়ী'র দরজায় ঢুকবার আগে বাবুরাম মহারাজ চৌকাঠে মাথা রেখে প্রণাম করলেন এবং বরদানন্দ স্বামীকেও ঐভাবে প্রণাম করতে বললেন। বরদানন্দ স্বামী ইতস্ততঃ করছেন দেখে বাবুরাম মহারাজ বললেন : "ওরে ব্যাটা, জানিস ওপরে কে আছেন? এবার দুখানা হাত আর মুণ্ডমালাটি রেখে এসেছেন তাই চিনতে পারছিস না!"

বাল্যকালে পিতৃদেব ও গর্ভধারিণীর সঙ্গে 'মায়ের বাড়ী' গিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন ও চরণস্পর্শ লাভের সৌভাগ্য দু-তিনবার আমার হয়েছিল। মনে আছে একবার 'মায়ের বাড়ী'তে বর্তমানের পাথরের

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠেই ডানদিকের ঘরে গর্ভধারিণীর পাশে বসে অন্যান্য ভক্ত মহিলাদের সঙ্গে প্রসাদ গ্রহণ করছি। খাওয়া শেষ হয়ে আসছে, হঠাৎ শ্রীশ্রীমা একটি ছোট রেকাবিতে সন্দেশ নিয়ে ঐ ঘরে প্রবেশ করলেন এবং নিজহাতে সকলের পাতে সন্দেশ বিতরণ করে সবাইকে ধন্য করলেন।

স্বামী অপূর্বানন্দের কাছে শুনেছি, কাশীর 'লক্ষ্মীনিবাস'-এ যখন শ্রীশ্রীমা ছিলেন সেইসময় একদিন সকালবেলা নিজের একখানি ফটো হাতে নিয়ে দোতলা থেকে নিচে নামলেন। তারপর বাগান থেকে কিছু ফুল তুলে আঁচলে বাঁধলেন। 'লক্ষ্মীনিবাস' থেকে অদ্বৈত আশ্রমে গিয়ে নিজের ফটোখানি মন্দিরের বেদিতে ঠাকুরের ফটোর পাশে রেখে উভয় ফটোতেই ফুল দিয়ে প্রণাম করলেন। তারপর মহাপুরুষ মহারাজকে ডেকে বললেন : "[নিজের ফটোটি দেখিয়ে] এই ছবিতেও রোজ দুটো করে ফুল দিও।" পরবর্তী কালে মহাপুরুষ মহারাজের অন্যতম সেবক স্বামী অপূর্বানন্দ এই ঘটনাটি শুনেছিলেন মহাপুরুষ মহারাজের কাছেই।

৪ঠা শ্রাবণ ১৩২৭ বঙ্গাব্দে (২১ জুলাই ১৯২০ খ্রীস্টাব্দ) রাত্রি দেড়টার সময় শ্রীশ্রীমা ধরাধাম ত্যাগ করে চলে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই কৃষ্ণলাল মহারাজ (স্বামী ধীরানন্দ) পিতৃদেব কিরণচন্দ্রকে এই খবর দিতে এলেন 'লক্ষ্মীনিবাস'-এ। তখন কিরণচন্দ্র অত্যন্ত অসুস্থ এবং সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হরিপদ দত্তের কাছে কিরণচন্দ্রের এই অবস্থার কথা শুনে কৃষ্ণলাল মহারাজ কাউকে কিছু না বলে চলে গেলেন। পরদিন সকালে আবার এসে তিনি কিরণচন্দ্রকে ঐ মর্মান্তিক দুঃসংবাদ জানান। সঙ্গে সঙ্গে সারা দত্ত পরিবারে নেমে এল গভীর শোকের ছায়া। মায়ের ঔর্ধ্বদৈহিক কাজের জন্য চন্দনকাঠ ও ঘি কিনতে কিরণচন্দ্র কৃষ্ণলাল মহারাজের হাতে প্রয়োজনীয় অর্থ দিলেন। কৃষ্ণলাল মহারাজ চলে গেলেন।

কিরণচন্দ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বললেন : "বাড়ির প্রত্যেকে গিয়ে

শ্রীশ্রীমাকে শেষপ্রণাম জানিয়ে আসবে, আর বাড়ির সকলে তিনদিন অশৌচ পালন করবে।" কিরণচন্দ্রের নির্দেশে দত্তবাড়ির আবালবৃদ্ধবনিতা শ্রীশ্রীমাকে শেষ প্রণাম করতে গেল। আমার বয়স তখন প্রায় দশ বছর। আমিও বাড়ির অন্যান্যদের সঙ্গে মাকে প্রণাম জানাতে গিয়েছিলাম। 'মায়ের বাড়ী'তে গিয়ে দেখলাম, ঠাকুরঘরের (ওটি ছিল মায়েরও শয়নগৃহ) মাঝখানে শ্রীশ্রীমায়ের ভাগবতী তনু শায়িত। মাথাটি পূর্বে সিংহাসনের দিকে। কয়েকদিন আগে অসুস্থ অবস্থায় যখন মাকে মেঝেতে শোয়ানো হয়, তখন ঠাকুরের ছবি সিংহাসন-সহ তিনতলায় স্থানান্তরিত করা হয়। মায়ের বিছানার সামনে একটি জবাফুলের ঝুড়ি নিয়ে কৃষ্ণলাল মহারাজ দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি প্রত্যেকের হাতে একটি করে জবাফুল দিচ্ছেন এবং প্রত্যেকে সারিবদ্ধভাবে সেই ফুল শ্রীশ্রীমায়ের চরণে দিয়ে প্রণাম করে চলে যাচ্ছেন। আমরাও সকলে তাই করলাম।

পিতৃদেবের নির্দেশমতো আমরা বাড়িসুদ্ধ সকলে তিনদিন অশৌচ পালন করেছিলাম। পরদিন যথারীতি স্কুলে গেছি—খালি পা। তৈলবিহীন শুষ্ক মাথা। মাস্টার মশায়রা জিজ্ঞেস করায় বলেছি : "শ্রীশ্রীমা দেহ রেখেছেন, তাই আমাদের অশৌচ।" মাস্টার মশায়দের ঘরে আলোচনা কানে এল : "শুনেছেন মশাই, রামকেষ্ট পরমহংসের স্ত্রী মারা গেছে—দত্তবাড়ির অশৌচ!" তাঁদের এই বিদ্রূপপূর্ণ মন্তব্য আমাকে খুব কষ্ট দিয়েছিল। □

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকণা

স্বর্ণকুমারী দেবী

আমার স্বামীর নাম উপেন্দ্রচন্দ্র রায়। আমাদের আদি নিবাস পূর্ববঙ্গে।[1] আমরা তখন রাঁচীতে থাকি। সেখানে বেশ কয়েকজন বাঙালীকে চিনতাম যাঁরা ছিলেন বেলুড় মঠের ভক্ত। তাঁদের কাছে শ্রীশ্রীমায়ের কথা শুনি। সেই যোগাযোগের সূত্রে বাগবাজারে 'মায়ের বাড়ী'তে আমি এবং আমার স্বামী এসে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করি এবং দীক্ষা প্রার্থনা করি। শ্রীশ্রীমা কৃপা করে আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলেন। বাগবাজারে 'মায়ের বাড়ী'তেই আমাদের দীক্ষা হয়েছিল। দীক্ষার সাল-তারিখ ঠিক মনে নেই। মনে হয় ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে আমাদের দীক্ষা হয়েছিল।

মায়ের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলার বিশেষ সুবিধা হয়নি, দীক্ষার সময়েই মায়ের সঙ্গে যতটুকু কথা হয়েছিল। তবে একদিনের কথা মনে পড়ে। 'মায়ের বাড়ী'তে মাকে দর্শন করতে গিয়েছি। মায়ের ঘরে মেয়েরা অনেকে বসেছিলেন। আমি মাকে প্রণাম করে একপাশে গিয়ে বসলাম। আমার তখন বয়স অল্প এবং তখনকার দিনের গৃহবধূ। স্বভাবতই আমি সেখানে কোন কথা বলছিলাম না, শুধু মার কথা শুনছিলাম। মা কি বলছিলেন তা মনে নেই, শুধু মনে আছে মার গলার স্বর ছিল খুব মিষ্টি এবং কথা বলছিলেন আস্তে আস্তে, মৃদু কণ্ঠে। মায়ের মাথায় ছিল খুব সুন্দর একরাশ রেশমের মতো কাল চুল। আমি বারবার মায়ের সেই সুন্দর চুলের

---

১ স্বর্ণকুমারী দেবীর পুত্র সারদারঞ্জন রায় (বর্তমান ঠিকানা : লিচুবাগান, ডানকুনি, জেলা—হুগলী) আমাদের জানিয়েছেন যে, ওঁদের আদি নিবাস বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার শ্যাম গ্রামে। তখন শ্যাম গ্রাম ত্রিপুরা জেলার অধীনে ছিল।—সম্পাদক

দিকে তাকাচ্ছিলাম। খুব ইচ্ছে করছিল—মায়ের চুলে যদি একটু হাত দিতে পারতাম! জানতাম, তা অসম্ভব। আমার অত সাহস ছিল না যে মার কাছে আমার মনের ইচ্ছে প্রকাশ করব। কিন্তু কী আশ্চর্য! আমার যখন মনে এই চিন্তা চলছে, তখন হঠাৎ মা আমার দিকে চেয়ে আমাকে কাছে ডাকলেন। আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছি। যাই হোক, মার কাছে যেতে মা পরম স্নেহে বললেন : "মাথাটা চুলকোচ্ছে, মাথায় একটু হাতবুলিয়ে দাও তো মা।" আমি তো হতভম্ব। সামলে নিয়ে মায়ের চুলে হাত দিলাম। বুঝলাম, মা জগজ্জননী—অন্তর্যামিনী। সকলের মনের কথা মা জানতে পারেন।

আরেকটা কথা বলি। আমার স্বামী তখন অন্তিম শয্যায়। হঠাৎ বললেন : "ঠাকুর আমায় নিতে এসেছেন, তোমরা কেঁদো না। আমি যাচ্ছি।" বলতে বলতেই চোখ বুজলেন। তারিখটি ছিল ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের ১লা জুলাই। পরবর্তী কালে শুনেছিলাম, ঠাকুর মাকে বলেছিলেন : "তুমি যাদের আশ্রয় দেবে অন্তিমকালে তাদের আমি নিজে এসে নিয়ে যাব।" আমার স্বামীর ক্ষেত্রে দেখলাম ঠাকুরের অঙ্গীকার তিনি রক্ষা করেছেন।

দীক্ষার কয়েক বছর পর আমার পুত্রের জন্ম হয়। আমরা তার নাম রেখেছিলাম 'সারদা'।* □

---

* লেখিকার স্মৃতিকথাটি আমরা পেয়েছি তাঁর পুত্র সারদারঞ্জন রায়ের সৌজন্যে। তিনি তাঁর বাবা উপেন্দ্রচন্দ্র রায়কে লেখা শ্রীশ্রীমায়ের ৭টি চিঠি আমাদের দিয়েছেন। পাঁচটি চিঠি রাঁচীতে লেখা, দুটি পাটনায়। চিঠিগুলি বর্তমান গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।—সম্পাদক

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকণিকা

মঞ্জুলালী মিত্র

মঞ্জুলালী মিত্র বলরাম বসুর পৌত্রী—রামকৃষ্ণ বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যা। তাঁর স্বামীর নাম রবীন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র। তিনি এবং তাঁর স্বামী দুজনেই ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য। তাঁর এই স্মৃতিকণিকাটি আমরা পেয়েছি তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা তপজা হালদারের (নীলমণি মিত্র স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬) সৌজন্যে।—**সম্পাদক**

জ্ঞান হবার পর থেকেই শ্রীশ্রীমাকে দেখেছি। শ্রীশ্রীমা ছিলেন আমাদের পরিবারের মধ্যমণি। কত কোলে-পিঠে উঠেছি মায়ের, কত স্নেহ-ভালবাসা পেয়েছি! সেসব কথা ভাবলে চোখ জলে ভরে আসে। তখন তো মায়ের মহিমার কথা ভাবিনি—ভাবার কথা মনেই হয়নি। বুঝিওনি কিছুই। এখনো কী-ই বা বুঝি! তিনি ছিলেন আমার নিজের মায়ের চেয়েও বেশি আপন। আজ ভাবি, কত জন্মের সুকৃতিতে তাঁর চরণাশ্রয় পেয়েছি! এখন আফসোস হয়, কেন আরও বেশি করে তাঁর সঙ্গলাভ করিনি!

আমার মা (সুশীলাবালা বসু) বলতেন : "মায়ের চুল আঁচড়ে দে। সাবধান, একটা চুলও ফেলবি না কিন্তু! যত্ন করে রেখে দিবি।" মা শ্রীশ্রীমায়ের চুল সিন্দুকের মধ্যে যত্ন করে রেখে দিতেন। শ্রীশ্রীমায়ের খাওয়া হয়ে গেলে পাতে যা পড়ে থাকত সেগুলি মহাপ্রসাদ-জ্ঞানে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে মা নিজে গ্রহণ করতেন এবং আমাদের সকলকে দিতেন। থালার নিচে মেঝেতে বা পাশে কিছু পড়ে থাকলে মা অত্যন্ত যত্ন করে সেগুলি তুলে নিয়ে মুখে দিতেন। আমাদের শেখাতেন : "খুঁটে খুঁটে তুলে রাখ। মহাপ্রসাদ!"

অষ্টম পর্ব

"তোমার লিখিবার শক্তি আছে। কিন্তু কোন্ বিষয়ে কিরূপে লিখিলে লোকে ঠিক ঠিক [শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষত্ব, বক্তব্য, আচরণ এবং বাণীর তাৎপর্য] বুঝিতে পারিবে এবং কোন্ ঘটনার কতদূর প্রকাশ করা কর্তব্য—এই সকল বিষয়ে শিক্ষা করিতে হইবে। লেখনী অনেকস্থলে সংযত রাখিতে হয়।" —স্বামী সারদানন্দ

"শ্রীশ্রীমায়ের কথা যদি উদ্ধৃত কর, তবে খুব হিসাব করে করবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা উল্লেখ করতে পার, কিন্তু তাও খুব সতর্কতার সঙ্গে করবে।" —স্বামী সারদানন্দ

পাঁচ ফুলের সাজি

(নির্বাচিত কথাবশেষ)

সঙ্কলক

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ছোট-বড় সকল ভক্তদের উদ্দেশ করে বলতেন : "আমার পাঁচ ফুলের সাজি।" সকলকে নিয়েই তাঁর "প্রেমের বাজারে আনন্দমেলা"। বহু বছর পূর্বে আমি যখন শ্রীশ্রীমায়ের জীবনীর উপাদান সংগ্রহ করছিলাম তখন তাঁর পদাশ্রিত বহু ভক্ত তাঁদের অনেক কথা আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন। মায়ের জীবনী প্রকাশিত হওয়ার পর দেখা গেল শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে সংগৃহীত অনেক কথা—শ্রীমুখের উক্তি কিংবা অবস্থাবিশেষে আচরণের বিবৃতি—আমার কাছে তখনো রয়ে গিয়েছে যেগুলি মূল জীবনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কয়েক বছর আগে (১৩৯৪ সাল) 'পাঁচ ফুলে সাজি' শিরোনামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকায় পূর্বোক্ত কথাবশেষ-সমূহ সঙ্কলন করি। আমার আগ্রহে স্নেহভাজন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ঐ পুস্তিকা থেকে নির্বাচন করে এই সঙ্কলনটি প্রস্তুত করেছে। এই সঙ্কলনটি মৎপ্রণীত শ্রীশ্রীমায়ের মূল জীবনীর পরিপূরকরূপে গৃহীত হতে পারে। আমার বিশ্বাস, এই কথাবশেষ-সঙ্কলন ভক্তজনের মননের সহায়ক হবে।

এক

॥১॥

স্বামী কেশবানন্দ

১৩১৩ সালের বর্ষারম্ভে স্বামী নির্মলানন্দ ও ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল এদিকে শুভাগমন ও কোয়ালপাড়ায় এ-দাসের বাড়িতে পদার্পণ

করেন। বলেছিলেন ঃ "জয়রামবাটীতে মা আছেন, সেখানে যাব।" প্রাতঃকালে স্নান করে কৃষ্ণ-নামক ভক্তটিকে সঙ্গে নিয়ে জয়রামবাটী রওনা হলাম। শ্রীশ্রীমা দক্ষিণদ্বারী গৃহের ভিতর দিকে দরজায় বাঁহাত রেখে দাঁড়িয়ে ছিলেন, আমার দিকে দৃষ্টি পড়ামাত্র বলে উঠলেন ঃ "দীনু-দাদা"! কালী-মামা বললেন ঃ "না, তাঁর ছেলে।" মা বললেন ঃ "ওমা, দীনু-দাদার ছেলে এত বড় হয়েছে! আমি তাঁকে ঠিক এমনটি দেখেছিলুম।" তারপর কথায় কথায় বললেন ঃ "তোমার বাপ আমাদের এখানে দশ-বার বছর পাঠশালা করেছিলেন। কালী, বরদা, অভয়কে পড়াতেন; আমাদের এখানে খেতেন, থাকতেন। ঠাকুর এলে তাঁকে সবাই পাগল বললেও তোমার বাবা তাঁকে ভক্তি করতেন, ফাইফরমাস খাটতেন। তোমার মতো বয়স পর্যন্ত এখানে ছিলেন। তাঁর মতো তোমার গঠন বলে তোমাকে দেখে তাঁকে মনে পড়ে গেছল। তোমার বাপকে দাদা বলতুম, আমি তোমার পিসি হই।"—"না মা, আমি পিসি-টিসি শুকনো নাম ভালবাসি না, আমি 'মা' বলে ডাকব।"—"তা-ই হবে। তোমার বাপ ঠাকুরের সেবা করেছিলেন বলেই সেই পুণ্যে তোমার ধর্মে মতি হয়েছে।... আমার কাছে ঠাকুরের ছবি আছে, তোমাকে দিচ্ছি।" একটি বড় সিন্দুকের ভিতর থেকে পাতলা কাগজে ঢাকা, কাপড় দিয়ে জড়ানো, অতি যত্নে রক্ষিত ঠাকুরের একখানি ফটো মা বের করলেন। ফটোটি আমার হাতে দিয়ে বললেন ঃ "এইটি বাঁধিয়ে এর নিত্যপূজা করবে।... আমার কাছে নরেনের ছবি একটি আছে, তা তোমাকে দিচ্ছি।" সেই সিন্দুক থেকে পূর্বের মতো কাগজ ও কাপড়ে মোড়া স্বামীজীর একটি ফটো মা বের করে দিলেন। মা আমাদের কাছে বসে কত কথাই বললেন—"ঠাকুর বলতেন, লণ্ঠনের নিচেটা অন্ধকার। কত দেশদেশান্তরের লোক ঠাকুরের কথা জানলে, কিন্তু এদেশের লোক কেউ জানলে না। তোমার মাধ্যমে এদেশের অনেকেই ঠাকুরের কথা জানবে।"

॥২॥

স্বামী কৈবল্যানন্দ

জয়রামবাটীতে এক বৃদ্ধ, বোধ হয় নিম্নজাতীয়, কুমড়োপাতা হাতে নিয়ে সন্তর্পণে এসে উপস্থিত। তাকে দেখেই মা "এস, এস" বলে দু-পা পিছিয়ে গেলেন। যেখানে মা দাঁড়িয়েছিলেন, সেখানকার ধুলা পাতায় তুলে খানিকটা মাথায়, মুখে, বুকে দিয়ে সে চলে গেল। মা বললেন ঃ "ও এমন [প্রতি]দিন এসে নিয়ে যায়।"

॥৩॥

স্বামী গিরিজানন্দ

ঠাকুরের পূজান্তে মা আমাদের তিনজনের[১] হাতে গৈরিক বহির্বাস ও কৌপীন দিলেন এবং ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করলেন ঃ "ঠাকুর, এদের সন্ন্যাস রক্ষা কোরো। পাহাড়ে-পর্বতে, বনে-জঙ্গলে যেখানে থাকুক না কেন, এদের দুটি খেতে দিও।" আমাদের বললেন ঃ "শ্রাদ্ধাদি কর্মে তোমাদের আর কোন অধিকার রইল না। এখন থেকে সকলের অন্ন খেতে পারবে। যদি কোন বাগ্দীরও মেয়ে এসে ভিক্ষা দেয়, মা-অন্নপূর্ণা দিচ্ছেন মনে করে খাবে।"

॥৪॥

স্বামী তন্ময়ানন্দ

সন্ন্যাসগ্রহণ-মানসে আমি জয়রামবাটী যাই। মা বললেন ঃ "কাল এস সকালে। কাপড়-কৌপীন গেরুয়াতে ছুবিয়ে, মাথা মুড়িয়ে আসবে।

১ স্বামী গিরিজানন্দ, স্বামী বিশুদ্ধানন্দ এবং স্বামী শান্তানন্দ।—সম্পাদক

চৈতন [শিখা] রাখবার দরকার নেই, সমস্ত মুড়াবে।”... [পরদিন সন্ন্যাসদানের সময়] আমার হাতে জল দিয়ে আচমন করতে বলে তিনি মন্ত্র বলতে লাগলেন। তারপরে আমার মাথার ঠিক ব্রহ্মরন্ধ্রে কিছু লিখলেন এবং ফুল দিয়ে ঐস্থান পূজা করতে করতে জলের ছিটে দিতে লাগলেন। [গেরুয়া] কাপড় আমার হাতে দিয়ে বললেন ঃ “মাথায় করে নিয়ে বাইরে যেয়ে পরে এস।”

॥৫॥

স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ

মার সঙ্গে আমার এরূপ কথাবার্তা হয় ঃ “এত জপতপ করি, আমি কেন কিছুই বুঝতে পারছি না? আপনি ধ্যান করে দেখুন কেন হয় না।”—“দেখ, আমার শরীরটা বড় খারাপ।”—“তা হবে না, আপনাকে দেখতেই হবে।”—“আচ্ছা।” পরে একদিন মা বললেন ঃ “আমি তো কয়দিনই দেখলুম, তোমার তো খুব উচ্চ অবস্থা। জগদম্বা তোমাকে কোলে করে বসে আছেন।”—“আমি কিছু বুঝতে পারছি না কেন?”—“তাহলে বোধহয় কিছু কর্ম বাকি আছে।”

॥৬॥

স্বামী সৎসঙ্গানন্দ

গোপেশ ও বিনোদ নবাসন থেকে দুধ নিয়ে আসে। সেই দুধে ভাত দেখা গেল—কী হবে? মা একটু পরে বললেন ঃ “ক্ষীর অশুদ্ধ হয় না। তাছাড়া, জিনিস মূল্য দিয়ে কিনলে শুদ্ধ হয়ে যায়।”

জগদ্ধাত্রীপূজার সময় [একজন] পাতা বিক্রি করতে এসেছে। মা কিছু পাতা দরদস্তুর করে কিনে বললেন ঃ “ফাউ দেবে না?” তারপর লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ “থাক, দরকার নাই।”

॥৭॥

স্বামী মহাদেবানন্দ

কয়েকবার দেখেছি, ঠাকুরকে [সিংহাসন থেকে] নিচে নামিয়ে পূজা করে চুমু খেয়ে মা ওপরে উঠিয়ে রাখছেন।

॥৮॥

অমূল্য ঘোষ

১৩১৩ সালের চৈত্র মাস। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর আমি, বশী সেন, জ্যোতিশচন্দ্র বাঁড়ুজ্যে ও হারাধন ঘোষ বিষ্ণুপুর থেকে পদব্রজে জয়রামবাটী রওনা হই। রাজগাঁ থেকে গরুর গাড়িতে দুপুরবেলা কোতুলপুর আসি। সেখান থেকে ভুল পথে চলে অনেক হাঁটাহাঁটির পর যখন আমোদর-তীরে পৌঁছালাম, তখন বেশ রাত হয়েছে—ঝোপ ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না। এমন সময় একটি লোক আলো নিয়ে আসছে দেখে তাকে জয়রামবাটীর রাস্তা জিজ্ঞাসা করলাম। সে বলল ঃ "সারদার ঘরে যাবে? সারদাই আমাকে পাঠিয়েছে, চল। বললে, 'চারটি ছেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদিকে [তাদেরকে] আলো দেখিয়ে নিয়ে এস'।" আগে খবর দেওয়া ছিল না, মা সকল কথা শুনে বললেন ঃ "দুপুরে তোমরা আসবে মনে করেছিলুম, আসতে পারনি। এখানে আসতে গেলে ঘুরতে হয়।" আমরা দুদিন মার কাছে ছিলাম। 'বাড়িতে শীঘ্র ফিরতে হবে, বারুণীস্নানে যাচ্ছি বলে চলে এসেছি'—একথা শুনে মা বললেন ঃ "আমি তো বারুণীই বটে!"

॥৯॥

আহ্লাদিনী ঘোষ (গয়লা-বউ)

সে-বছর শুখা হয়েছে, মাঠের ধান শুকিয়ে যাচ্ছে। মা স্নান করে সিংহবাহিনীকে প্রণাম করে বললেন : "জল না হলে ছেলেপুলে সব খেতে পাবে না, আমি কি করে দেখব মা? ছেলেপুলেরা এসে বলবে, 'পিসিমা, খেতে পাইনি!' " মা ঘরে ফিরে ঠাকুরপূজা করতে বসেছেন মাত্র, অমনি আকাশ গুড়গুড় শব্দে ডেকে উঠল। এত জল হলো যে, মাঠ ভেসে গেল!

॥১০॥

ইন্দুমতী দেবী (শ্রীশ্রীমায়ের ভ্রাতৃবধূ)

মাকে ঠাকুর বলেছিলেন : "তোমার দক্ষিণদুয়ারী ঘরখানি রেখ। তা না হলে লোকে বলবে, রামলালের খুড়ী এসেছে কাপড় বগলে করে। রামলালের যদি কোঠাবাড়ি হয় তাতেও তোমার স্বার্থ নাই।" মা বলতেন : "ঠাকুরের কথাতে রামলালের কোঠাবাড়িই হলো!"

কলকাতায় [বাগবাজারে] মা জিজ্ঞাসা করলেন : "কি গগনের মা [জয়রামবাটীর জনৈক মহিলা। কলকাতা দেখতে এসেছিলেন।], মঠে যে গেলে, কিসব দেখে এলে গো?" সে বলল : "মাগো! মঠে কি ভাল ভাল গরু গো মা!"—"আর কিছু দেখলে না গগনের মা, কেবল গরুই দেখে এলে?"

একটি একটি ভাল কাঁসার গেলাস গঙ্গায় হারিয়ে যাওয়ায় নলিনী খুব গালিগালাজ করতে থাকে। মা বললেন : "নলিনী, গাল দিসনি। গঙ্গায় যদি কোন জিনিস হারায় তার জন্যে মনস্তাপ করতে নেই; আর বামুনে যদি কোন জিনিস নেয়, তার জন্যেও মনস্তাপ করতে নেই। যার গঙ্গায় কোন জিনিস হারায় তার সেই জিনিস তোলা

থাকে; বামুনে যার কোন জিনিস নেয় তার সেই জিনিস রাশি রাশি হয়।"

বাইরের লোক যদি এসে বলত—আমার এই অসুখ করেছে কিংবা অমুকের অসুখ হয়েছে, তাহলে মা বিরক্ত হতেন। বলতেন ঃ "অসুখের খবর কেন আমাকে দাও? অসুখের কথা শুনতে নাই।" আরও বলতেন ঃ "অসুখ হলে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, 'কেমন আছ?'—তাহলে বলতে হয়, 'অমনি আছি যাহোক'।"

॥১১॥

উপেন্দ্রনাথ সরকার

একবার একখানি নতুন কাপড় ও সিল্কের রুমাল সঙ্গে নিয়ে জয়রামবাটী যাই। মা স্নানান্তে সেই কাপড় পরলেন ও রুমালে পা রেখে বসলেন। আমি ফুল, চন্দন, তুলসী, বেলপাতা সমস্ত দিয়ে [তাঁর] পাদপদ্ম পূজা করলাম। তারপর এক অধ্যায় চণ্ডীপাঠ করে চণ্ডীখানাও পাদপদ্মে স্পর্শ করালাম এবং মার পায়ের ওপর মাথা রেখে প্রণাম করলাম।

॥১২॥

উমেশচন্দ্র দত্ত

জয়রামবাটীতে বেলা প্রায় দুটোর সময় মায়ের বাড়ির ভিতর গিয়ে দেখি, মা রাধুর ছেলেকে পায়ের ওপর রেখে বসে আছেন। খানিক পরে তিনি ছেলেটির ছোট ছোট কাঁথাগুলি রৌদ্রে দিতে গেলেন এবং ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লেন। আমি তাঁকে পাখা দিয়ে একটু বাতাস করলাম। কাঁথাগুলি উলটে দেওয়ার সময় হয়েছে মনে

করে উলটে দিতে গেলাম এবং শুকনোগুলি এনে মার পাশে রাখতে লাগলাম। মা যেন প্রসন্ন হয়ে বললেন : "লক্ষ্মী, লক্ষ্মী, লক্ষ্মী!"

মায়ের মুখে শুনেছি : "কেদার এখন মহারাজ হয়েছে, ধরাকে সরা মনে করে। আগে ছিল পাঠশালার গুরুমশাই, এখন মা-বেটায় চেয়ারে বসে পরামর্শ করে। একটু অহঙ্কার হয়েছে। ছেলেরা সমস্ত ছেড়ে ঠাকুরের নাম নিয়ে বেরিয়েছে, একটুকু ভাল খাবার না পেলে কী নিয়ে থাকে?"

"ঠাকুরের ভক্তদের মধ্যে মাস্টার মশাই এদিক-ওদিক দুদিকেই উন্নত। এমনটি আর নাই।"

॥১৩॥

কুসুমকুমারী দেবী

রান্নার জিনিস—তেল, ঘি, আটা ইত্যাদি হয়তো ভাঁড়ারে নেই, সেকথা মাকে জানাতেই মা বললেন : "ভাল করে দেখগে না, আছে।" ফিরে গিয়ে ঠিক সেদিনকার উপযোগী জিনিস পেলাম। চাল এ-বেলা দশ সের ('কাঁচী'), ও-বেলা দশ সের রান্না হতো। কোনদিন মাপতে গিয়ে হয়তো দেখলাম, সেদিনকার পুরো চাল নেই। পরদিন চাল তৈরি হবে। মা বললেন : "আর একবার মেপে দেখ দিকি।" আবার মেপে দেখা গেল, চাল পুরোই আছে। মা বললেন : "তুমি আগে মাপতে ভুল করেছিলে।"

॥১৪॥

কৃষ্ণধন চ্যাটার্জী

জয়রামবাটীতে কয়েকজনের দীক্ষা হয়ে যাওয়ার পরে সকলের শেষে আমার দীক্ষা হলো। মায়ের পাদপদ্ম পূজা করতে গিয়ে দেখি,

পুষ্পপাত্রে একটি ফুলও অবশিষ্ট নেই। মা বললেন : "ভাবছ কেন বাবা, গঙ্গাজলে কি গঙ্গাপুজো হয় না?" আমি নির্মাল্য পুষ্প তাঁর পায়ে দিয়ে প্রণাম করলাম।

॥১৫॥

কৃষ্ণময়ী দেবী [রামলাল-দার কন্যা]

"পরমহংসদেব কবে সিদ্ধ হলেন?"—কামারপুকুরে একটি মেয়ে প্রশ্ন করল। মা বললেন : "সিদ্ধই তো দেখে আসছি, আলো [আতপ চাল] তো কই দেখিনি!"

॥১৬॥

গৌরীকান্ত বিশ্বাস

জয়রামবাটী থেকে রওনা হব। চারু-দাদা ও যতীন-দাদা সন্ন্যাস-গ্রহণের কথা মাকে নিবেদন করলেন। তাঁরা পীড়াপীড়ি করায় শেষে মা বললেন : "আচ্ছা যাও, হয়ে যাবে।" এই কথা শুনে আমি বললাম : "মা, আমাকে আর কতদিন সংসারে থাকতে হবে?" তাতে মা "ছেলে মানু-উষ!" এমনভাবে বললেন যে, আমার আর কথা বলার সাহস হলো না।

॥১৭॥

নন্দরানী দত্ত

জগদম্বা-আশ্রমে একদিন বেলা প্রায় চারটের সময় মা পা ঝাড়ছেন দেখে জিজ্ঞাসা করলাম : "মা, আপনার পায়ে কি কাঁটা ফুটল?"

"না বউমা, কাঁটা নয়"—মা বললেন। "তবে কেন পা ঝাড়ছিলেন?"—সন্ধ্যার পর পুনরায় ঐ প্রশ্ন করায় মা বললেন : "এক যোগিনী দু-তিন দিন [ধরে] আমাকে জ্বালাতন করছে। আমি 'যা পালা, যা পালা' বলতেই সে পালিয়ে গেল। তার কর্মফল শেষ হলো। নির্জনে পেয়ে আমাকে ধরেছিল, জগদম্বার ইচ্ছায় যাহোক একরকম হয়ে গেল।"

মা কোয়ালপাড়ায় আছেন। বেলা দুটোর পর পশ্চিমদিকে এক প্রচণ্ড মেঘ উঠল এবং জলঝড় ও শিলাবৃষ্টি হলো। জল থামতে এক চাষী মাঠে যাচ্ছিল। মা জিজ্ঞাসা করলেন : "বাবা, কেমন জল হলো?" "কই মা, জল কই?"—সে বলল। মা বললেন : "মানুষকে যতই দাও না, অভাব পূরণ করা যায় না।"

মাকে একদিন বিকালে বললাম : "মা, আপনার পায়ে খুব নখ হয়েছে, কেটে দিই।" নখগুলি কেটে কুড়িয়ে কাগজে মুড়ে রাখলাম। "ওগুলি কী হবে মা, ফেলে দাও।"—মা বললেন। আমি ফেলে না দিয়ে তুলে রাখলাম। "আর আমার কিছু রইল না।"—এই বলে মা এক অপূর্ব স্মিতহাস্য করলেন।

॥১৮॥

ডাঃ নলিনবিহারী সরকার

মার খুব ম্যালেরিয়া জ্বর। সন্ধ্যার সময় মাকে ওষুধ খাইয়ে দাঁড়িয়ে আছি, মা বললেন : "বাবা, পা-দুটো বড় কনকন করছে, একবার হাত বুলিয়ে দাও তো।" কিছুক্ষণ পরে বললেন : "মাথাটা বড় টিপটিপ করছে।" আমি তাঁর মাথার দিকে গিয়ে তাঁর মাথায় হাত দেওয়ার উপক্রম করতেই বললেন : "কিরে বাবা! আমার পায়ের ধুলো নিয়ে আমারই মাথায় নাকি?" আমি চমকে উঠে তাঁর পায়ে বুলানো হাত নিজের মাথায় বুলিয়ে, পরে মায়ের মাথায় দিলাম।

॥১৯॥

নারায়ণ রুদ্র

জয়রামবাটী থেকে মাতৃদর্শন করে আমি, অতুলকৃষ্ণ দাস ও শশিভূষণ দাস হেঁটে তারকেশ্বর আসছি। জাহানাবাদ হোটেলে দুপুরে আহার করে পুনরায় রওনা হলাম। দামোদর পার হয়ে বেনাবনের মধ্যে পড়লাম। পথ দেখতে পাই না, রাত্রিকাল। হঠাৎ দেখি, একটি আলো আমাদের আগে আগে চলেছে। আলোর বাহক কেউ আছে বলে বোধ হলেও কেউ আমরা তাকে দেখতে পেলাম না। প্রায় এক মাইল চলে যখন বন ছাড়িয়ে এলাম ও রাস্তা দেখতে পেয়ে তারকেশ্বরের রাস্তা বলে চিনতে পারলাম, তখন হঠাৎ চেয়ে দেখি, সেই আলো আর নেই।

॥২০॥

নিশিকান্ত মজুমদার

মহাষ্টমীর দিন মঠে গেছি। উত্তরদিকের বাগানবাড়িতে যোগীন-মা ও গোলাপ-মার মধ্যস্থলে মা বসে আছেন। আশপাশে বিস্তর স্ত্রীলোক। মা বললেন ঃ "কি বাবা, পুজো দেখতে এসেছ? দেখ দেখ, কেমন জয়া-বিজয়া নিয়ে বসে আছি!"

॥২১॥

প্রফুল্লমুখী বসু

ভক্ত যেমটি কথা বলবার সময় মা মৃদু মৃদু হাসতে আর মাথা নাড়তে লাগলেন। সেই হাসি যে একবার দেখেছে, সে জীবনে

তা ভুলতে পারবে না। মেমটি চলে যেতে মা বললেন : "আমার সঙ্গে কথা কইবে বলে 'বাল্যশিক্ষা' কিনে বাঙলা শিখেছে। আমি রাত চারটার সময় উঠি শুনে অবধি ও-ও চারটার সময় ওঠে।"

॥২২॥

ডাঃ প্রভাকর মুখার্জী

মা ঠাকুরের জন্য মালা গাঁথতে বলেছিলেন। শ্যাম, শ্যামা বা শিব-ভাবে দেখে তদনুরূপ মালা করব চিন্তা করছি, হঠাৎ মনে হলো—ঠাকুর তো সবই, সুতরাং সবরকম ফুল, তুলসী, বেলপাতা—সবকিছু দিয়েই মালা করা ভাল। নতুন বাড়িতে ঘরের বারান্দায় মা একটু তফাতে বসেছিলেন, স্নিগ্ধ মধুর হাসলেন।

জয়রামবাটীতে কোন প্রতিবেশীর অসুখে মা আমাকে তার চিকিৎসা করতে আদেশ করেন। তাঁর অনুমতি চাইতেই বললেন : "যাও, যশোলাভ কর।" রোগী অব্যর্থভাবে সেরে গেল।

॥২৩॥

বিভূতিভূষণ ঘোষ

ঠাকুরের কথাপ্রসঙ্গে মা বলেছিলেন : "চৈতন্য অবতারেই হয়ে যেত, ঠাকুরকে আসতে হতো না—যদি এরা ধুমড়ী [সাধনাঙ্গে স্ত্রীলোক] না নিত।" নিজের কথায় বলেছিলেন : "তখন তো ঠাকুরকে ঠাকুর বলতুম না, লক্ষ্মী আর আমি ওঁর কাছে মন্ত্র নিলুম।"

কলকাতা থেকে মা জয়রামবাটী এসেছেন। মা পালকিতে বসে আছেন, ঠাকুরের বাক্সও পালকিতে আছে। আমি ঠাকুরের বাক্স নামাচ্ছি, একটু আড়ভাবে নামাতে কষ্ট হচ্ছে দেখে মা হাসিমুখে বললেন : "বিশ্বম্ভর কিনা!"

বড় মামার ঘরের ছাঁচতলায় একটা বড় মাছ পড়ে আছে। মা দেখিয়ে বললেন ঃ "প্রসন্ন এই মাছটা ধরেছে। দেখি, কলুপুকুরে মাছটা ধরে কাঁটাটা ভাল করে মুখে লাগিয়ে দিয়ে, সুতো লোল দিয়ে খেলাচ্ছিল। ঠাকুর এইরকম করে তাঁর ছেলেদের নিয়ে খেলান।"

সন্ধ্যার মুখে জয়রামবাটী থেকে রওনা হচ্ছি, ছোট মামী বললেন ঃ "বিভূতি, তুমি একা যাবে?" মা বললেন ঃ "একা কেন যাবে? ঠাকুর সঙ্গে যাবেন।"

মজফ্ফরপুর থেকে স্ত্রী অমিয়বালাকে নিয়ে কাশী গিয়েছি। মা তখন তেল মেখে স্নান করতে যাচ্ছিলেন, আমাদের দেখে টবের জল নিজের মাথায় ছিটিয়ে দিলেন। তারপর ঘরে এসে স্ত্রীকে ডেকে তার চিবুক ধরে মুখ তুলে দেখলেন। বললেন ঃ "বাঃ, বউমা আমার বেশ!"

তার মৃত্যুর কথা শুনে মা কাঁদতে কাঁদতে যোগীন-মাকে বলেছিলেন ঃ "বিছে কামড়ালে যেমন কষ্ট হয় বউমার মৃত্যুতে আমার সেরকম কষ্ট হচ্ছে!" জোড়হাতে ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে মা বলেন ঃ "ঠাকুর, এই কোরো যেন বউমাকে আর না জন্মাতে হয়, তোমার পাদপদ্মে যেন তার স্থান হয়।" বারান্দায় এসে বলেছিলেন ঃ "যাকে ভালবাসব তার ইহকাল তো দেখবই, তার পরকালও যতক্ষণ না দেখতে পাচ্ছি ততক্ষণ মন স্থির হয় না। বিভূতি, ভালবাসাই সব।"

আমেরিকা থেকে কালী মহারাজ মঠে পঞ্চাশ টাকা পাঠিয়েছেন। বাবুরাম মহারাজ মাকে পত্র লিখে সেকথা জানিয়েছেন। নতুন বাড়িতে মা বসেছিলেন। পত্র পড়ে শোনাতেই তিনি বললেন ঃ "কালী নিজের কল্যাণ করলে।"

একদিন মা বললেন ঃ "আমার শরৎ আছে, রাধুর ভাবনা কী? শরৎ সবাইকে পালন করবে—শরৎ আমার বিষ্ণুর অংশে জন্মেছে।"

(কৃষ্ণলাল মহারাজকে) "আমি কারু দোষ দেখতে পাই না! গোলাপকে দেখিয়ে ঠাকুর একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন, 'মেয়েটি

কেমন গা? সবাই কত কী বলে, লজ্জাটজ্জা নাই!' ঠাকুর আমাকে রক্ষা করলেন, আমি বললুম, 'আমি তো কিছু দোষ দেখি না।' দেখ সত্যিই তো, ভাগ্যিস বলেছিলুম। দেখ না, এতদিন আহা, কেমন কাটিয়ে দিলে!"

মার মুখে শোনা—যুগাদ্যার পুরোহিত 'আর পারব না তোমার সেবা করতে' বলে দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে। পথে মা পুরোহিতকে দেখা দিয়ে বলছেন : "যার ভয়ে পালাও তুমি, সেই ঠাকুর আমি!"

॥২৪॥

ভূষণচন্দ্র পুইল্যা

মামা শিবদাস দলুই ও মামার কাকা যতীন্দ্রনাথ দলুইর সঙ্গে আমি জয়রামবাটী যাই। কোয়ালপাড়া মঠে আহার করে বিকালে মায়ের বাড়িতে আসি এবং আমিই বাড়ির ভিতরে গিয়ে দীক্ষার জন্য তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করি। মা সম্মত না হওয়ায় আবেগভরে বললাম : "তোমার তো এক বাগ্দী-বাবা ছিল, বাগ্দী-ছেলে কেন হবে না?" মা প্রসাদ পেতে বলায় উত্তর দিলাম : "যদি আমাদের মন্ত্র না দাও, আমরা খাব না।" রাত্রে উপবাসী রইলাম, মাও খেলেন না। পরদিন সকালে প্রসন্ন-মামা এসে বললেন : "দিদি বলছেন, 'আমার ছেলেদের স্নান করে আসতে বল, তাদের মন্ত্র দেব'।"

॥২৫॥

মহিমচন্দ্র দত্ত

সমরেন্দ্র মুখার্জী মেদিনীপুর সিভিল কোর্টে চাকরি করতেন। পরে কলকাতায় গিয়ে শিক্ষকতা করতে থাকেন। একদিন আবেগভরে মাকে বললেন : "মা, আমার কী সৌভাগ্য যে ঘন ঘন আপনার

শ্রীচরণ দর্শন পাচ্ছি।" "এই সৌভাগ্যের জন্যই তো তোমাকে সেখান থেকে চাকরি ছাড়িয়ে কলকাতায় এনেছি।"—মা বললেন। সমরেন্দ্রবাবু বললেন ঃ "মা, আপনার খুব কৃপা!" মা বললেন ঃ "আমার কৃপা না হলে কার সাধ্য এখানে আসে!"

॥২৬॥

যামিনী দেবী

জগদম্বা আশ্রমে ভোরবেলা মা আমাকে ডেকে তুলে বললেন ঃ "তুমি এখুনি নেয়ে এস, তোমাকে দীক্ষা দেব যে।" মন্ত্র নিতে বসে আমার নিজের কাছে কিছুই নেই বলায় মা আমার হাতে একটি হরীতকী দিয়ে বললেন ঃ "আবার কি দেবে মা, এই নাও হরীতকী।" মন্ত্র নিয়ে মার হাতে হরীতকী দিয়ে প্রণাম করলাম।

শেষবার কলকাতা যাওয়ার পথে সুরেশ্বর সেনের বাড়ি থেকে মা বিষ্ণুপুর স্টেশনে এসেছেন। স্টেশন-মাস্টার হাতজোড় করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন ঃ "মা, দয়া করে একবার আমার বাসায় চরণধূলি দিয়ে আসবেন চলুন।" মা বললেন ঃ "এবার না, আবার যখন আসব তখন হবে।"

॥২৭॥

রাধারানী চট্টোপাধ্যায় (রাধু)

মা ঠাকুরদের প্রণাম করতেন। বলতেন ঃ "মা চিত্তেশ্বরী আমার চিত্ত ঠাণ্ডা রাখুন।" শীতলা-মাকে বলতেন ঃ "শীতলে রোগনাশিনী, শোকনাশিনী, দারিদ্র্যনাশিনী, দুঃখনাশিনী।" বলতেন ঃ "মায়ের সমান নাই শরীরপালন, চিন্তার সমান নাই শরীরশোষণ। মায়ের সমান ছেলের যত্ন কেউ জানে না।"

মা কোঠারে যখন ছিলেন, তখন গান শিখেছিলেন—“কন করিলা রে নন্দর টিকি পিলাটি।”

॥২৮॥

সুবাসিনী দেবী

রাত্রিবেলা সকলের আহার হয়ে যাওয়ার পর পদ্মাপার [পূর্ববঙ্গ—বর্তমান বাংলাদেশ] থেকে স্ত্রী ও পুরুষ মিলে ছ-সাতজন ভক্ত এসে উপস্থিত। আমি পরিবেশন করছিলাম; জানতাম যে, হাঁড়িতে ভিজে ভাত আর নেই। মা বললেন : “হাঁড়িতে ভাত আছে।” নলিনী ও আমি দুজনেই গিয়ে দেখলাম, হাঁড়িতে ভাত একেবারেই নেই। “আমার মন বলছে ভাত আছে।”—এই বলে মা নিজেই দেখতে গেলেন এবং দু-তিন জনের উপযোগী ভাত বের করলেন। কিছু রুটি সকালের জলখাবারের জন্য প্রস্তুত ছিল, সেই রুটি ও ভাতে সকলেরই রাত্রির আহার কুলিয়ে গেল।

॥২৯॥

সুশীলাবালা দত্ত

‘মন হলো না কথার বাধ্য, সাধ্য নাই আর সাধনে।’—এই পদটি ঘর ঝাঁট দিতে দিতে আপন মনে গাইছিলাম। মা শুনতে পেয়ে বললেন : “গানটা তো বড় সুন্দর—ভাবের গান। সমস্তটা আমাকে গেয়ে শোনাও।” আমি কিন্তু সমস্তটা জানতাম না।

মৃতাশৌচ অবস্থায় আমি কিছুদিন মার কাছে ছিলাম। ঠাকুরঘরে যাওয়া-আসা করতাম, মার তক্তপোশের কাছে শুতাম। বিকালে অনেকগুলি স্ত্রীলোক মার কাছে বসে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আত্মীয়দের মৃত্যুর কথা বলাবলি করছিলেন। আমিও যেই খুড়শ্বশুরের মৃত্যুর

কথা বলতে যাব, মা অমনি চোখের ইশারায় বারণ করলেন। সকলে চলে যেতে বললেন ঃ "ওকথা কি যাকে তাকে বলতে হয়? সকলের মন তো সমান নয়।"

॥৩০॥

হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি দ্বিতীয়বার যখন জয়রামবাটী যাই, সেসময় একদিন দুপুরে বিশ্রামের পর বিকেলবেলা মায়ের পুরনো বাড়িতে গেছি। তিনি পা ঝুলিয়ে বসেছিলেন। প্রণাম করে তাঁর পা-দুখানি আমার মাথার ওপর রেখে বললাম ঃ "এই অনুভূতিটা যেন বরাবর থাকে।" মা বললেন ঃ "থাকবে।"

তাঁর পায়ের কাছে বসে আছি, কিন্তু মনে ক্রমাগত দুই বিপরীত ভাবের উদয় হচ্ছে। একবার মনে হচ্ছে, ইনি সাধারণ মেয়েমানুষ মাত্র। যখন ভগবতী-জ্ঞান হচ্ছে, তখন তাঁর প্রতি ভক্তিবিশ্বাস বাড়ছে, আর যখন মানবী-জ্ঞান হচ্ছে তখন ভক্তিবিশ্বাস চলে যাচ্ছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম, মায়ের কাছে বসেই যখন এই অবস্থা, তখন দূরে গেলে মাকে ভুলে যেতেও পারি। ভয় হলো, বললাম ঃ "মা, তোমাকে একটি কথা বলব, তুমি রাগ করবে না বল।" মা বললেন ঃ "তোর যা ইচ্ছা বল না, রাগ করব কেন?" আমার মনের অবস্থা খুলে বলতেই মা বললেন ঃ "আমি তো সাধারণ মেয়েমানুষই; তাতে কি হয়েছে, মা-জ্ঞান থাকলেই হলো।" আমি বললাম ঃ "যখন ভক্তিবিশ্বাসই থাকছে না, তখন মা-জ্ঞান যে বরাবর থাকবে তা-ই বা বলি কী করে?" মার পদযুগল মাথায় রেখে বললাম ঃ "তোমাকে বলতে হবে—'তুই ছাড়লেও আমি তোকে ছাড়ব না।' " মা বললেন ঃ "তা কি হয়? তুই ডাকলেই পাবি।" আমি তখন বললাম ঃ "তোমাকে ডাকবই না হয়তো। তোমাকে

বলতেই হবে।" এরকম উক্তি-প্রত্যুক্তির পর মা বললেন ঃ "আচ্ছা বাবা, তাই হবে।" তথাপি পূর্বোক্ত কথাটি হুবহু বলবার জন্য জেদ ধরায় হাসিমুখে মা বললেন ঃ "তুই ছাড়লেও আমি তোকে ছাড়ব না।"

দুই*

স্বামীজী কামারপুকুর ও জয়রামবাটীতে এসেছিলেন কিনা জানতে চাইলে মা বললেন ঃ "নরেন দুবার চেষ্টা করেও এখানে আসতে পারলে না। সেজন্যে তার বড় মনোকষ্ট ছিল। ঠাকুর কেন যে তাকে এখানে আসতে দিলেন না, তিনিই জানেন।"

হরিপ্রেম মহারাজ (স্বামী হরিপ্রেমানন্দ) কোয়ালপাড়া থেকে ফুল ও শাক-সবজি নিয়ে এসেছেন। মা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "বাবা, তুমি কেদারের কাছে আছ, সে বেশ ভালবাসে তো? যত্ন করে তো?" হরিপ্রেম মহারাজ বললেন ঃ "হ্যাঁ মা, বেশ ভালবাসে। তবে আমি আর গরুর বাগালি [গরু চরানো] করতে পারব না।" মা বললেন ঃ "ছেলেরা যে এখানে এসেছে, তারা একটু ধ্যানজপ করতে পারবে না? তুমি আমার এখানে চলে এস গে।" দু-তিন-দিন পরে তিনি নতুন বাড়িতে মার কাছে এলেন। মা প্রায়ই বলতেন ঃ "হরি, তুমি আমার পায়ে একটু বাতের তেল মালিশ করে দাও।" মেয়েদের বলতেন ঃ "হরি আমার কাজের ছেলে, ওকে আমি মনে করি আমার বিধবা মেয়ে।"

মায়ের বাড়িতে রান্নার কাজের অসুবিধে হচ্ছে মনে করে কালী-মামা একটি বামুন রাখবার জন্য বলেন। তাতে মা বলেন ঃ "আমি মেয়েদের নিয়ে থাকি, এখানে কি ব্যাটাছেলে রাখা চলে? তবে যে এরা [সেবকরা] রয়েছে, এরা আমার মেয়ে।"

---

* এই অংশে সংগৃহীত কথাবশেষ-সমূহের সূত্র পূর্ব-প্রকাশিত 'পাঁচ ফুলে সাজি' পুস্তিকায় উল্লেখিত হয়নি।—সম্পাদক

প্রবোধবাবু (প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) কোন ভক্তের দুশ্চরিত্রের কথা উত্থাপন করায় মা বলেন ঃ "তোমরা তো ভাল কিছু ধরতে পারবে না, কেবল মন্দটাই এসে বলবে। কী হয়েছে তার? ব্রহ্মাবিষ্ণু এলেও কিছু করতে পারবে না।"

মা নিজের বিছানাপত্র অন্যকে ব্যবহার করতে দিতেন না, দিলেও নিজে আর ব্যবহার করতেন না। শেষাশেষি এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়। জগদম্বা আশ্রমে একরাত্রে মা যামিনীকে নিজের বিছানায় শোয়ালেন। খানিক পরে রাধু জেগে উঠে বলতে লাগল ঃ "কে শুয়ে আছে মা, বিছানায় কে শুয়ে?" মা বললেন ঃ "এই তো বিছানা পড়ে আছে, দ্যাখ না।" রাধু চেয়ে দেখল, কেউ নেই। আবার খানিক পরেই সে "বিছানায় কে শুয়ে?" ইত্যাদি বলতে লাগল। মা যামিনীর ওপর থেকে লেপ সরিয়ে দিয়ে বললেন ঃ "বারবার বিরক্ত করছিস, এই দ্যাখ কে আছে।" রাধু উঠে বসল, বেশ করে তাকিয়ে দেখল, কাউকে দেখতে না পেয়ে আবার শুয়ে পড়ল।

সুরমা রায়কে মা বলেছিলেন ঃ "ঠাকুরের পুজোয় দূর্বা দিয়ো। মাঝের শীষটা ফেলে দিয়ে তিনটি দল রাখবে। শিবপূজা ঐরকম দূর্বা ছাড়া হয় না।"

সাতু দীক্ষা নেওয়ার পর আর পড়বেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় মা বললেন ঃ "পড়বে বইকি। ঠাকুরের সন্তানরা মহা মহা পণ্ডিত, মূর্খের দ্বারা কোন কাজ হয় না।"

মা জয়রামবাটীতে না থাকলে সেখানে যেতে মন চাইত না। একবার মা কলকাতা থেকে দেশে ফিরে এলে দেখা করতে গেছি। বললেন ঃ "ও নলিন, এই ঝি কি বলে শোন।" ঝি বলল ঃ "মার ঘরের ভেতর ধান রেখে দরজায় শুয়ে আছি। অধিক রাতে দেখি মা পাটের কাপড় পরে, ডান হাতে গঙ্গাজলের কমণ্ডলু আর বাঁ হাতে ফুলের সাজি নিয়ে এসে আমাকে ধমক দিয়ে বলছেন,

'দরজা ছাড়, আমি ভেতরে গিয়ে ঠাকুরপুজো করব।' আমি তাড়াতাড়ি বিছানা গুটিয়ে নিলাম। মা ঘরে ঢুকে পুজো করে আবার বেরিয়ে গেলেন।" মা বললেন : "শুনলিরে, আমি কি জয়রামবাটী-ছাড়া?"

মায়ের ধান ভাণ্ডতে ভাণ্ডতে গয়লা-বউ বলল : "ঠাকুরঝি, কত লোকে চব্বিশপ্রহর [অর্থাৎ তিনদিন ধরে অবিরাম হরিনাম-সঙ্কীর্তন] দিচ্ছে—তোমার কত ছেলেপুলে, তুমি চব্বিশপ্রহর দাও না।" মা বললেন : "গয়লা-বউ, এর পরে কত চব্বিশপ্রহর দেখবি এখন!"

পত্নীবিয়োগের পর কেদারনাথ দত্ত আর বিবাহ করবেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় মা বললেন : "হ্যাঁ গো, বিয়ে করবে বইকি। ভক্তের [সৎ মানুষের] বংশবৃদ্ধি [সংখ্যাবৃদ্ধি] হলে তবে তো সংসারের [জগতের] মঙ্গল হবে।"

"পত্নীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করব?" উমেশবাবুর [উমেশচন্দ্র দত্ত] এই প্রশ্নের উত্তরে মা বলেছিলেন : "মনে করবে যে, জগদম্বাই তোমার সেবা করবার জন্যে তোমার পত্নীরূপে এসেছেন।"

মা বলতেন : "যা হয় না ধনে জনে, তা হয় ক্ষণের গুণে।"

বাঁকুড়ার রামতারণের দীক্ষার পর মা আশু মহারাজকে[১] বললেন : "যদি সৃষ্টি রাখতে চাও, আর লোক এনো না।" [তাৎপর্য : মায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষালাভ করলে অব্যর্থ মুক্তি। মুক্তি হলে আর জন্ম হবে না। ফলে সৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবে।]□

---

১ তখন স্বামী সত্যকামানন্দ—পূর্বাশ্রমে আশুতোষ মিত্র, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের সহোদর। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের শেষ থেকে ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল/মে (বৈশাখ ১৩১৮) পর্যন্ত তিনি শ্রীশ্রীমায়ের অন্যতম সেবক ছিলেন। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল/মে মাসে তাঁকে মঠ ছেড়ে যেতে হয়। তাঁর মনোজ্ঞ মাতৃস্মৃতি বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।—সম্পাদক

শ্রীশ্রীমায়ের পত্রাবলী

প্রাসঙ্গিক টীকা সংশ্লিষ্ট পত্রের শেষে সংযোজিত হয়েছে, পৃষ্ঠার শেষে নয়।—সম্পাদক

॥ ১ ॥

কথামৃতকার শ্রীম-কে লিখিত*

জয়রামবাটী
২১শে আষাঢ় ১৩০৪

বাবাজীবন,

তাঁহার নিকট যাহা শুনিয়াছিলে সেই কথাই সত্য। ইহাতে তোমার কোন ভয় নাই। একসময় তিনিই তোমার কাছে ঐসকল কথা রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে আবশ্যকমত তিনিই প্রকাশ করাইতেছেন। ঐসকল কথা ব্যক্ত না করিলে লোকের চৈতন্য হইবে নাই জানিবে। তোমার নিকট যেসমস্ত তাঁহার কথা আছে তাহা সবই সত্য। আমি একদিন তোমার মুখে শুনিয়া আমার বোধ হইল যে, তিনিই ঐসমস্ত কথা বলিতেছেন।

আশীর্বাদিকা
মা

---

* স্বামী সুবোধানন্দের ভাইঝি নির্মলনলিনী মিত্র (স্বামীর নাম কালীকিঙ্কর মিত্র) ১৯৯৬ খ্রীস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে ৯৪ বছর বয়সে নিজের হাতে এই স্মৃতিকথাটি লিখেছিলেন। ১৪ জানুয়ারি ১৯৯৯ তিনি পরলোকগমন করেন।—সম্পাদক

॥ ২ ॥

পুঁথিকার অক্ষয়কুমার সেনকে লিখিত*

ওঁ শ্রীশ্রীভগবান

জয়রামবাটী
১৩ই ফাল্গুন ১৩০২

পরম শুভাশীর্বাদ বিশেষ—

পরে বাবাজীবন তোমার পত্র পাইলাম ও সমস্ত জ্ঞাত হইয়া সুখী হইলাম। শ্রীশ্রীভগবানদেবের[১] উৎসবে পরমাহ্লাদিত হইলাম, এখানে শ্রীশ্রীকামারপুষ্করিণীতে[২] শ্রীশ্রীভগবানদেবের উৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পুস্তক[৩] ছাপাইবার কথা লিখিয়াছ, বাবা তোমাকে ভগবান যেমন মতি দিবেন তাহাই করিবে। আমারও আজ্ঞা —তুমি ছাপাইবে। তাঁহার প্রতি তোমার যেমন ভক্তি তোমার কার্য সিদ্ধ হইবেক।[৪]

আমি ভাল আছি। তোমার কুশল দানে সুখী করিবে। ইতি

তোমার মাতা

১ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ২ কামারপুকুরে ৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি

৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথির রচনা ও প্রকাশে শ্রীশ্রীমায়ের শুভাশীর্বাদ লাভ কবির অন্তরে প্রেরণার উৎসরূপে চিরজাগরূক ছিল। পুঁথির উপসংহারে তিনি লিখেছেন :

"লীলা-গীতি বিরচনে যে শকতি ছাপা।
সে নহে সম্পত্তি মোর জননীর কৃপা॥"

উল্লেখ্য যে, এই পুঁথি-রচনায় অক্ষয়কুমার সেনের প্রধান উৎসাহদাতা স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দই তাঁকে মাতৃসকাশে নিয়ে গিয়ে পুঁথির কিছু অংশ মাকে শোনাবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। স্বামীজীর কৃপাতেই মায়ের শ্রীচরণাশ্রয় পেয়ে তিনি পুঁথির সবিস্তার রচনায় আরও বেশি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। পুঁথির বর্ণনা থেকেই তা জানা যায়।—সম্পাদক

* উদ্বোধন, ৮৪তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৌষ ১৩৮৯, পৃঃ ৬০৮

॥ ৩ ॥

পুঁথিকার অক্ষয়কুমার সেনকে লিখিত*

শ্রীশ্রীকালী সহায়

জয়রামবাটী

২৮ জ্যৈষ্ঠ, সোমবার [১৩০২]

চিরঞ্জীবেষু—

...তোমার পত্র একখানি পাইয়া সমস্ত জ্ঞাত হইলাম। মাথার অসুখ আমার ভাল হইয়াছে, এখন কিছু যন্ত্রণা নাই। জয়রামবাটী আসিবার কথা লিখিয়াছ, কিন্তু এসম্বন্ধে আমি কিছুমাত্র জানি নাই। আমার দেহে যতদিন প্রাণ থাকিবেক, তাবৎকাল পর্যন্ত আসা-যাওয়া করিবে। আমার আপনার পর কেহই নয়, সকলই সমান। কলিকাতার লোক কিসে আপনার হইল, আর তুমি বা কিসে পর হইলে? আমার তো মনের মধ্যে কিছুই দুই-দুই নাই। যখন ভগবানের শরণাগত হইয়াছ তখনই আপনার। তুমি মনে দুঃখ করিও না, যখন তোমার ইচ্ছা হইবে তখনই তুমি আসিবে। তোমার পত্র শুনিয়া আশ্চর্য [বোধ] হইল। তুমি মনের ভিতর কিছু ময়লা রাখিও না।[১] ইতি

তোমার মাতাঠাকুরানী

পুনশ্চ—তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে। তোমার ঠিকানা বেশ স্মরণ নাই। আমি শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় ভাল আছি। তুমি আমাকে মাঝে মাঝে পত্র লিখিও।

* শ্রীশ্রীসারদাদেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১০ম সং, ১৩৯৩, পৃঃ ১০৩

১ ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য মহারাজের সংযোজন—"এই পত্রখানি লিখিবার প্রায় একবৎসর পূর্বে (১৩০১ সালের ১২ আষাঢ়) অক্ষয়বাবুকে শ্রীশ্রীমা লিখিয়াছিলেন : 'আমি তোমাকে

॥ ৪ ॥

ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত*

Sri Sri Gurupada Bharasa

[My trust is in His sacred Feet.]

Jairambaty
21st Chaitra
[4th April 1900]

May this letter carry all blessings! My dear love to you, Baby Daughter Nivedita! I am so glad to learn that you have prayed to the Lord for my eternal peace. You

---

মনের সহিত ভালবাসি!' অক্ষয়বাবু স্বভাবত: অভিমানী ছিলেন, ভাবপ্রবণতার প্রাবল্যে অনেক সময়েই নিষ্কারণ অভিমান করিয়া বসিতেন। তাঁহার লিখিত মায়ের আশীর্বাদসিক্ত অমরগ্রন্থের একস্থানে মাকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বলিয়াছেন :

'দেখি অসংসারিগণে অতিশয় টান।
গৃহীরা কি বানে ভাসা পরের সন্তান॥
তুমি তো করেছ গৃহী দিয়া মায়াঠুলি।
ঘুরাতেছ ঘানি-গাছে খাওয়ায়ে বিচালি॥
ছুটে ছুটে মরি খেটে পেটে নাহি ভাত।
তাহার উপরে মা তোমার কশাঘাত॥
কি বিচার মা তোমার বুঝিবারে নারি।
কোন ছেলে কোলে, কেহ ভূমে গড়াগড়ি॥
মায়ের নিকট হেন শোভা নাহি পায়।
এরূপ কোথায় করে কোন্ দেশী মায়॥
অমাতার ব্যবহার দেখে কত সই।
কবে দিনু মুখুজ্যের পাকা ধানে মই॥'"

[দ্র: শ্রীশ্রীসারদাদেবী, পৃ: ১০৩]

* অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর সৌজন্যে প্রাপ্ত।—সম্পাদক

are a manifestation of the ever-blissful Mother. I look at your photograph which is with me, every now and then. And it seems as if you are present with me. I long for the day and the year when you shall return. May the prayers you have uttered for me from the heart of your pure virgin soul be answered! I am well and happy. I always pray to the Lord to help you in your efforts and to keep you strong and happy. I pray too for your quick return. May He fulfil your desires about the women's home in India, and may the would-be home fulfil its mission in teaching true *dharma* to all.

He, the Breath of the Universe, is singing His Own praise, and you are hearing that Eternal song through things that will come to an end. The trees, the birds, the hills, and all are singing praise to the Lord. The Banyan of Dukineswar sings of Kali to be sure, and blessed is he who has ears to hear it.

I was so glad to hear of the faith of Mrs. Waterman. She who thinks she has not lost her beloved, even after the fall of the body, has really attained to light; for the soul can never die, even when the body falls. I am to hear that it has strengthened her to hear of me. May she be a help to your work. My love and blessings to Mrs. May Wright Sewell.

My dear love to you and blessings and prayers for your spiritual growth. You are indeed doing good work—but do not forget your Bengali! Or I shall not be able to understand you, when you come back. It gave me such delight to know that you are speaking of Dhruba, Savitri, Sita-Ram and so on there!

The accounts of their holy lives are better than all the vain talks of the world, I am sure. Oh how beautiful are the Name and the doings of the Lord!

Your Mother

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর সৌজন্যে নিবেদিতাকে লেখা শ্রীশ্রীমায়ের ওপরের চিঠিখানি পাওয়া গেছে—মূলে অবশ্য নয়—ইংরেজী অনুবাদে। মায়ের চিঠিটি ইংরেজীতে অনুবাদ করে স্বামী সারদানন্দ নিবেদিতাকে পাঠান ১১ এপ্রিল ১৯০০। স্বামী সারদানন্দ এই প্রসঙ্গে নিবেদিতাকে লিখেছিলেন (অবশ্যই ইংরেজীতে) : "শ্রীশ্রীমা কুশলে আছেন। তোমাকে এক সুন্দর পত্র লিখেছেন। আমি মূল পত্রের সঙ্গে তার ইংরেজী অনুবাদ পাঠাচ্ছি। মনে হয়, পত্রের ইংরেজী অনুবাদ পেলে তুমি আনন্দিত হবে।" দুঃখের বিষয়, মূল বাঙলা চিঠিখানি পাওয়া যায়নি, কিন্তু স্বামী সারদানন্দ কৃত ইংরেজী অনুবাদটি পাওয়া গেছে, যেটি নিবেদিতা উল্লাসের সঙ্গে স্বহস্তে কপি করে অন্তরঙ্গ মহলে বিতরণ করেছিলেন।—**সম্পাদক**

[অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু কৃত পত্রটির পুনশ্চ অনুবাদ*]

(শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা)

জয়রামবাটী
২১শে চৈত্র
[৪ঠা এপ্রিল ১৯০০]

শুভাশীর্বাদরাশয়ঃ সন্তু,

স্নেহের খুকি নিবেদিতা, তুমি আমার ভালবাসা জানিও। তুমি আমার নিত্য শান্তির জন্য শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছ জানিয়া আনন্দিত হইলাম। তুমি সেই সদানন্দময়ী মার প্রতিমূর্তি। আমার

কাছে তোমার যে-ফটোটি রহিয়াছে, তাহার দিকে অনেক সময় চাহিয়া থাকি; তখন মনে হয়, তুমি যেন আমাদের মধ্যেই রহিয়াছ। তুমি কবে, কোন্ বৎসরে ফিরিয়া আসিবে তাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকি। তোমার ব্রহ্মচর্যপূত হৃদয়ে আমার জন্য যে-প্রার্থনা জাগিয়াছে, তাহা যেন পূরণ হয়। আমার শারীরিক কুশল। আমি আনন্দে আছি। ভগবানের নিকট সর্বদা প্রার্থনা, তিনি তোমার উদ্যমে সহায় হউন এবং তোমাকে দৃঢ় ও সুখী করুন। তুমি সত্বর ভালয় ভালয় ফিরিয়া এসো, ইহাও প্রার্থনা করি। ভারতবর্ষে মেয়েদের আশ্রম সম্বন্ধে তোমার অভিলাষ তিনি পূরণ করুন; ভাবী আশ্রমটি যেন সকলকে যথার্থ ধর্ম শিক্ষা দিয়া নিজের উদ্দেশ্য সফল করে।

যিনি ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণবায়ুস্বরূপ—তিনি নিজের বন্দনামন্ত্র নিজেই গান করিতেছেন, তুমি সেই নশ্বর সকল বস্তুর মধ্যেই নিত্যসঙ্গীত শুনিতেছ। বৃক্ষ-লতা, পশু-পক্ষী, পাহাড়-পর্বত সকলই প্রভুর স্তোত্র গাহিতেছে। দক্ষিণেশ্বরের বটবৃক্ষ মা-কালীর গান করিতেছে নিশ্চয় জানিও, যাহার কান আছে সে শুনিতে পায়।

মিসেস ওয়াটারম্যানের গভীর বিশ্বাসের কথা শুনিয়া খুশি হইলাম। যে অনুভব করে, দেহ গত হইলেও তাহার প্রিয়তম হারাইয়া যায় নাই—সেই যথার্থ আলোক পাইয়াছে। কারণ, দেহের নাশ হইলেও আত্মা কখনও বিনষ্ট হন না। আমার কথা শুনিয়া সে বল পাইয়াছে, একথা শুনিতে ইচ্ছা করি। সে যেন তোমার কাজের সহায় হয়। মিসেস মে রাইট সীওয়েলকে আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ দিবে।

আমার আশীর্বাদ ও ভালবাসা জানিও। আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতিলাভ কর, ইহাই প্রার্থনা। বাস্তবিক তুমি অতি চমৎকার কাজ করিতেছ। কিন্তু বাঙলাভাষা যেন ভুলিয়া যাইও না, নতুবা যখন তুমি ফিরিয়া আসিবে, তোমার কথা আমি বুঝিতে পারিব না। ধ্রুব, সাবিত্রী, সীতা-রাম প্রভৃতি সম্বন্ধে সেখানে বক্তৃতা দিতেছ জানিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম।

তাঁহাদের পবিত্র জীবনকাহিনী সাংসারিক সকল বৃথা বাক্যালাপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা বলাই বাহুল্য। প্রভুর নাম ও লীলা উভয়ই কত সুন্দর!

তোমার মাতাঠাকুরানী

• দ্রঃ নিবেদিতা লোকমাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১ম সং, ১৯৬৮, পৃঃ ২০১-২০২। শঙ্করীপ্রসাদ বসুর সংযোজন—"নিবেদিতা লিখেছেন, যখন তিনি শ্রীমায়ের চিঠিটি মিসেস ওয়াটারম্যানের কাছে পড়ে শুনিয়েছিলেন, তখন তিনি গভীর আনন্দে বলে ওঠেন : 'আহা! কী মধুময় প্রাণ!' ('Oh! What a *sweet* soul!') মিসেস ওয়াটারম্যানের এই উক্তিকে নিবেদিতা মনে করেন, পত্রের গুণ সম্বন্ধে সুন্দরতম উক্তি।

"নিবেদিতা শ্রীমায়ের চিঠি পেয়ে এতই উল্লসিত হন যে, চিঠিটির নকল মিসেস ওলি বুলকে পাঠিয়ে লেখেন (১৩।৫।১৯০০) : 'মাতাঠাকুরানীর চিঠির এই নকল পেয়ে তুমি নিশ্চয় খুশি হবে।' এই চিঠি, আমাদের বিশ্বাস, মিস ম্যাকলাউড প্রমুখ অন্তরঙ্গদেরও নিবেদিতা পাঠিয়েছিলেন, কারণ গভীর তৃপ্তিকর কোন প্রাপ্তি ঘটলে তার অংশ তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধুমণ্ডলীকে না দিয়ে পারতেন না।

"এই চিঠির নিবেদিতা-কৃত নকলের একটি (লিজেল) রেঁম-সংগ্রহে রয়েছে।" (দ্রঃ নিবেদিতা লোকমাতা, পৃঃ ২০২)

॥ ৫ ॥

মিসেস সারা ওলি বুলকে লিখিত*

12, Gopal Ch. Neogi's Lane,
Bagh Bazar, Calcutta,
28.7.(19)10

Mother,

Hearing that you are very ill, I am very anxious about you! I heard from your daughter Nivedita that you are a little better. I am praying to Thakoor, the Lord, for your speedy recovery. Your recovery will cause me great joy.

I have come here, and all my children here are well, except Jogin, who is not quite well, about which I am a little anxious, and very very sorry.

I have offered on your behalf, to the feet of Ramakrishna, a tulsi and a bel leaf, and three evenings sitting before Him I have prayed for you. Also I want to know if Jay [Miss MacLeod] is going to you. Please give her my warm blessings, and do not forget Christine if you see her. I am so sorry to hear that your daughter is not at present with you, in this time of illness.

And now from our Lord I am sending you a flower and sandal dust which I offered to Him, with worship. My deep love and blessing you will realise. I love you very much and bless you from my heart. We are far away from you, but I always feel as if you were quite near!

Your
মা
(Mother)

Mrs. Ole Bull
Studio House
168, Brattle St.
Cambridge Mass.
U.S.A.

---

* ১৯১০ সালে মিসেস সারা ওলি বুল যখন শেষ অসুখে শয়ান, তখন শ্রীশ্রীমা খুব বিচলিত হয়েছিলেন। উৎকণ্ঠিতভাবে তিনি নিবেদিতা প্রমুখের কাছে বারবার 'সারা'র খবর নিতেন। তাঁকে চিঠিও দিয়েছিলেন। নিবেদিতার হাতে লেখা দুর্লভ সেই পত্রটির ফটোকপি অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর সৌজন্যে পাওয়া গিয়েছে। শ্রীশ্রীমায়ের চিঠিটি মনে হয় তাঁর পক্ষে কেউ ইংরেজীতে লিখেছিলেন, নিবেদিতা সেটি পুনরায় স্বয়ং নকল করে দিয়েছিলেন। ভাষা দেখেই বোঝা যায় যে, নিবেদিতার ইংরেজী ওটি নয়। অপর কারও হাতে লেখা চিঠিটি নিশ্চয়ই শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ আগ্রহে নিবেদিতা পুনরায় লিখে দিয়েছিলেন। হস্তাক্ষরটি নিবেদিতার হলে মিসেস বুলের বিশেষ আনন্দ হবে, শ্রীশ্রীমা হয়তো ভেবেছিলেন। কারণ, নিবেদিতা ছিলেন মিসেস বুলের অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী। এই ইংরেজী চিঠিটির শেষে শ্রীশ্রীমা বাঙলায় বড় আকারে 'মা' শব্দটি স্বয়ং লিখে দিয়েছিলেন।—**সম্পাদক**

[অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু কৃত বঙ্গানুবাদ]

১২, গোপাল চন্দ্র নিয়োগী লেন
বাগবাজার, কলিকাতা
২৮।৭।(১৯)১০

মা,

তুমি খুবই অসুস্থ, একথা শুনে তোমার জন্য খুব চিন্তায় আছি। তোমার কন্যা নিবেদিতার কাছে শুনলাম যে, তুমি [এখন] একটু ভাল আছ। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি, তুমি তাড়াতাড়ি সেরে ওঠ। তুমি সেরে উঠলে আমার যে কী আনন্দ হবে তা কী বলব!

আমি এখানে [জয়রামবাটী থেকে] এসেছি। আমার সব ছেলেমেয়েরাই ভাল আছে, কেবল যোগীন [যোগীন-মা] ছাড়া। তার শরীর তেমন ভাল নয়, সেজন্য আমি কিছুটা চিন্তায় আছি, আর খু-উ-ব দুঃখ হচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে তোমার নামে তুলসী-বেলপাতা দিয়েছি, আর ত্রিসন্ধ্যা তাঁর [পটের] সামনে বসে তোমার জন্য প্রার্থনা করেছি। আমার জানতে ইচ্ছা হয়, জয়া [মিস ম্যাকলাউড] কি তোমার কাছে যাচ্ছে? তাকে আমার আন্তরিক আশীর্বাদ দিও, আর ক্রিস্টিন যদি তোমার কাছে থাকে তাহলে তাকে জানাতেও ভুলো না। তোমার এই অসুখের সময় তোমার মেয়ে [ওলিয়া] কাছে নেই, একথা জেনে খুব দুঃখ হচ্ছে।

এইসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে পূজার সময় নিবেদন করা পুষ্প-চন্দন তোমার কাছে পাঠাচ্ছি। আমার গভীর ভালবাসা ও আশীর্বাদ তুমি অনুভব করবে। আমি তোমাকে খু-উ-ব ভালবাসি এবং অন্তর থেকে তোমাকে

আশীর্বাদ করছি। তোমার কাছ্ থেকে অনেক দূরে আছি, তবু আমার সবসময় মনে হয়, তুমি আমার খুব কাছেই আছ। ইতি

তোমার
মা

শ্রীমতী ওলি বুল
স্টুডিও হাউস
১৬৮, ব্র্যাটল স্ট্রীট
কেম্ব্রিজ ম্যাস.
ইউ. এস. এ.

॥ ৬ ॥

স্বামী বিমলানন্দকে লিখিত*

শ্রীগুরবে নমঃ

জয়রামবাটী
১৩০৯ ১৫ই ভাদ্র

নিরাপদেষু—

পরম শুভাশীর্বাদবিশেষ—

বাবাজী—১খান পত্র পাইয়া জ্ঞাত আছি। শ্রীশ্রীস্বামীজী মহারাজের জন্য যে-কষ্ট হইতেছে [তাহা] লিখিয়া কি জানাই! আমাদের গুরু যিনি তিনি তো অদ্বৈত। তোমরা [যখন] সেই গুরুর শিষ্য, তখন তোমরাও অদ্বৈতবাদী। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি তোমরা অবশ্য অদ্বৈতবাদী। মিসেস সেভিয়ারকে আমার ভালবাসার সহিত আশীর্বাদ জানাইবে। তোমরা সকলে আমার আশীর্বাদ জানিবে। কালীকৃষ্ণ [স্বামী বিরজানন্দ] তথায় যাইবেক জানিয়া মতিলালের [স্বামী সচ্চিদানন্দ (২নং)] ১খান পত্র পাইয়াছি। তাহাকে আমার

আশীর্বাদ জানাইবে। মেয়ে মানুষের মঠ[১]—মঠে সাবধানে থাকিবে। আর স্বামীজীর জোর নাই। আমরা সকলে ভাল আছি। তোমাদের সংবাদ লিখিবে। ইতি

আশীর্বাদিকা
তোমাদের মাতা

* উদ্বোধন, ৭৪তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৭৯, পৃঃ ৫০৪; এই চিঠির ফটোকপি বর্তমান খণ্ডে দেওয়া হয়েছে। [চিত্রসূচী দ্রষ্টব্য] এই ঐতিহাসিক পত্র প্রসঙ্গে অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর আলোচনা 'পরিশিষ্ট'-এ উপস্থাপিত হয়েছে।—সম্পাদক

১ 'মেয়ে মানুষের মঠ' কথাটি পাশে লেখা ছিল (ফটো দ্রষ্টব্য), আমরা অনুমান করে এখানে বসিয়েছি। মিসেস সেভিয়ার মায়াবতী আশ্রমে থাকতেন। সম্ভবতঃ সেইজন্যই শ্রীশ্রীমা ঐকথা লিখেছিলেন।—সম্পাদক

॥ ৭ ॥

স্বামী শান্তানন্দকে লিখিত*

শ্রীশ্রীহরি সহায়

জয়রামবাটী
৫ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার
১৮।২।(১৯)১৬

পরম শুভাশীর্বাদ,

পরে বাবাজীবন খগেন, তোমার পত্র পাইলাম। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। তারককে, জিতেনকে, চন্দ্রকে আমার আশীর্বাদ দিবে। এখানের কুশল। তোমরা ভাল আছ শুনে সুখী হইলাম। আর কি লিখিব। আমি অমনি ভাল আছি। ইতি

তোমাদের মাতা

* উদ্বোধন, ৬৫তম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৭০, পৃঃ ৬০১

॥ ৮ ॥

স্বামী শান্তানন্দকে লিখিত*

শ্রীশ্রীহরি

জয়রামবাটী
২০শে আষাঢ় (৪।৭।[১৯]১৭)

পরম আশীর্বাদ,

পরে বাবাজীবন খগেন, তোমার অনেকদিন পরে পত্র পাইয়া সন্তোষ হইলাম। তুমি সমস্ত দর্শন করিয়াছ শুনে সুখী হইলাম। তাঁকে ডাকবে। তিনিই তোমাদের ভক্তি [দিবেন] এবং রক্ষে করবেন। আমার শরীর একপ্রকার ভাল আছে। রাধুর খুব অসুখ হইয়াছিল, উপস্থিত ভাল আছে। ওখানের ভক্তদের সকলকে আমার আশীর্বাদ দিবে। এখানের মঙ্গল। তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে। তোমাদের কুশল মধ্যে মধ্যে দিবে। ইতি

তোমাদের মাতা

* উদ্বোধন, ৬৫তম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৭০, পৃঃ ৬০১

॥ ৯ ॥

স্বামী শান্তানন্দকে লিখিত*

জয় মা

জয়রামবাটী
২৪।৯।(১৯)১৭

কল্যাণবরেষু

বাবাজীবন, তোমার পত্রে সমস্ত জ্ঞাত হইলাম। আমি ও রাধু

ভাল আছি। তুমি আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় তোমার ভাল মতন দর্শন হইবে। আশ্রমের ছেলেদের আমার স্নেহাশীর্বাদ দিও। ইতি

আশীর্বাদিকা
তোমার মা

* উদ্বোধন, ৬৫তম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৭০, পৃঃ ৬০১

॥ ১০ ॥

স্বামী বীরেশ্বরানন্দকে লিখিত*

Jayrambati
Anur, Hooghly
4 June 1917

My dear Prabhu,

Your letter is to hand. I remember you, my darling, very well. I am very glad to hear that you have become a Sadhu and taken Brahmacharya from Rakhal, my favourite son. You should not come to me now. Carry out the order of Rakhal. I hope that you shall be able to overcome all such difficulties by His (Thakur's) grace. Pray to Him, and He will favour you. Try to meditate yourself everyday regularly, and you will progress gradually. Don't be downcast, my boy. I am very glad to hear that the new Math [at Madras] has been opened. I hope that it will be completed well in time.

I am well. I bless you affectionately. You should write to me whenever you want. Do not be sorry because you do not know Bengali.

With blessings to you and all my sons of the Math.

I remain
My dear Child
Your
Holy Mother

P.S. You may write in English, but write clearly.

• Prabuddha Bharata, Vol. 90; No.5, May 1985, p. 224

[স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ কৃত বঙ্গানুবাদ*]

জয়রামবাটী
আনুড়, হুগলী
৪ঠা জুন ১৯১৭

কল্যাণবরেষু,

বাবাজীবন প্রভু, তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমাকে আমার খুব মনে আছে, বাবা। তুমি সাধু হইয়াছ এবং আমার প্রিয় সন্তান রাখালের [স্বামী ব্রহ্মানন্দ] কাছে ব্রহ্মচর্য পাইয়াছ জানিয়া খুবই আনন্দিত হইয়াছি। তোমার এখন আমার কাছে আসিবার প্রয়োজন নাই। রাখালের আদেশ পালন করিয়া চল। আমি বিশ্বাস করি তাঁহার [শ্রীশ্রীঠাকুরের] কৃপায় তুমি এসমস্ত অসুবিধা কাটাইয়া উঠিবে। তাঁহার কাছে প্রার্থনা কর, তিনি তোমাকে কৃপা করিবেন। প্রত্যহ নিয়মিত ধ্যান করিবে। তাহা হইলে [অধ্যাত্মজীবনে] ক্রমশই আগাইয়া যাইবে। কখনও হতোদ্যম হইও না, বাবা। নূতন মঠের উদ্বোধন হইয়াছে জানিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম। আশাকরি, কিছুদিনের মধ্যেই মঠের [অবশিষ্ট] কার্যাদি ভালভাবে সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে।

আমি ভাল আছি। তোমাকে স্নেহাশীর্বাদ করিতেছি। তোমার যখন ইচ্ছা হইবে আমাকে পত্র লিখিবে। বাঙলা জান না বলিয়া দুঃখ করিও না।

তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে এবং মঠস্থ আমার সকল ছেলেদের আশীর্বাদ জানাইবে। ইতি

আশীর্বাদিকা
তোমাদের মাতাঠাকুরানী

পুনশ্চ ঃ তুমি ইংরাজীতেই পত্র লিখিও—তবে লেখা যেন পরিষ্কার হয়।

* উদ্বোধন, ৮৭তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৯২, পৃঃ ১৯৪

॥ ১১ ॥

নিরুপমা দেবীকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

শ্রীশ্রীহরি সহায়

৫ই মাঘ, মঙ্গলবার

পরম আশীর্বাদ।

মা, তোমার পত্র পাইয়াছি। আর তুমি যে [রিপ্লাই] পোস্টকার্ড দিয়াছিলে তাহা খারাপ হয়ে গেছে। আর যাবে না। আর, আমার শরীর বড় ভাল নয়। নলিনী অমনি আছে। আর, আমার বাড়ি যাবার কথা লিখেছ তাহা এখন ঠিক নাই। তোমার ছেলের জ্বর হয়েছে শুনে দুঃখিত হইলাম। আর কি লিখিব—ছবির কথা লিখেছ, ছবি এখন পাওয়া যাবে নাই। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানবে। ঠাকুর তোমাদের মঙ্গল করুন। এখানের মঙ্গল। ইতি

তোমাদের মাতাঠাকুরানীদেবী

* পোস্টকার্ডটিতে কলকাতার ওয়েলেসলি ডাকঘরের ছাপ আছে [তারিখ : 23 (28 ?) JAN. (19)15] । অপর ডাকঘরের ছাপ অস্পষ্ট। পত্রপ্রাপক নিরুপমা দেবীর ঠিকানা—৪৪ ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেন, কলিকাতা (বর্তমানে ৪৪, ৪৫ এ,বি,সি,ডি ; ৪৬ ; ৪৭ আবদুল হালিম লেন, কলকাতা ৭০০ ০১৬)। নিরুপমা দেবীকে লেখা শ্রীশ্রীমায়ের ৩৮টি চিঠি তাঁর তৃতীয় পুত্র গৌতমশঙ্কর রায়ের সৌজন্যে আমরা পেয়েছি। নিরুপমা দেবীর স্বামী সত্যশঙ্কর রায়ের মাতৃস্মৃতি ও এই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।—সম্পাদক

I have offered in your behalf, [illegible]
of Sri Ramakrishna [illegible] in the day.
And these evenings, sitting before him.
I have prayed for you. Also I
want to know of Love in Sing
to you — Please give her my other
blessings, & do not forget that time
if you see her. I am so sorry to
hear that your daughter is
not at present with you in
this time of illness.
And now from our Lord. I am sending
you a flower sandalwood which I offered to Him,
with worship — My deep love
and blessing [illegible]
I love you very much [illegible]
you from my heart. [illegible]
Are you aware [illegible]
I always [illegible]
with spirit clear.
Your মা (mother)

মিসেস ওলি বুলের শেষ অসুখের সময় তাঁকে পাঠানো শ্রীশ্রীমায়ের পত্রের আলোকচিত্র। পত্রটির জবানী শ্রীশ্রীমায়ের, হাতের লেখা নিবেদিতার। পত্রের শেষে বাঙলায় 'মা' শব্দটি শ্রীশ্রীমা স্বয়ং লিখেছেন। [পত্রটি আমরা অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর সৌজন্যে পেয়েছি।]

॥ ১২ ॥

নিরুপমা দেবীকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

শ্রীশ্রীহরি

জয়রামবাটী
১৯শে শ্রাবণ, বুধবার

মা, তোমার পত্র পাইলাম। তোমরা ভাল আছ শুনে সুখী হইলাম। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। এখানের মঙ্গল। ইতি

মা

* পোস্টকার্ডটিতে হুগলী জেলার আনুড় ডাকঘর [তারিখ : 4 AUG. (19)15] এবং ওয়েলেসলি ডাকঘরের [তারিখ : 6 AUG. (19)15] ছাপ আছে।—সম্পাদক

॥ ১৩ ॥

নিরুপমা দেবীকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

শ্রীশ্রীহরি

জয়রামবাটী
৪ঠা ভাদ্র, শনিবার

পরম আশীর্বাদ।

মা, তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। এখানের সব মঙ্গল। তোমরা ভাল আছ শুনে সুখী হইলাম। ঠাকুরকে ডাকবে। ইতি

তোমাদের
মা

* পোস্টকার্ডটিতে আনুড় ডাকঘর [তারিখ অস্পষ্ট] এবং ওয়েলেসলি ডাকঘরের [তারিখ : 25 AUG. (19)15] ছাপ আছে।—সম্পাদক

॥ ১৪ ॥

নিরুপমা দেবীকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

শ্রীশ্রীহরি সহায়

৮ই আশ্বিন

পরম আশীর্বাদ।

মা, তোমার পত্র পাইয়াছি। এখানের [সব] মঙ্গল। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। ঠাকুরকে ডাকবে। তিনিই সব করবেন। ইতি

তোমাদের মাতা

কলিকাতা যাবার ঠিক নাই।

* পোস্টকার্ডটিতে আনুড় ডাকঘর [তারিখ : 28 SEP. (19)15] এবং ওয়েলেসলি ডাকঘরের [তারিখ : 29 SEP. (19)15] ছাপ আছে।—**সম্পাদক**

॥ ১৫ ॥

নিরুপমা দেবীকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

শ্রীশ্রীদুর্গামাতা

২৭শে আশ্বিন

চিরজীবেষু

বৌমা, তোমার পত্র পাইলাম। তোমরা ভাল আছ শুনিয়া সুখী হইলাম। মা, আমরা ভাল আছি এক প্রকার। রাধু ভাল আছে, তবে অসুখ সম্পূর্ণ সারে নাই। নলিনী প্রভৃতি সকলে ভাল আছে। তোমাদের কুশল দিবে। আমার আশীর্বাদ জানিবে ও সকলকে দিবে। ইতি

তোমাদের মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে আনুড় ডাকঘর [তারিখ : 15 OCT. (19)15] এবং ওয়েলেসলি ডাকঘরের [তারিখ : 17 OCT. (19)15] ছাপ আছে।—**সম্পাদক**

॥ ১৬ ॥

নিরুপমা দেবীকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

জয়রামবাটী

কল্যাণীয়া

মা নিরুপমা! তোমার পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। হেমপ্রভা বধূমাতা এখানে [?] আসিয়াছে শুনিয়া আনন্দিতা হইলাম। আশা করি ছেলেরা সকলে ভাল আছে। রাধু বেশ ভাল আছে। আমার বোধ হয় এখন যাওয়া হইবে না। নলিনী ও মাকু বেশ ভাল আছে। ইতি

আশীর্বাদিকা
মা

* পোস্টকার্ডটিতে আনুড় ডাকঘর [তারিখ : 30 OCT. (19)15] এবং ওয়েলেসলি ডাকঘরের [তারিখ : 1 NOV. (19)15] ছাপ আছে।—সম্পাদক

॥ ১৭ ॥

নিরুপমা দেবীকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

শ্রীশ্রীহরি সহায়

৫ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার

পরম আশীর্বাদ।

বৌমা, তোমার পত্র পাইলাম। হেমপ্রভার পত্রও পাইয়াছি। ভাল আছে জানিবে। আর, তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। তোমরা ভাল আছ শুনে সুখী হইলাম। এখন আমার যাওয়া হইবে নাই জানিবে। এখানের কুশল। ইতি

তোমাদের মাতা

* পোস্টকার্ডটিতে আনুড় ডাকঘর [তারিখ : 18 FEB. (19)16] এবং ওয়েলেসলি ডাকঘরের [তারিখ : 20 FEB. (19)16] ছাপ আছে।—সম্পাদক

॥ ১৮ ॥

নিরুপমা দেবীকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

শ্রীশ্রীহরি

১৮ই মাঘ, মঙ্গলবার

পরম আশীর্বাদ।

বৌমা, তোমার পত্র পাইলাম। তোমার খাম দিয়াছি, বোধ হয় পাও নাই। আর কি লিখিব, তোমরা ভাল আছ শুনে সুখী হইলাম। যখন পত্র দিবে জোড়া পোস্টকার্ড ঠিকানা দিয়ে দিবে। এখানের কুশল। তোমাদের কুশল প্রার্থনা [করি]। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

তোমাদের মাতা

* পোস্টকার্ডটিতে আনুড় ডাকঘর [তারিখ অস্পষ্ট] এবং ওয়েলেসলি ডাকঘরের [তারিখ : 4 FEB. (19)16] ছাপ আছে।—সম্পাদক

॥ ১৯ ॥

নিরুপমা দেবীকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

শ্রীশ্রীহরি

২৮শে মাঘ

পরম আশীর্বাদ।

বৌমা, তোমার পত্র পাইলাম। আমার এখন কলিকাতা যাওয়া হইবে না। তোমার ছেলেটা যেন ভাল হয়—ঠাকুরের কাছে এই প্রার্থনা। আর কি লিখিব, এখানের মঙ্গল। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

তোমাদের মা

* পোস্টকার্ডটিতে আনুড় ডাকঘর [তারিখ অস্পষ্ট] এবং ওয়েলেসলি ডাকঘরের [তারিখ : 13 FEB. (19)16] ছাপ আছে।—সম্পাদক

॥ ২০ ॥

নিরুপমা দেবীকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

শ্রীশ্রীহরি সহায়

১৪ই ফাল্গুন, শনিবার

পরম আশীর্বাদ।

বৌমা, তোমার পত্র পাইলাম। তোমার ছেলের মায়ের অনুগ্রহ ['মায়ের দয়া'—বসন্ত (Pox)] হইয়াছিল শুনে চিন্তিত হইলাম। ঠাকুর ভাল করিবেন। আর কি লিখিব। তোমার ছেলে ও তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে। এখানের কুশল। ইতি

তোমাদের মাতা

* পোস্টকার্ডটিতে আনুড় ডাকঘর [তারিখ : 26 FEB. (19)16] এবং ওয়েলেসলি ডাকঘরের [তারিখ : 28 FEB. (19)16] ছাপ আছে।—**সম্পাদক**

॥ ২১ ॥

নিরুপমা দেবীকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

জয়রামবাটী
২২শে ফাল্গুন

কল্যাণীয়াসু

মা, তোমার পত্র পাইয়াছি। উপস্থিত এখানকার কুশল। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

আশীর্বাদিকা
মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে আনুড় ডাকঘর [তারিখ : 6 MAR. (19)16] এবং ওয়েলেসলি ডাকঘরের [তারিখ : 8 MAR. (19)16] ছাপ আছে।—**সম্পাদক**

॥ ২২ ॥

নিরুপমা দেবীকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

জয়রামবাটী
৯ই চৈত্র

কল্যাণীয়াসু

মা, তোমার পত্র পাইয়াছি। নিয়মাবলী কিছুই নাই। ঠাকুরকে ডাকিবে। তিনিই ক্রমশঃ মনে শান্তি দিবেন। আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

আশীর্বাদিকা
মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে আনুড় ডাকঘর [তারিখ : 23 MAR. (19)16] এবং ওয়েলেসলি ডাকঘরের [তারিখ : 25 MAR. (19)16] ছাপ আছে।—সম্পাদক

॥ ২৩ ॥

নিরুপমা দেবীকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শরণম্

জয়রামবাটী
২০শে চৈত্র

কল্যাণীয়াসু

মা, তোমার বিপদের কথা শুনিয়া কি যে দুঃখ হলো কি জানাব। কেন যে এমন বিপদ হচ্ছে কি আর বলিব। ঠাকুর তোমাদের মঙ্গল করুন। ছেলেটিকে আমার আশীর্বাদ দিবে এবং কেমন থাকে জানাবে। এখানকার উপস্থিত কুশল। ইতি

আশীর্বাদিকা
তোমার মাতাঠাকুরানী

পুঃ তোমার প্রেরিত টাকা ২টি পেয়েছি।

* পোস্টকার্ডটিতে আনুড় ডাকঘর [তারিখ : 3 APR. (19)16] এবং ওয়েলেসলি ডাকঘরের [তারিখ : 5 APR. (19)16] ছাপ আছে।—সম্পাদক

॥ ২৪ ॥

নিরুপমা দেবীকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

শ্রীশ্রীহরি

১৫ই ভাদ্র, শুক্রবার

পরম আশীর্বাদ।

বৌমা, তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। আমি বড় ভাল নাই। আর এখানের কুশল। তোমরা কেমন আছ লিখিবে। আর কি লিখিব, রাধু ভাল আছে। ইতি

তোমাদের মা

* খামটিতে বাগবাজার ডাকঘর [তারিখ : 1 SEP. (19)16] ও ওয়েলেসলি ডাকঘরের [তারিখ : 2 SEP. (19)16] ছাপ আছে। চিঠিটি মনে হয় নলিনী-দির (শ্রীশ্রীমায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী) লেখা। কারণ, একই পৃষ্ঠায় লিখিত নলিনী-দির একটি চিঠির সঙ্গে মায়ের চিঠির হস্তাক্ষরের সুস্পষ্ট মিল রয়েছে।—সম্পাদক

নলিনী-দির চিঠি

পরমপূজনীয়া

ভাই বৌদিদি, তোমার পত্র পাইয়াছি। ফোড়া বেশ সারে নাই। মনের শান্তি নাই। আর ভাই ঠাকুর যে কতদিনেই মন ভাল করবেন জানি না। তুমি আমার ভালবাসার নমস্কার জানিবে। এখানের কুশল। পিসিমায়ের আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

নলিনী

॥ ২৫ ॥

নিরুপমা দেবীকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ

কলিকাতা
রবিবার

কল্যাণীয়াসু

মা, তোমার পত্র পেয়ে বিস্তারিত অবগত হলাম। তোমার অসুখ ইত্যাদির কথা শুনে দুঃখিত হলাম। এবার মঠে প্রতিমা করে মার

পূজা হবে। আমি আগামীকল্য সোমবার বিকালে মঠে যাইব ইচ্ছা আছে। পূজার কয়দিন সেখানেই থাকিব। বোধ [হয়] একাদশীর দিন ফিরিব। সুবিধা হয় তো একদিন যেতে পার। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। হেমপ্রভার পত্রখানাও পেয়েছি। মঠে এ-কয়দিন খুব ভিড় হবে। শরীর অসুস্থ থাকিলে যেও না। আমার শরীর একপ্রকার। পাগলী, রাধু ইত্যাদি এখানকার সকলে ভাল। ইতি

আঃ

তোমাদের মা

* পোস্টকার্ডটিতে বাগবাজার ডাকঘর [তারিখ : 2 OCT. (19)15] এবং ওয়েলেসলি ডাকঘরের [একই তারিখের] ছাপ আছে।—সম্পাদক

॥ ২৬ ॥

নিরুপমা দেবীকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

ওঁ

রবিবার

কল্যাণীয়াসু

মা, তোমার পত্র পেয়ে সন্তোষলাভ করিলাম। সুবিধামত যখন হয় আসিবে। নলিনী আজ কাশী যাচ্ছে। ৭।৮ [দিন] পরে ফিরিবে। আমার শরীর ভাল। রাধু এবং অন্যান্য সকলে ভাল। তোমাদের কুশল জানাবে। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

আঃ

তোমার মা

* পোস্টকার্ডটিতে বাগবাজার ডাকঘর [তারিখ : 24 DEC. (19)16] এবং ওয়েলেসলি ডাকঘরের [তারিখ : 25 DEC. (19)16] ছাপ আছে।—সম্পাদক

॥ ২৭ ॥

নিরুপমা দেবীকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

ওঁ

কলিকাতা

কল্যাণীয়াসু

মা, তোমার পত্রখানা পেয়ে বড় দুঃখিত এবং চিন্তিত হইলাম। হেমপ্রভা কিরূপ থাকে জানাবে। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। রাধুর আবার অসুখ হয়েছে। তাহার জন্যও ব্যস্ত হয়েছি। এখানকার অন্যান্য সকলে ভাল। তোমাদের কুশল লিখিবে। ইতি

আঃ

তোমার মা

* পোস্টকার্ডটিতে বাগবাজার ডাকঘর [তারিখ : 6 JAN. (19)17] এবং ওয়েলেসলি ডাকঘরের [একই তারিখের] ছাপ আছে।—**সম্পাদক**

॥ ২৮ ॥

নিরুপমা দেবীকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

জয়রামবাটী

মা নিরুপমা,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। এ ভীষণ গ্রীষ্মে ছেলেপিলে লইয়া না আসিয়া ভাল কাজ করিয়াছ। আসিলে বড় কষ্ট হইত। হেমপ্রভার ছেলে দুটি ভাল আছে শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম। আমি ভাল আছি। তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

আশীর্বাদিকা

তোমার মা

* পোস্টকার্ডটিতে আনুড় ডাকঘর [তারিখ : 5 JUN. (19)17] এবং ওয়েলেসলি ডাকঘরের [তারিখ : 7 JUN. (19)17] ছাপ আছে।—**সম্পাদক**

॥ ২৯ ॥

নিরুপমা দেবীকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

শ্রীশ্রীগুরুদেব

জয়রামবাটী
১৩২৪...

আশিস অন্তে সমাচার—

মা, তোমার পত্রখানা পাইলাম। আমার শরীর এখন সুন্দররূপে ভাল হইয়াছে।

তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে।

আশীঃ
তোমার মাতাঠাকুরানী

* চিঠিটিতে আনুড় ডাকঘর [তারিখ : 31 JAN. (19)18] এবং ওয়েলেসলি ডাকঘরের [তারিখ : 2 FEB. (19)18] ছাপ আছে।—সম্পাদক

॥ ৩০ ॥

নিরুপমা দেবীকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

শ্রীশ্রীহরি

জয়রামবাটী
২০শে ফাল্গুন

কল্যাণীয়াসু

তোমার পত্র পাইয়াছি। আমার শরীর বড় দুর্বল। বাকি সকলে ভাল আছে। আশাকরি তোমরা সকলে ভাল আছ। কলিকাতা যাইবার ঠিক নাই। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

আশীর্বাদিকা
মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে ওয়েলেসলি ডাকঘরের [তারিখ : 6 MAR. (19)18] ছাপ আছে। অপর ডাকঘরের ছাপ অস্পষ্ট।—সম্পাদক

॥ ৩১ ॥

নিরুপমা দেবীকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শরণম

শ্রীশ্রীজগদম্বা আশ্রম
কোয়ালপাড়া
কোতুলপুর পোঃ
বাঁকুড়া জেলা

কল্যাণবরেষু

তোমার পত্র পাইয়া লিখিত সমাচার জ্ঞাত হইলাম। শ্রীমতী রাধারানী কিছু ভাল আছে। আমি ভাল আছি। তোমরা কেমন আছ। বাকি সকলে ভাল আছে। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

আঃ
তোমার মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে কোতুলপুর ডাকঘর [তারিখ : ৪ MAR. (19)18] এবং ক্যামাক স্ট্রীট ডাকঘরের [তারিখ অস্পষ্ট] ছাপ আছে।—সম্পাদক

॥ ৩২ ॥

নিরুপমা দেবীকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শরণম্

শ্রীশ্রীজগদম্বা আশ্রম
কোয়ালপাড়া
কোতুলপুর পোঃ
বাঁকুড়া জেলা
১লা চৈত্র ১৩২৫

কল্যাণবরেষু

তোমার পত্র পাইলাম। আমি কখন জয়রামবাটী যাইব তাহার

স্থিরতা নাই। রাধারানী পূর্ববৎই আছে। আমি ভাল আছি। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। বাকি মঙ্গল। তোমাদের মঙ্গলাদি লিখিবে। ইতি

আঃ
তোমার মাতাঠাকুরানী

• পোস্টকার্ডটিতে ক্যামাক স্ট্রীট ডাকঘর [তারিখ : 16 MAR. (19)18] এবং কোতুলপুর ডাকঘরের [তারিখ অস্পষ্ট] ছাপ আছে।—সম্পাদক

॥ ৩৩ ॥

নিরুপমা দেবীকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

শ্রীহরি শরণম্

কলিকাতা
১২ই জ্যৈষ্ঠ

কল্যাণীয়াসু

মা, তোমার পত্র পাইয়াছি। আমি অন্নপথ্য করিয়াছি। দুর্বলতা রয়েছে। কবিরাজী চিকিৎসা চলছে। ৭।৮ দিন পরে চিঠি লিখিয়া জানিও। অন্যান্য কুশল। আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

আশীর্বাদিকা
তোমার মাতাঠাকুরানী

• পোস্টকার্ডটিতে বাগবাজার ডাকঘর [তারিখ : 26 MAY (19)18] এবং ওয়েলেসলি ডাকঘরের [তারিখ : 27 MAY (19)18] ছাপ আছে।—সম্পাদক

॥ ৩৪ ॥

নিরুপমা দেবীকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শরণম্

বাগবাজার
৩।৬।(১৯)১৮

কল্যাণীয়াসু

আমার আবার জ্বর হয়েছিল। ৬ দিন পরে গতকল্য অন্নপথ্য করিয়াছি। তুমি একদিন (৩।৪ দিন পরে) বৈকালে আসিয়া দর্শন করিতে পার। আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

আশীর্বাদিকা
তোমার মাতাঠাকুরানী

চিঠির শেষে শ্রীশ্রীমায়ের সেবক রাসবিহারী মহারাজের (স্বামী অরূপানন্দ) নির্দেশ

যাতায়াতের গাড়ি করিবেন। ৮।১০ মিনিট মাত্র দর্শন করিতে পাইবেন। ইতি

রাসবিহারী

* পোস্টকার্ডটিতে বাগবাজার ডাকঘর [তারিখ : 4 JUN. (19)18] এবং ওয়েলেসলি ডাকঘরের [একই তারিখের] ছাপ আছে।—**সম্পাদক**

॥ ৩৫ ॥

নিরুপমা দেবীকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

২৯।৭।(১৯)১৮

কল্যাণীয়াসু

মা, তোমার পত্র পাইয়াছি। এখানেও দু-একজন বাদে বাকি সকলের জ্বর হয়েছে। গোলাপ [গোলাপ-মা] খুব রক্তামাশয়ে ভুগছে।

বাবুরাম মহারাজকে [স্বামী প্রেমানন্দ] কলিকাতা আনা হয়েছে। তার অবস্থা বড়ই খারাপ। আমি একপ্রকার ভাল আছি। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

আশীর্বাদিকা
তোমার মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে বাগবাজার ডাকঘর [তারিখ : 29 JUL. (19)18] এবং ওয়েলেসলি ডাকঘরেব [তারিখ : 30 JUL. (19)18] ছাপ আছে।—সম্পাদক

॥ ৩৬ ॥

নিরুপমা দেবীকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

কলিকাতা
৬।৮।(১৯)১৮

কল্যাণীয়াসু

মা, তোমার পত্র পাইয়াছি। বাবুরামের জন্য সকলেরই মনে কষ্ট।[১] ঠাকুরের যেমন ইচ্ছা তেমনই হইতেছে। গোলাপ অনেকটা সারিয়াছে। তবে এখনও ভালমত সারে নাই। আমি শারীরিক একপ্রকার ভাল আছি। মেয়েরাও ভাল আছে। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

আশীর্বাদিকা
মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে বড়বাজার ডাকঘর [তারিখ : 6 AUG. (19)18] এবং ওয়েলেসলি ডাকঘরের [তারিখ : 7 AUG. (19)18] ছাপ আছে।—সম্পাদক

১ ৩০ জুলাই ১৯১৮ বাবুরাম মহারাজ বলরাম-মন্দিরে দেহত্যাগ করেন।—সম্পাদক

॥ ৩৭ ॥

নিরুপমা দেবীকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

উদ্বোধন অফিস
৩।১০।(১৯)১৮

কল্যাণীয়াসু

মা, তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমার মেয়েটি[র] অসুখ নিয়ে ব্যস্ত আছ। তা যখন সুবিধা হয় আসবে। বেলুড় মঠে দুর্গোৎসব হইবার কথা হচ্ছে। তিন-চার দিন মধ্যে ঠিক হইবে। আমরা একপ্রকার ভাল আছি। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

আশীর্বাদিকা
তোমার মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে বাগবাজার ডাকঘর [তারিখ : 3 OCT. (19)18] এবং ওয়েলেসলি ডাকঘরের [তারিখ : 4 OCT. (19)18] ছাপ আছে।—**সম্পাদক**

॥ ৩৮ ॥

নিরুপমা দেবীকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপদভরসা

কলিকাতা

কল্যাণীয়া

মা, তোমার পত্র পেলাম। তোমাদের সব অসুখ শুনে চিন্তিত হইলাম। তোমার শরীর এবং ছেলেরা এখন উপস্থিত কেমন আছে লিখো। এখানের একপ্রকার মঙ্গল জানিও। আমি ভালই আছি। আমার আশীর্বাদ জানিও। ছেলেদের আশীর্বাদ জানাইও। আমি ভাল আছি জানিও। ইতি

তোমাদের মা

* পোস্টকার্ডটিতে বাগবাজার ডাকঘর [তারিখ : 26 NOV. (19)18] এবং ওয়েলেসলি ডাকঘরের [তারিখ : 27 NOV. (19)18] ছাপ আছে।—**সম্পাদক**

॥ ৩৯ ॥

নিরুপমা দেবীকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপদভরসা

কলিকাতা

কল্যাণীয়া

মা, তোমার চিঠি পেয়েছি। ছেলেরা এখনো সারে নাই। তোমার শরীর ভাল নাই শুনে চিন্তিত রহিলাম। সকলে কেমন আছ লিখো। মা, সংসারে ছেলেদের নিয়ে থাক, কি আর করিবে, যখন সুবিধা হবে [তখন জপাদি] কোরো। তাহাতে দোষ নাই। আমি কি তোমাদের অপরাধ নিতে পারি? এখানের মঙ্গল জানিও। আমার আশীর্বাদ জানিও। এখানের মঙ্গল। ইতি

তোমাদের মা

* পোস্টকার্ডটিতে বাগবাজার ডাকঘর [তারিখ : 5 DEC. (19)18] এবং ওয়েলেসলি ডাকঘরের [তারিখ : 6 DEC. (19)18] ছাপ আছে।—সম্পাদক

॥ ৪০ ॥

নিরুপমা দেবীকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপদভরসা

কলিকাতা

কল্যাণীয়া

মা, তোমার পত্র পেয়েছি। তোমার ছেলেদের শরীর এখনো সারে নাই, মেয়েটির কথা শুনে চিন্তিত হইলাম। ঠাকুর রক্ষা করিবেন। ভয় নাই মা, ভেবো না। তোমাদের কুশল মধ্যে মধ্যে দিও। এখানের মঙ্গল জানিও। তোমরা দুইজনে আমার স্নেহ আশীর্বাদ জানিও। মেয়েটিকে আশীর্বাদ করিতেছি শীঘ্র যেন আরোগ্য হয়। অধিক আর কি লিখিব? এখানের মঙ্গল। তোমাদের কুশল দিও। ইতি

তোমাদের মা

* পোস্টকার্ডটিতে বাগবাজার ডাকঘর [তারিখ : 23 DEC. (19)18] এবং ওয়েলেসলি ডাকঘরের [একই তারিখের] ছাপ আছে।—সম্পাদক

॥ ৪১ ॥

নিরুপমা দেবীকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

উদ্বোধন অফিস
কলিকাতা
৭।১।(১৯)১৯

কল্যাণীয়া

মা, তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি ঠাকুরকে ডাক। তিনিই বিপদের কাণ্ডারী। তোমরা সকলে আমার আশীর্বাদ জানিবে। এখানকার একপ্রকার কুশল। ইতি

আশীর্বাদিকা
তোমার মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে বাগবাজার ডাকঘর [তারিখ : 7 JAN. (19)19] এবং ক্যামাক স্ট্রীট ডাকঘরের [তারিখ : ৪ JAN. (19)19] ছাপ আছে।—সম্পাদক

॥ ৪২ ॥

নিরুপমা দেবীকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শরণম্

শ্রীশ্রীজগদম্বা আশ্রম
কোয়ালপাড়া
কোতুলপুর পোঃ
বাঁকুড়া জেলা
২৯শে চৈত্র ১৩২৫

কল্যাণবরেষু

তোমার পত্রখান পাইলাম। তোমরা সকলে শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় আরোগ্য লাভ করিয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। আমি উপস্থিত ভাল

আছি। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। বাকি মঙ্গল। তোমাদের মঙ্গলাদি লিখিও। ইতি

আঃ
তোমার মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে কোতুলপুর ডাকঘর [তারিখ : 13 APR. (19)19] এবং ক্যামাক স্ট্রীট ডাকঘরের [তারিখ : 15 APR. (19)19] ছাপ আছে।—সম্পাদক

॥ ৪৩ ॥

নিরুপমা দেবীকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শরণম্

শ্রীশ্রীজগদম্বা আশ্রম
কোয়ালপাড়া
কোতুলপুর পোঃ
বাঁকুড়া জেলা
৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

কল্যাণবরেষু

তোমার পত্রখান পাইলাম। আমি উপস্থিত ভাল আছি। শ্রীমতী রাধারানী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে এবং পূর্বাপেক্ষা ভাল আছে। তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে। বাকি মঙ্গল। ইতি

আঃ
তোমার মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে কোতুলপুর ডাকঘরের [তারিখ : 20 MAY (19)19] ছাপ আছে। অপর ডাকঘরের কোন ছাপ নেই।—সম্পাদক

॥ ৪৪ ॥

নিরুপমা দেবীকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শরণম্

শ্রীশ্রীজগদম্বা আশ্রম
কোয়ালপাড়া
কোতুলপুর

কল্যাণবরেষু

তোমার পত্রখানি পাইলাম। আমি উপস্থিত ভাল আছি। শ্রীমতী রাধারানীর পুত্রটি ভাল আছে। তবে রাধারানীর শরীর এখনও সারে নাই। এখানেও অত্যন্ত গরম পড়িয়াছে। তোমরা কেমন আছ। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। বাকি মঙ্গল। ইতি

আঃ
তোমার মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে কোতুলপুর ডাকঘর [তারিখ : 1 JUN. (19)19] এবং ক্যামাক স্ট্রীট ডাকঘরের [তারিখ : 2 JUN. (19)19] ছাপ আছে।—**সম্পাদক**

॥ ৪৫ ॥

নিরুপমা দেবীকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

শ্রীশ্রীহরিপদভরসা

জগদম্বা আশ্রম
রবিবার

কল্যাণীয়া

মা, তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। রাধু এখন পূর্বাপেক্ষা অনেকটা ভাল আছে। তার ছেলে ভাল আছে। আমার শরীর এখন ভাল

আছে। আশ্রমের সকলে ভাল আছে। আশা করি তুমি কুশলে আছ। তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

আশীর্বাদিকা
তোমার মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে কোতুলপুর ডাকঘর [তারিখ : 23 JUN. (19)19] এবং ক্যামাক স্ট্রীট ডাকঘরের [তারিখ : 24 JUN. (19)19] ছাপ আছে।—সম্পাদক

॥ ৪৬ ॥

নিরুপমা দেবীকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শরণম্

শ্রীশ্রীজগদম্বা আশ্রম
কোয়ালপাড়া
কোতুলপুর পোঃ
বাঁকুড়া জেলা
২০শে আষাঢ় ১৩২৬

কল্যাণবরেষু

তোমার পত্রখানা পাইলাম। আমি একপ্রকার ভাল আছি। শ্রীমতী রাধারানী একপ্রকার আছে। তাহার ছেলেটি ভাল আছে। তোমরা কেমন আছ ও আমার আশীর্বাদ জানিবে। বাকি মঙ্গল। ইতি

আঃ
তোমার মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে কোতুলপুর ডাকঘর [তারিখ : 6 JUL. (19)19] এবং ক্যামাক স্ট্রীট ডাকঘরের [তারিখ : 7 JUL. (19)19] ছাপ আছে।—সম্পাদক

॥ ৪৭ ॥

নিরুপমা দেবীকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

শ্রীশ্রীহরি শরণম্

জয়রামবাটী
৪ঠা মাঘ

কল্যাণীয়া

মা, তোমার পত্রখানি পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তোমার অসুখ হইয়াছিল এবং এখন অর্শ প্রভৃতিতে কষ্ট পাইতেছ জানিয়া দুঃখিত হইলাম। আমি উপস্থিত একপ্রকার ভাল আছি। মাকুর আজ ৫।৬ দিন হইল জ্বর হইয়াছে। বাকি সকলে একপ্রকার ভাল আছে। তোমরা সকলে আমার আশীর্বাদ জানিবে। বাকি মঙ্গল। ইতি

আঃ
মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে নবিনগর (ত্রিপুরা) ডাকঘর [তারিখ : 22 JAN. (19)20] এবং দেশড়া (বাঁকুড়া) ডাকঘরের [তারিখ : 19 JAN. (19)20] ছাপ আছে। পত্রপ্রাপকের ঠিকানা—পোঃ নবিনগর, শ্রীযুত সাব-রেজিস্ট্রার বাবুর বাসা, ত্রিপুরা।—**সম্পাদক**

॥ ৪৮ ॥

নিরুপমা দেবীকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

শ্রীশ্রীহরি শরণম্

জয়রামবাটী
দেশড়া, বাঁকুড়া
১৬ই মাঘ ১৩২৬

কল্যাণবরেষু

মা, তোমার পত্র পেয়ে সুখী হইলাম। আমার শরীর বর্তমানে ভাল নাই। দিন চারি হইল একটু একটু জ্বর হয়। কবিরাজী ঔষধ ব্যবহার

করিতেছি। রাধু ইত্যাদি সকলে একপ্রকার অনেকটা কুশলে আছে। তোমার অসুখ শুনে বড়ই দুঃখিত হইলাম। আশা করি বর্তমানে তোমরা কুশলে আছ। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

আঃ
তোমাদের মাতাঠাকুরানী

• পোস্টকার্ডটিতে দেশড়া ডাকঘর [তারিখ অস্পষ্ট] এবং নবিনগর [ত্রিপুরা] ডাকঘরের [তারিখ : 3 FEB. (19)20] ছাপ আছে। পোস্টকার্ডের অপর পৃষ্ঠায় নিরুপমা দেবীকে লেখা ব্রহ্মচারী জ্যোতিপ্রকাশের একটি ছোট চিঠি আছে।—সম্পাদক

[নিরুপমা দেবীর পরিবারের কাছ থেকে আমরা শ্রীশ্রীমায়ের যেসব চিঠি পেয়েছি তার মধ্যে ওপরের চিঠিটিই শ্রীশ্রীমায়ের সর্বশেষ চিঠি। এরপরে বরদা মহারাজ (শ্রীশ্রীমায়ের অন্যতম সেবক স্বামী ঈশানানন্দ) নিরুপমা দেবীকে ২৪শে আষাঢ় ১৩২৭ তারিখে একটি চিঠি দেন। সেই সময় মায়ের অসুস্থতা চূড়ান্ত পর্যায়ে। এর বারদিন পর শ্রীশ্রীমা লীলা সংবরণ করেন। বরদা মহারাজের চিঠিটি নিচে দেওয়া হলো।—সম্পাদক]

শ্রীশ্রীহরি শরণম্

কলিকাতা
২৪শে আষাঢ় ১৩২৭

শ্রীশ্রীমার অবস্থা পূর্ব্ববৎ আছে, কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই দৈনিক ২ বার করিয়া জ্বর আসিতেছে। পেটের ও পায়ের ফুলা কিছু কমিয়াছে। এই অষ্টমী একাদশী না কাটিলে কিছু বুঝা যাইবে না। অধিক আর কি লিখিব? বাকি মঙ্গল। ইতি

বরদা

• পোস্টকার্ডটিতে বাগবাজার ডাকঘর [তারিখ : 8 JUL. (19)20] এবং বহরমপুর ডাকঘরের [তারিখ : 9 JUL. (19)20] ছাপ আছে।—সম্পাদক

॥ ৪৯ ॥

নিশিকান্ত মজুমদারকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

জয়রামবাটী
৯ই শ্রাবণ

কল্যাণবরেষু

বাবাজীবন, তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। অত্রস্থ একপ্রকার কুশল। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

আশীর্বাদিকা
মাতাঠাকুরানী

* ডাকঘরের ছাপ পাওয়া যায়নি। নিশিকান্ত মজুমদারকে লেখা শ্রীশ্রীমায়ের ১০টি চিঠি বর্তমান খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। চিঠিগুলি আমরা পেয়েছি নিশিকান্ত মজুমদারের একমাত্র কন্যা বীণা দাশের (ঠিকানা : সুরেন্দ্রকুমার বসু রোড, কৃষ্ণনগর, জেলা—নদীয়া) সৌজন্যে। শৈশবে বাবা-মায়ের সঙ্গে শ্রীশ্রীমাকে দর্শনের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। গত ২৭ জানুয়ারি ১৯৯৩ ৮৭ বছর বয়সে বীণা দাশ পরলোকগমন করেন। নিশিকান্ত মজুমদার সস্ত্রীক (স্ত্রীর নাম সন্তোষবালা মজুমদার) শ্রীশ্রীমায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেছিলেন।—সম্পাদক

॥ ৫০ ॥

নিশিকান্ত মজুমদারকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

শ্রীশ্রীহরি

জয়রামবাটী
৩২শে শ্রাবণ

পরে তোমাদের পত্র পাইয়াছি। এখন কলিকাতা যাওয়া হইবে না। আর তোমরা ভাল [আছ] শুনে সুখী হইলাম। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। এখানের মঙ্গল। ইতি

তোমাদের মা

* ডাকঘরের ছাপ পাওয়া যায়নি।—সম্পাদক

॥ ৫১ ॥

নিশিকান্ত মজুমদারকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

জয়রামবাটী
সোমবার

কল্যাণবরেষু

পরে বাবা, আমার আশীর্বাদ জানিবে। আমার অসুখ করিয়াছিল, এখন ভাল আছি। কহিল এখনও সারে নাই। ঠাকুরের কৃপায় তোমার মনের ময়লা দূর হইয়া যাইবে। একমনে তাঁকেই ডাক। আমার আশীর্বাদ জানিবে। কলিকাতা আশ্বিন মাস নাগাদ যাইব। পরে ঠাকুরের ইচ্ছা। তোমাদের মঙ্গল হউক। ইতি

আশীর্বাদিকা
তোমাদের মা

* ডাকঘরের ছাপ পাওয়া যায়নি।—সম্পাদক

॥ ৫২ ॥

নিশিকান্ত মজুমদারকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

শ্রীশ্রীদুর্গা

UDBODHAN OFFICE
12, 13, Gopal Chandra Neogi Lane
Bagbazar P.O., CALCUTTA
১৮ই ভাদ্র, বুধবার

পরম কল্যাণীয় বাবাজীবন,

তোমরা ভালয় ভালয় পৌঁছেছ শুনিয়া সুখী হইলাম। সুধীরার খুব কষ্ট হইয়াছে শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। যাহা হউক, ভালয় ভালয়

পৌঁছে গিয়াছ। ঠাকুরের কৃপায় এ বাটীর মঙ্গল। ওখানকার সকলে ভাল আছে শুনিয়া সুখী হইলাম। এখানে তোমার এখন আসিবার দরকার নাই। এখন সব বড় কষ্ট, এখন এখানে আসিবার দরকার নাই। আমি কলিকাতা যাইব যখন তখন সব যাবে। আর অধিক কি লিখিব? আমি এখন উপস্থিত ভাল আছি। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী

* যদিও পত্রটি উদ্বোধন অফিসের ছাপানো কার্ডে লেখা, কিন্তু কলকাতা থেকে এটি লেখা হয়নি—লেখা হয়েছে জয়রামবাটী থেকে। কারণ, পোস্টকার্ডে আনুড় ডাকঘরের [তারিখ : 3 SEP. (19)13] ছাপ আছে। পোস্টকার্ডটিতে অপর যে-ডাকঘরের ছাপ আছে সেটি রাঁচি সেক্রেটারিয়েটের [তারিখ : 6 SEP. (19)13]। পত্রপ্রাপক নিশিকান্ত মজুমদারের ঠিকানা—বি ২১, ডুরাণ্ডা, রাঁচি সেক্রেটারিয়েট।—সম্পাদক

॥ ৫৩ ॥

নিশিকান্ত মজুমদারকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

শ্রীশ্রীহরি

জয়রামবাটী
৮ই আশ্বিন ১৩২০

কল্যাণীয়েষু

পরম শুভাশীর্বাদ বিশেষ।

তোমার পত্র যথাসময়েই পাইয়াছি। এখানে সকলই ভাল। তুমি পূজার পর কলিকাতায় যাইবে। আমার শরীর মন্দ নয়, এখন ভালই আছি। এখন আমার আশীর্বাদ লইবে। ইতি

আঃ তোমার
মাতাঠাকুরানী

* ডাকঘরের ছাপ পাওয়া যায়নি।—সম্পাদক

॥ ৫৪ ॥

নিশিকান্ত মজুমদারকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

শ্রীশ্রীহরি

৬ই অগ্রহায়ণ
সোমবার

পরম আশীর্বাদ।

পরে বাবাজীবন, তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। ঠাকুরকে ডাকিবে, তিনিই সব করিবেন। এখানের মঙ্গল। ইতি

তোমাদের
মা

* পোস্টকার্ডটি স্টীলের ফ্রেমে সযত্নে বাঁধানো থাকায় উলটোদিকে ডাকঘরের ডেট-স্ট্যাম্প পাওয়া যায়নি। নিশিকান্ত মজুমদারের একমাত্র কন্যা বীণা দাশের কাছে জানা গিয়েছে যে, তাঁর বাবা-মা বলতেন, এই চিঠিখানি শ্রীশ্রীমায়ের স্বহস্তে লিখিত। সেজন্য চিঠিটিকে তাঁরা বাঁধিয়ে সযত্নে আজীবন সংরক্ষণ করেছেন। চিঠিটির ফটোকপি বর্তমান খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। (চিত্রসূচি দ্রষ্টব্য)—সম্পাদক

॥ ৫৫ ॥

নিশিকান্ত মজুমদারকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

শ্রীশ্রীদুর্গা

UDBODHAN OFFICE
12, 13 Gopal Chandra Neogi Lane
Bagbazar P.O., CALCUTTA
৩রা পৌষ, বৃহস্পতিবার

পরম কল্যাণীয়

বাবাজীবন, তোমার একখান পত্র পাইয়াছি। তোমার মনের অবস্থা

খারাপ। মন হলো মত্ত হস্তী। মনকে বিচার করে ফিরিয়ে আনবে, ঠাকুরকে ডাকবে। মনের [এরূপ] অবস্থা সকলকারেই হয়ে থাকে। এখানকার মঙ্গল। আমার শরীর ভাল নয়, আবার মন্দ নয়—একরকম আছি। রাধু এখন উপস্থিত ভাল আছে। আর আর ভাল। আর অধিক কি লিখিব। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে এবং ছেলেদের সকলকে আশীর্বাদ দিবে। ইতি

তোমার মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে বাগবাজার ডাকঘর [তারিখ : 18 DEC. (19)13] এবং রাঁচি সেক্রেটারিয়েট ডাকঘরের [তারিখ : 19 DEC. (19)13] ছাপ আছে।—সম্পাদক

॥ ৫৬ ॥

নিশিকান্ত মজুমদারকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

উদ্বোধন কার্যালয়
১২, ১৩ নং গোপালচন্দ্র নিয়োগী লেন
বাগবাজার পোঃ, কলিকাতা
২৮শে মাঘ

কল্যাণবরেষু

বাবাজীবন, তোমার পত্রে সব জ্ঞাত হইলাম। ঠাকুরকে ডাক। তাঁর কৃপায় ক্রমে সব হয়। পূর্বে মুনিঋষিরা কত যুগযুগান্ত ধরে তপস্যা করেছেন ত্যাগলাভের জন্য। তাই আবার তাদের কত কি বিঘ্ন হয়েছে। এখন তবু আমাদের ঠাকুর জ্বলন্ত রয়েছেন। তাই সকলের ঝা-ঝা করে ত্যাগ হয়ে যাচ্ছে! এক মুহূর্তেই কি ফস করে হয়? তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে। অত্রস্থ সব কুশল। ইতি

আশীর্বাদিকা
তোমার মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে বাগবাজার ডাকঘর [তারিখ অস্পষ্ট] এবং রাঁচি সেক্রেটারিয়েট ডাকঘরের [তারিখ : 11 FEB. (19)14] ছাপ আছে।—সম্পাদক

॥ ৫৭ ॥

নিশিকান্ত মজুমদারকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

জয় মা

জয়রামবাটী
২১শে চৈত্র

কল্যাণবরেষু

তোমার নিরাপদে পৌঁছানোর সংবাদ পাইয়া সুখী হইলাম। আমি ও রাধু ভাল আছি। তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

আশীর্বাদিকা
তোমার মা

* পোস্টকার্ডটিতে আনুড় ডাকঘর [তারিখ : 3 APR. (19)17] এবং হাটখোলা ডাকঘরের [5 APR (19)17] ছাপ আছে। এই পত্রে পত্রপ্রাপকের ঠিকানা—৩০/১, বনমালী সরকার স্ট্রীট, কলকাতা।

॥ ৫৮ ॥

নিশিকান্ত মজুমদারকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

শ্রীশ্রীহরি শরণম্

জয়রামবাটী
২৪।৬।(১৩)২৬

পরম কল্যাণীয়

বাবাজীবন, তোমার প্রেরিত কাপড় ও ২ টাকা পাইয়াছি। আমি শারীরিক ভাল আছি। তোমরা সকলে আমার আশীর্বাদ জানিবে। বাকি মঙ্গল। ইতি

আঃ
মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে দেশড়া ডাকঘর [তারিখ : 13 OCT. (19)19] এবং সিমলা ডাকঘরের [তারিখ : 14 OCT. (19)19] ছাপ আছে। পত্রপ্রাপকের ঠিকানা—৫৫, মধু রায় লেন, সিমলা পোঃ, কলিকাতা—সম্পাদক

॥ ৫৯ ॥

উপেন্দ্রচন্দ্র রায়কে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

শ্রীশ্রী...

কল্যাণবরেষু

বাবাজীবন, তোমার প্রেরিত ৫ টাকার মনি অর্ডার আমি পাইয়াছি। আজ কয়েক দিবস হইল আমার জ্বর হইয়াছে। ভাল আছি। এখনও অন্ন পথ্য হয় নাই। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

আশীর্বাদিকা

তোমাদের মা

* পোস্টকার্ডটিতে রাঁচি সেক্রেটারিয়েট ডাকঘর [তারিখ : 12 APR. (19)19] এবং কোতুলপুর ডাকঘরের [তারিখ অস্পষ্ট] ছাপ আছে। পোস্টকার্ডে পত্রপ্রাপকের ঠিকানা—বি২১, ডুরান্ডা, রাঁচি সেক্রেটারিয়েট, রাঁচি। উপেন্দ্রচন্দ্র রায়ের চিঠিগুলি তাঁর পুত্র সারদারঞ্জন রায়ের সৌজন্যে পেয়েছি।—**সম্পাদক**

॥ ৬০ ॥

উপেন্দ্রচন্দ্র রায়কে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

জয়রামবাটী
পোঃ দেশড়া
২৯শে শ্রাবণ

পরম শুভাশীর্বাদ বিশেষ

বাবাজীবন, তোমার প্রেরিত ৫ টাকা পাইয়াছি। আমি ভাল আছি। তোমরা সকলে আমার আশীর্বাদ জানিবে। আশাকরি তোমরা সকলে ভাল আছ। বাকি মঙ্গল। ইতি

আশীর্বাদিকা

মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে দেশড়া ডাকঘর [তারিখ : 15 AUG. (19)19] এবং রাঁচি সেক্রেটারিয়েট ডাকঘরের [তারিখ : 16 AUG. (19)19] ছাপ আছে।—**সম্পাদক**

॥ ৬১ ॥

উপেন্দ্রচন্দ্র রায়কে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

জয়রামবাটী
২৪শে কার্ত্তিক ১৩২৬

কল্যাণবরেষু

পরম শুভাশীর্বাদ বিশেষ পরে বাবাজীবন, তোমার প্রেরিত ৪ (চারি) টাকা পাইয়াছি। আমার জ্বর হইয়াছিল, উপস্থিত পথ্য করিয়া ভাল আছি। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। বাকি মঙ্গল। ইতি

আশীর্বাদিকা
তোমার মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে রাঁচি সেক্রেটারিয়েট ডাকঘর [তারিখ : 11 NOV. (19)19] এবং দেশড়া ডাকঘরের [তারিখ অস্পষ্ট] ছাপ আছে।—সম্পাদক

॥ ৬২ ॥

উপেন্দ্রচন্দ্র রায়কে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

কলিকাতা
২৭শে ফাল্গুন

কল্যাণবরেষু

বাবাজীবন, তোমার প্রেরিত ৩ টাকা পাইলাম। আজ ১৩ দিন হয় কলিকাতা এসেছি। শরীর ভাল নয়। বৈকালে একটু একটু জ্বর হয়। ম্যালেরিয়া। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

আশীর্বাদিকা
মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে পাটনা ডাকঘরের [তারিখ : 11 MAR. (19)20] ছাপ আছে। অপর ডাকঘরের ছাপ অস্পষ্ট। পোস্টকার্ডে পত্রপ্রাপকের ঠিকানা—No. 1, 18th Street, Gardani Bagh, Patna।—সম্পাদক

॥ ৬৩ ॥

উপেন্দ্রচন্দ্র রায়কে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্

কলিকাতা
২রা বৈশাখ

কল্যাণবরেষু

বাবাজীবন, আমার এখন জ্বর হইতেছে। শরীর খুব দুর্বল, ডাক্তারী ঔষধ খাইতেছি। তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে। তোমার প্রেরিত ৩ টাকা পাইয়াছি। ইতি

আশীর্বাদিকা
মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে সালের উল্লেখ নেই। ডাকঘরের ছাপ অস্পষ্ট। পত্রটি পাটনায় প্রেরিত হয়েছিল।—সম্পাদক

॥ ৬৪ ॥

উপেন্দ্রচন্দ্র রায়কে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

কল্যাণবরেষু

বাবাজীবন, তোমার প্রেরিত ৫ পাঁচ টাকা মনি অর্ডারখানি পাইয়াছি। গত ৭ই মে রাত্রে শ্রীমতী রাধারানী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে।

সন্তান ও প্রসূতি ভাল আছে। আমি একরূপ আছি। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

আশীর্বাদিকা
"তোমাদের মা"

* পোস্টকার্ডটিতে রাঁচি সেক্রেটারিয়েট ডাকঘরের [তারিখ : 10 MAY] ছাপ আছে, কিন্তু সাল অস্পষ্ট। অপর ডাকঘরের ছাপও অস্পষ্ট।—সম্পাদক

॥ ৬৫ ॥

উপেন্দ্রচন্দ্র রায়কে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

শ্রীশ্রীহরি শরণম্

পরম শুভাশীর্বাদ বিশেষ

বাবাজীবন, তোমার প্রেরিত ৫ টাকা পাইয়াছি। আমি একপ্রকার ভাল আছি। রাধু বড় দুর্বল, সেইজন্য এখনও দাঁড়াইতে পারে নাই। খোকা প্রভৃতি অন্যান্য সকলে ভাল আছে।

তোমরা সকলে আমার আশীর্বাদ জানিবে। আশাকরি তোমরা সকলে ভাল আছ। বাকি মঙ্গল। ইতি

আশীর্বাদিকা
মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে ডাকঘরের ছাপ অস্পষ্ট। পত্রটি রাঁচিতে প্রেরিত হয়েছিল।—সম্পাদক

॥ ৬৬ ॥

রাজবালা সেনগুপ্তকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

জয়রামবাটী
আনুড় পোঃ
হুগলী

কল্যাণাস্পদেষু

তোমার পত্র পাইলাম। আমি ভাল আছি। তুমি আসিবার জন্য লিখিয়াছ, কিন্তু এখন এদেশে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব। ঐসময়ে জল-কাদাও ভীষণ থাকে। তাহাতে মেয়েছেলের আসা-যাওয়ার নিতান্ত অসুবিধা। সেইজন্যই তোমায় বলিতেছি, এখানে না আসিয়া আমি যখন কলিকাতায় থাকিব তখন আসিবে।

আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

আশীর্বাদিকা
তোমার 'মা'

* পোস্টকার্ডটিতে আনুড় ডাকঘর [তারিখ : 19 JUL. (19)17] এবং তারাকেশ্বর

পূজারতা শ্রীশ্রীমা

কাল : ১৩১৬ সাল (১৯০৯ খ্রীস্টাব্দ) স্থান : উদ্বোধন ('মায়ের বাড়ী')

ডাকঘরের [তারিখ : 23 JUL. (19)17] ছাপ আছে। রাজবালা সেনগুপ্তের ৪টি অপ্রকাশিত চিঠি তাঁর মধ্যম পুত্র শিশিররঞ্জন সেনগুপ্তের সৌজন্যে আমরা পেয়েছি। চিঠিগুলির ক্রমিক সংখ্যা যথাক্রমে ৬৬, ৬৯, ৭০ ও ৭১। রাজবালা সেনগুপ্তের স্বামী দীনেশচন্দ্র সেনগুপ্তের মাতৃস্মৃতিও এই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।—সম্পাদক

॥ ৬৭ ॥

রাজবালা সেনগুপ্তকে লিখিত*

জয় মা

জয়রামবাটী
১১।৯।(১৯)১৭

কল্যাণীয়াবরেষু

তোমার পত্রে সমস্ত জ্ঞাত হইলাম। আমি ভাল আছি। তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে ও ভক্তদিগকে আমার আশীর্বাদ দিবে। ইতি

আশীর্বাদিকা
তোমার "মা"

* পোস্টকার্ডটিতে আনুড় ডাকঘর [তারিখ : 11 SEP. (19)17] এবং ভরাকর ডাকঘরের [তারিখ : 15 SEP. (19)17] ছাপ আছে। (দ্রঃ নিবোধত, ৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৪০২, পৃঃ ১৭৬; এই চিঠিটি এবং পরের চিঠিটির মূল আমরা দেখেছি রাজবালা সেনগুপ্তের দ্বিতীয়া কন্যা নিবেদিতা দত্তগুপ্তের কাছে।)—সম্পাদক

॥ ৬৮ ॥

রাজবালা সেনগুপ্তকে লিখিত*

শ্রীশ্রীহরি শরণম্

জয়রামবাটী
৯ই ফাল্গুন ১৩২৪

কল্যাণবরেষু

তোমার ৪ঠা ফাল্গুনের ১খান পত্র পাইলাম এবং সমস্ত সংবাদ জ্ঞাত হইলাম। আমার জ্বর সারিয়াছে এবং পথ্যও পাইয়াছি। তবে

শ্রীশ্রীহরি। ৬ই অঘ্রান

পরম আশীর্ব্বাদ [illegible]

পরে বাবাজীবন তোমা

[illegible] পাইয়াছি। তো

মরা আমার আশীর্ব্বা

দ জানিবে। [illegible]

[illegible]

করবেন। [illegible]

[illegible] ইতি—

তোমাদের

মা

নিশিকান্ত মজুমদারকে লিখিত শ্রীশ্রীমায়ের পত্র। তাঁকে লেখা মায়ের ১০খানি পত্র আমরা তাঁর একমাত্র কন্যা বীণা দাশের সৌজন্যে পেয়েছি। পত্রগুলি বর্তমান খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বীণা দাশ আমাদের জানিয়েছেন, মায়ের এই পত্রটি তাঁর বাবা-মা (নিশিকান্ত মজুমদার ও সন্তোষবালা মজুমদার) স্টীলের ফ্রেমে বাঁধিয়ে পরম যত্নে আজীবন রক্ষা করেছেন। তাঁরা বলতেন, চিঠিটি মায়ের নিজের হাতে লেখা। এখনো তাঁদের পরিবারে চিঠিটি ঐভাবেই সংরক্ষিত হচ্ছে।

এখনও বল পাই নাই। এখন আমার যাইবারই ঠিক নাই। এখানে সকলে কুশলে আছে। আশাকরি তোমরা কুশলে আছ। আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

আশীর্বাদিকা
তোমাদের মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে দেশড়া ডাকঘর [তারিখ অস্পষ্ট] এবং ভরাকর ডাকঘরের [তারিখ : 25 FEB. (19)18] ছাপ আছে। (দ্রঃ নিবোধত, ৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৪০২, পৃঃ ১৭৭)—সম্পাদক

॥ ৬৯ ॥

রাজবালা সেনগুপ্তকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

বাগবাজার
৩।৭।(১৯)১৮

কল্যাণীয়াসু

মা, আমি উপস্থিত ভাল আছি। এখন না আসিয়া অন্ততঃ মাস দুই পরে এলে ভাল হয়। শরীরের দুর্বলতা এখনও সারে নাই। তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

আশীর্বাদিকা
তোমার মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে বাগবাজার ডাকঘর [তারিখ : 3 JUL. (19)18] এবং ভরাকর ডাকঘরের [তারিখ : 5 JUL. (19)18] ছাপ আছে। পোস্টকার্ডে পত্রপ্রাপকের ঠিকানা : পোঃ ভরাকর কবিরাজপাড়া, দুর্গাদাস সেনগুপ্ত মহাশয়ের বাড়ি, জেলা—ঢাকা।—সম্পাদক

॥ ৭০ ॥

রাজবালা সেনগুপ্তকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

বাগবাজার
কলিকাতা

চিরজীবেষু

বিশেষ পরে মা, তোমার পত্র পেয়েছি। কিন্তু এখানে রাধুর

পুত্রের শরীর ভাল নাই। সেইজন্য পত্রের উত্তর দিতে দেরি হইল। তুমি কিছু মনে করিও না। [এর পরের দু-লাইন পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হলো না।—সম্পাদক] আমি এখন কিছু ভাল আছি, তবে মন একেবারেই ভাল নাই। বাবুরামের অবস্থা বড়ই খারাপ যাইতেছে।[১] তুমি আমার আশীর্বাদ জানিও। সকলকে আমার আশীর্বাদ দিও। আর অধিক কি লিখিব? এখানের আর সকলে একপ্রকার আছে। ইতি

তোমাদের
মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে বাগবাজার ডাকঘর [তারিখ : 23 JUL. (19)18] এবং ভরাকর ডাকঘরের [তারিখ : 25 JUL. (19)18] ছাপ আছে।—সম্পাদক

১ বাবুরাম মহারাজ তখন অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় দেওঘরে রয়েছেন। এই চিঠি লেখার সাতদিন পর ৩০ জুলাই ১৯১৮ তাঁর দেহত্যাগ হয়। দেহত্যাগের চারদিন আগে ২৬ জুলাই তাঁকে দেওঘর থেকে মহাপুরুষ মহারাজ কলকাতার বলরাম-মন্দিরে নিয়ে আসেন।—সম্পাদক

॥ ৭১ ॥

রাজবালা সেনগুপ্তকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

জয় কালী

জগদম্বা আশ্রম
শুক্রবার

কল্যাণীয়া

মা, তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। আমার শরীর এক্ষণে ভাল আছে। রাধুর শরীর এখন অনেকটা ভাল আছে। রাধুর ছেলে ভাল আছে। আশাকরি তোমরা কুশলে আছ। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

আশীর্বাদিকা
তোমার মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে কোতুলপুর ডাকঘর [তারিখ : 14 JUN. (19)19] এবং ভরাকর ডাকঘরের [তারিখ : 18 JUN. (19)19] ছাপ আছে।—সম্পাদক

॥ ৭২ ॥

যতীন্দ্রনাথ ঘোষকে লিখিত*

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

৪ঠা শ্রাবণ

চিরঞ্জীবেষু

বাবাজীবন, তোমাদিগের প্রেরিত টিকিট ও পোস্টকার্ড ইত্যাদি অদ্য পাইলাম। তোমার স্তবমালা সত্যি সুন্দর হইয়াছে। শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। ঠাকুর করছেন জেনো। তোমরা দীর্ঘায়ু [হও] ও নিরাপদে কালাতিপাত করিতে থাক। এখানকার কুশল। তোমাদের কুশল লিখিবে। ইতি

তোমাদিগের মাতা

* পোস্টকার্ডটিতে শিলং ডাকঘরের [তারিখ : 27 JUL. (19)11] ছাপ আছে। (দ্রঃ উদ্বোধন, ৭৭তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৮২, পৃঃ ৩৭৯)—**সম্পাদক**

॥ ৭৩ ॥

যতীন্দ্রনাথ ঘোষকে লিখিত*

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

১৮ই ভাদ্র

চিরঞ্জীবেষু

বাবাজীবন, তোমার এইমাত্র টিকিটসহ সাদা পোস্টকার্ড পাইলাম। আমি আশীর্বাদ করিতেছি, ঠাকুর যেন মঙ্গল করেন। এখানকার কুশল। তোমাদের কুশল লিখিবে।

তোমাদের মাতা

* পোস্টকার্ডটিতে রমনা (ঢাকা) ডাকঘরের [তারিখ : 11 SEP. (19)11] ছাপ আছে। (দ্রঃ উদ্বোধন, ৭৭তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৮২, পৃঃ ৩৭৯)—**সম্পাদক**

॥ ৭৪ ॥

যতীন্দ্রনাথ ঘোষকে লিখিত*

শ্রীশ্রীগুরু শ্রীপাদপদ্মভরসা.

পরম শুভাশীর্বাদ

তোমাদের পত্রে সমস্ত জ্ঞাত হইলাম। বৃহস্পতিবার দিন থেকে রাধুকে সাহেব ডাক্তার দেখিতেছে। তিনি হাসপাতালের বড় ডাক্তার। আর তুমি শিশু-তৈল যদি যোগাড় করিতে পার, পাঠাইয়া দিও। আর কালাকালের জন্য বসিয়া না থেকে শুভ কার্য শীঘ্রই করিবে। কালে পূর্ব ধর্ম বিনাশ হয়, আবার দর্শনেও পুণ্য আছে। শিশু-তৈল পার তো পাঠাইও, আমার পায়ের ব্যথার জন্য দরকার। আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে দৌলতপুর ডাকঘরের [তারিখ : 12 MAR. (19)15] ছাপ আছে। (দ্রঃ উদ্বোধন, ৭৭তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৮২, পৃঃ ৩৭৯)—**সম্পাদক**

॥ ৭৫ ॥

যতীন্দ্রনাথ ঘোষকে লিখিত*

জয় মা

জয়রামবাটী
২৭শে বৈশাখ

কল্যাণবরেষু

বাবাজীবন, তোমার প্রেরিত ২৫ টাকা পাইলাম। ঐ পুষ্করিণী ২২৫ টাকায় আমাদের খরিদ করা হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা হইলে শীঘ্রই পানা পরিষ্কার করা হইবে। এখন আমি ভাল আছি। তোমরা সকলে আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

তোমার মা

* পোস্টকার্ডটিতে আনুড় ডাকঘরের [তারিখ : 10 MAY (19)17] ছাপ আছে। (দ্রঃ উদ্বোধন, ৭৭তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৮২, পৃঃ ৩৮০)—**সম্পাদক**

॥ ৭৬ ॥

যতীন্দ্রনাথ ঘোষকে লিখিত*

জয় মা

জয়রামবাটী
১২ই কার্ত্তিক

কল্যাণবরেষু

বাবাজীবন, তোমার পত্র পাইলাম। আমি ও রাধু ভাল আছি। তুমি আমার বিজয়ার স্নেহ-আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

আশীর্বাদিকা
তোমার মা

* পোস্টকার্ডটিতে আনুড় ডাকঘরের [তারিখ : 31 OCT. (19)17] ছাপ আছে। (দ্রঃ উদ্বোধন, ৭৭তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৮২, পৃঃ ৩৮০)—সম্পাদক

॥ ৭৭ ॥

যতীন্দ্রনাথ ঘোষকে লিখিত*

শ্রীশ্রীগুরুদেব

জয়রামবাটী
৮ই পৌষ ১৩২৪

আশিস অন্তে সমাচার

বাবা, তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। আমার শরীর ভাল আছে, তবে ঠাণ্ডা একটু বেশি হওয়ায় বাতের বেদনা একটু বাড়িয়াছে। রাধু প্রভৃতি এখানকার অন্যান্য সকল ভাল। তোমাদের কুশল বাঞ্ছনীয়। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে।

আশীঃ
তোমার মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে ডাকঘরের ছাপ অস্পষ্ট। (দ্রঃ উদ্বোধন, ৭৭তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৮২, পৃঃ ৩৮০)—সম্পাদক

॥ ৭৮ ॥

যতীন্দ্রনাথ ঘোষকে লিখিত*

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণম্

জয়রামবাটী
১লা ফাল্গুন ১৩২৪

কল্যাণবরেষু

তোমার ২৬শে মাঘের পত্র পাইয়াছি। আমার শরীর এখন বড়ই দুর্বল, তবে অন্য কোন গ্লানি নাই। শরৎ [স্বামী সারদানন্দ] এখান হইতে কলিকাতা চলিয়া গিয়াছে। আমি কবে কলিকাতা যাইব তাহার ঠিক নাই। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

আঃ
তোমার মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে ডাকঘরের ছাপ অস্পষ্ট। (দ্রঃ উদ্বোধন, ৭৭তম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৮২, পৃঃ ৫৬৮)—সম্পাদক

॥ ৭৯ ॥

যতীন্দ্রনাথ ঘোষকে লিখিত*

শ্রীশ্রীগুরুদেব শরণম্

শ্রীশ্রীজগদম্বা আশ্রম
কোয়ালপাড়া
কোতুলপুর পোঃ
বাঁকুড়া জেলা
১০ই বৈশাখ ১৩২৬

কল্যাণবরেষু

তোমার পত্রখানা পাইয়াছি। আমি উপস্থিত ভাল আছি। শ্রীমতী

রাধারানী পূর্ববৎই আছে। তুমি শ্রীশের হস্তে যে পেঁপে পাঠাইয়াছিলে তাহা এবারে আমি খুব খাইয়াছি। তোমরা সকলে আমার আশীর্বাদ জানিবে। তোমাদের কুশলাদি লিখিও। বাকি মঙ্গল। ইতি

আঃ

তোমার মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে ডাকঘরের ছাপ অস্পষ্ট। (দ্রঃ উদ্বোধন, ৭৭তম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৮২, পৃঃ ৫৬৮)—সম্পাদক

॥ ৮০ ॥

যতীন্দ্রনাথ ঘোষকে লিখিত*

শ্রীশ্রীহরি শরণম্

জয়রামবাটী
পোঃ দেশড়া
৩০শে ভাদ্র

পরম কল্যাণীয়

বাবাজীবন, তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তোমাদের ওদিকে চাউলের দর খুব বেশি জানিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম। এদিকে ৬।।/৭ টাকা করিয়া চাউল [মণ] যাইতেছে। আমি শারীরিক একপ্রকার ভাল আছি। বাকি সকলে ভাল আছে। তোমরা সকলে আমার আশীর্বাদ জানিবে। আশাকরি তোমরা সকলে কুশলে আছ। বাকি মঙ্গল। ইতি

আঃ

মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে দেশড়া ডাকঘরের [তারিখ : 14 SEP. (19)19] ছাপ আছে। (দ্রঃ উদ্বোধন, ৭৭তম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৮২, পৃঃ ৫৬৮)—সম্পাদক

॥ ৮১ ॥

যতীন্দ্রনাথ ঘোষকে লিখিত*

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্

জয়রামবাটী

কল্যাণবরেষু

বাবাজীবন, তোমার পত্রে তোমাদের কুশল পেয়ে সুখী হইলাম। তোমার আসিবার যদি ইচ্ছা থাকে তো এস, তবে এখন ভীষণ ম্যালেরিয়া আরম্ভ হইয়াছে। বর্তমানে আমার শরীর ভাল আছে। রাধু [ও] তাহার খোকা ভাল আছে। অপরাপর সকলের কাহারও শরীর ভাল নাই। আশাকরি বাবাজীবন কুশলে আছ। আশীর্বাদ জানিবে এবং অপরাপর সকলকে জানাইবে। ইতি

আঃ

তোমাদের মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে দেশড়া ডাকঘরের [তারিখ : 10 DEC. (19)19] ছাপ আছে। (দ্রঃ উদ্বোধন, ৭৭তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৌষ ১৩৮২, পৃঃ ৬২৩)—সম্পাদক

॥ ৮২ ॥

যতীন্দ্রনাথ ঘোষকে লিখিত*

শ্রীশ্রীহরি শরণম্

কলিকাতা
উদ্বোধন অফিস
২৮শে চৈত্র

কল্যাণবরেষু

বাবাজীবন, তোমার প্রেরিত ৮ টাকা পাইয়াছি। আমার আবার আজ ৪।৫ দিন জ্বর হইয়াছে। অদ্য দুইটি ভাত খাইলাম; কিন্তু

সামান্য জ্বর আছে। দুর্বলতা খুব বেশি, কিছু খাইতে রুচি নাই। তোমরা সকলে আমার আশীর্বাদ জানিবে। আশাকরি তোমরা সকলে কুশলে আছ। বাকি মঙ্গল। ইতি

আঃ

তোমাদের মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে বাগবাজার ডাকঘরের [তারিখ : 10 APR. (19)20] ছাপ আছে। (দ্রঃ উদ্বোধন, ৭৭তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৌষ ১৩৮২, পৃঃ ৬২৩)—সম্পাদক

॥ ৮৩ ॥

যতীন্দ্রনাথ ঘোষকে লিখিত*

শ্রীশ্রীহরি শরণম্

কলিকাতা

৬ই বৈশাখ

কল্যাণবরেষু

বাবাজীবন, তোমার পত্র পাইয়াছি। আমার শরীর খুব খারাপ, জ্বর কিছুতেই বন্ধ হইতেছে না, অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়া আছি; এখন উঠিবার ক্ষমতা পর্যন্ত নাই, আর অন্যত্র যাইব কি করিয়া? তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

আঃ

মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে রাঁচি সেক্রেটারিয়েট ডাকঘরের [তারিখ : 21 APR. (19)20] ছাপ আছে। (দ্রঃ উদ্বোধন, ৭৭তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৌষ ১৩৮২, পৃঃ ৬২৩)—সম্পাদক

॥ ৮৪ ॥

চন্দ্রমোহন দত্তকে লিখিত*

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্

জয়রামবাটী
৩রা ফাল্গুন ১৩২৫

কল্যাণবরেষু

পরম শুভাশীর্বাদ বিশেষ—পরে, বাবাজীবন আমি দেশে আসিয়া কোয়ালপাড়া জগদম্বা আশ্রমে আছি এবং ভাল আছি। শ্রীমতী রাধু পূর্বাপেক্ষা কিছু ভাল আছে। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। তোমাদের কুশল লিখিও। বাকি মঙ্গল। ইতি

আশীর্বাদিকা
তোমাদের মা

* পোস্টকার্ডটিতে ডাকঘরের ছাপ অস্পষ্ট। (দ্রঃ উদ্বোধন, ৭৯তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৌষ ১৩৮৪, পৃঃ ৬৪৭)—সম্পাদক

॥ ৮৫ ॥

চন্দ্রমোহন দত্তকে লিখিত*

শ্রীশ্রীগুরুদেব শরণম্

কোয়ালপাড়া
১৫ ফাল্গুন ১৩২৫

কল্যাণবরেষু

তোমার পত্র পাইয়া লিখিত সমাচার জ্ঞাত হইলাম। তোমার বাড়ির খুঁটি পুঁতিবার দিন শরৎ যে ঠিক করিয়া দিয়াছে তাহাই উত্তম।

আমি ভাল আছি। শ্রীমতী রাধারানী এখনও সারে নাই। আর আর সকলে ভাল আছে। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

তোমার

মাতাঠাকুরানী

• পোস্টকার্ডটিতে ডাকঘরের ছাপ অস্পষ্ট। (দ্রঃ উদ্বোধন, ৭৯তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৌষ ১৩৮৪, পৃঃ ৬৪৭)—সম্পাদক

॥ ৮৬ ॥

চন্দ্রমোহন দত্তকে লিখিত*

জয় মা

জয়রামবাটী

১৫ই চৈত্র

কল্যাণবরেষু

বাবাজীবন, তোমার পত্রখানা পাইয়া সমস্ত জ্ঞাত হইলাম। তোমার বাবাকে আমার আশীর্বাদ দিবে ও তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে। মকদ্দমার জন্য কোন চিন্তা করিও না। শ্রীশ্রীঠাকুর যাহা করেন তোমাদের মঙ্গলের জন্য, তবে সত্যপথে থাকিবা। অধিক কি। আমি ও রাধু ভাল আছি। যোগেন, গোলাপ প্রভৃতি সকলকে আমার আশীর্বাদ দিবা। ইতি

আশীর্বাদিকা

তোমার মা

• পোস্টকার্ডটিতে ডাকঘরের ছাপ অস্পষ্ট। (দ্রঃ উদ্বোধন, ৭৯তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৌষ ১৩৮৪, পৃঃ ৬৪৯)—সম্পাদক

॥ ৮৭ ॥

চন্দ্রমোহন দত্তকে লিখিত*

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপদভরসা

কোয়ালপাড়া
১৬ই চৈত্র

কল্যাণবরেষু

বাবাজীবন চন্দ্র, তোমার পত্র নলিনীর কাছ হইতে পেয়েছি। আমি রাধুকে নিয়ে বড়ই অস্থিরে আছি বাবা। সেইজন্য উত্তর দিতে পারি নাই, কিছু মনে করিও না। তোমার বাবার অসুখের কথা শুনিলাম। ভয় কি? ভাল জায়গায় আছে, ঠাকুর রক্ষা করিবেন। তোমার বাড়ি যতদিন না হয় ততদিন তাদের কাছে মিনতিভাবে থাকিবে এবং যাতে বাড়ি না হওয়া পর্যন্ত সেই বাড়িতেই থাকিতে পাও তার চেষ্টা করিও। আমি আশীর্বাদ করিতেছি তোমার বাড়ি শীঘ্রই হইয়া যাইবে। তুমি আমার অনেক উপকার করেছ। বৌমা দেশে গেছে। কি ছেলে হয় লিখিও। তোমাদের কুশল দিও। এখানের মঙ্গল একরূপ জানিও। নলিনীর এখানে এসে আবার কোমরের ব্যথা হয়েছিল। আজ একটু ভাল আছে, কিছু অত্যাচার করে নাই। রাধু তেমনই আছে। আমি একরূপ ভাল আছি। আমার আশীর্বাদ সকলকে দিও। সকলকার কুশল দিও। ইতি

তোমাদের
মাতাঠাকুরানী

মাকুর সংযোজন

চন্দ্রদাদা, তোমার পত্র আমি এতদিন লিখে দিতাম। তবে পিসিমা বড় ব্যস্ত আছেন, সেইজন্য দেরি হইল। ইতি—মাকু

* পোস্টকার্ডটিতে বাগবাজার ডাকঘরের [তারিখ : 30 MAR. (19)19] ছাপ আছে। (দ্রঃ উদ্বোধন, ৭৯তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৌষ ১৩৮৪, পৃঃ ৬৪৮)—সম্পাদক

॥ ৮৮ ॥

চন্দ্রমোহন দত্তকে লিখিত*

শ্রীশ্রীগুরুদেব শরণম্

কোয়ালপাড়া
২৫শে বৈশাখ ১৩২৬

কল্যাণবরেষু

তোমার পত্রে তোমার পিতার মৃত্যুসংবাদ জানিয়া সুখী হইলাম। কারণ বৃদ্ধ বয়সে তোমার পিতা তোমাদের সকলকে রাখিয়া গঙ্গালাভ করিয়াছেন সেইজন্য। আমি উপস্থিত ভাল আছি। গতরাত্রে শ্রীমতী রাধারানী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে। প্রসূতি ও সন্তান উভয়েই ভাল আছে। বাকি মঙ্গল। ইতি

আশীর্বাদিকা
তোমার মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে ডাকঘরের ছাপ অস্পষ্ট। (দ্রঃ উদ্বোধন, ৭৯তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৮৪, পৃঃ ৪৯৬)—সম্পাদক

॥ ৮৯ ॥

চন্দ্রমোহন দত্তকে লিখিত*

শ্রীশ্রীগুরুদেব শরণম্

কোয়ালপাড়া
৩০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

কল্যাণবরেষু

তোমার পত্রখানি পাইলাম। আমি উপস্থিত ভাল আছি। শ্রীমতী রাধারানী পূর্বের ন্যায়ই আছে। তাহার ছেলেটি ভাল আছে। তোমার

অসুখের কথা শুনিলাম। কেমন আছ লিখিবে। শ্রীমান শরতের পত্রে তোমাদের সংবাদ পাইতাম। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। বাকি মঙ্গল। ইতি

আঃ তোমার
মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে ডাকঘরের ছাপ অস্পষ্ট। (দ্রঃ উদ্বোধন, ৭৯তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৌষ ১৩৮৪, পৃঃ ৬৪৮)—সম্পাদক

॥ ৯০ ॥

মানদাশঙ্কর দাশগুপ্তকে লিখিত*

৫ই চৈত্র ১৩২৩

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্রখানা পাইয়া সমস্ত বিষয় অবগত হইলাম। তোমার পত্রের দ্বারা আমি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি। তোমার অসুখের কথা শুনিয়া আমি বড়ই ভাবিত আছি। তুমি ইচ্ছা করিলে দুর্গাপ্রসাদ সেনের নিকট হইতে ঐ রোগের জন্য ঔষধ নিয়া যাইতে পার, কারণ তাহার ঔষধের দ্বারা শ্রীমতী রাধু ভাল হইয়াছে। সদা সর্বদাই অন্যমনস্ক হইয়া থাকিতে চেষ্টা করিবে। কিছুদিন ধ্যান ধারণা একটু কম করিবে। তবে জপ সম্বন্ধে তুমি যাহা লিখিয়াছ তাহা শুধু কমের পক্ষে ১০৮ বার, আর অতিরিক্ত যত করিতে পার ততই ভাল। যদি আমার ধ্যান করিতে তোমার বেশি ইচ্ছা হয় তবে তাহাই করিবে, কারণ আমি ও ঠাকুরে কোন পার্থক্য নাই শুধু রূপের পার্থক্য। যিনি ঠাকুর তিনিই এই দেহে আছেন।... তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে অটল ভক্তি বিশ্বাস লাভ কর। ইতি

আশীর্বাদিকা
তোমার মা

পুনশ্চঃ—ছেলেরা সকলে ঠাকুরের মঠ করিতেছে শুনিয়া সুখী

হইলাম। তাহাদিগকে আমার আশীর্বাদ দিবে ও তোমরা সকলে লক্ষ্য রাখিবে, তাঁহার অকলঙ্ক নামে কোন দুষ্ট লোক ঢুকিয়া [যেন] কলঙ্ক না রটায়। ইতি

মা

* পোস্টকার্ডটিতে ডাকঘরের ছাপ অস্পষ্ট। (দ্রঃ উদ্বোধন, ৮৭তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, চৈত্র ১৩৯১, পৃঃ ২৩৭)—সম্পাদক

॥ ৯১ ॥

মানদাশঙ্কর দাশগুপ্তকে লিখিত*

জয় মা

জয়রামবাটী
৩০শে চৈত্র

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্রখানা পাইলাম। তোমরা সকলে আমার আশীর্বাদ জানিবে। আর সীতানাথ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ তাহাও শুনিলাম। সীতানাথকে আমার আশীর্বাদ দিবা আর বলিবা—তাহাকে আমি যাহা দিয়াছি তাহা জপ করিলেই সমস্ত হইবে, তাহাকে আর কিছুই করিতে হবে না; কারণ যেই ঠাকুর সেই আমি। আর রাখাল নামক ছেলেটি আমাকে যাহা লিখিয়াছে তাহাও শুনিলাম। তাহাকে আমার আশীর্বাদ দিও এবং তাহাকে বলিবে, ত্যাগ করিতে হইলে প্রথম ভগবানের প্রতি কত ব্যাকুলতা আছে সেটি দেখিতে হয়। সে যদি নিজে মনে করে যে, তার মন ভগবান ব্যতীত আর কিছু চায় না তবে ত্যাগ করা উচিত, নতুবা পরে ঐ বৈরাগ্য থাকে না। বিশেষ কি? আমি ও রাধু ভাল আছি। তোমরা সকলে আমার আশীর্বাদ জানিবে।

তোমাদের
মা

* পোস্টকার্ডটিতে ডাকঘরের ছাপ অস্পষ্ট। (দ্রঃ উদ্বোধন, ৮৭তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মাঘ ১৩৯১, পৃঃ ৮)—সম্পাদক

॥ ৯২ ॥

প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত*

শ্রীশ্রীগুরুদেব

জয়রামবাটী
৫ই চৈত্র ১৩২৪

আশীঃ পর সমাচার—

বাবাজীবন, তোমার বোধ হয় জানা আছে যে, আমাদের বাড়ির[১] জন্য ৪ (চারি) টাকা চৌকিদারী টেক্স ধার্য আছে। ইহা অত্যন্ত বেশি বোধ হওয়ায় গতকল্য একখানা পত্রসহ শ্রীমান গোপেশকে[২] শ্রীযুক্ত শম্ভুবাবুর[৩] নিকট পাঠাইয়াছিলাম। পত্রে লিখিয়াছিলাম, এই বাড়িটি দেবোত্তর[৪] করিয়া দেওয়ায় আমার সহিত তাহার বিশেষ সম্পর্ক নাই। আমি এখানের স্থায়ী অধিবাসী নই। বাড়ির কিছুমাত্র আয় নাই। যে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী সেবক থাকিবে, তাহার ভরণপোষণ এই সংসার হইতে চলিবে না। এমতাবস্থায় স্থায়ী এই গুরুভার বহন করা অসম্ভব। আমার নিজের ও ভক্তেরা যখন যাহা দেয়, ভগবান-ইচ্ছায় তাহাতে কোনরকম চলিয়া যায় মাত্র। সংসারে কিছুমাত্র আয় নাই ইত্যাদি।

শম্ভুবাবু তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, তিনি এবিষয়ে পূর্বেই তোমাকে বলিয়াছিলেন, ডিঃ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট একখানা দরখাস্ত করিবার জন্য। এ সম্বন্ধে তুমি কিছু করিয়াছ কিনা জানি না। আশাকরি

---

১ জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের 'নতুন বাড়ি'।—**সম্পাদক**

২ গোপেশ মহারাজ (পরবর্তী কালে স্বামী সারদেশানন্দ)—শ্রীশ্রীমায়ের সেবক ও মন্ত্রশিষ্য।—**সম্পাদক**

৩ জয়রামবাটীর সন্নিহিত শিবটা গ্রামের জমিদার শম্ভুচন্দ্র রায়। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।—**সম্পাদক**

৪ এই বাড়িটি ও কিছু জমি স্বামী সারদানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশে জগদ্ধাত্রীর নামে অর্পণ করে বেলুড় মঠের ট্রাস্টীদের ওপর রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়ে ২৩ আষাঢ় ১৩২৩ তারিখে রেজিস্ট্রি করান।—**সম্পাদক**

পত্রপাঠ মনোযোগী হইবে এবং যাহা ভাল মনে কর তাহা করিবে। শম্ভু রায় বলিয়া দিয়াছেন, দরখাস্তে যেন উল্লেখ থাকে যে ইহা একটি Religious Institution—আয় কিছুমাত্র নাই। সহৃদয় জনগণের প্রদত্ত সাহায্যে পরিচালিত হইতেছে। এখানকার কুশল সমাচার সহ আমার আশীর্বাদ জানিবে।

আশীঃ
তোমার মাতাঠাকুরানী

[চিঠিটির অপরদিকে গোপেশ মহারাজ মায়েরই নির্দেশে প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন :

নমস্কারান্তে নিবেদন,

পত্রখানা লিখিয়া মাকে শুনাইবা মাত্র [মা] বলিলেন—"টেক্স যাহাতে উঠিয়া যায় তাহা তোমাকে করিতেই হইবে।"

আমার শরীর একপ্রকার চলনসই রকমে আছে। আপনাদের কুশল বাঞ্ছনীয়।

প্রণতঃ
গোপেশ

(দ্রঃ উদ্বোধন, ৮৩তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৌষ ১৩৮৮, পৃঃ ৫৯৯)]

* পোস্টকার্ডটিতে ডাকঘরের ছাপ অস্পষ্ট। (দ্রঃ উদ্বোধন, ৮০তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫, পৃঃ ২২৮)।—সম্পাদক

॥ ৯৩ ॥

ইন্দুবালা দাশগুপ্তকে লিখিত*

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপদভরসা

কলিকাতা
১৫ই...

চিরজীবেষু

বিশেষ পরে আমার আশীর্বাদ জানিও। তোমার কন্যা এখন আর আসে নাই, যখন আসবে বলিব। গোলাপ-মা পূর্বাপেক্ষা কিছু ভাল

আছেন। আমার শরীর একপ্রকার আছে। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিও। অধিক আর কি লিখিব। এখানের মঙ্গল। মালতি ভাল আছে।

তোমার মা

* পোস্টকার্ডটিতে বাগবাজার ডাকঘরের [তারিখ : 2 SEP. (19)18] ছাপ আছে। (দ্রঃ উদ্বোধন, ৭৭তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৮২, পৃঃ ১৬৪)—সম্পাদক

॥ ৯৪ ॥

রাধিকারঞ্জন কর্মকারকে লিখিত*

[১৩২৫ বঙ্গাব্দের ২৯ ভাদ্র শ্রীশ্রীমায়ের চরণাশ্রিত সন্তান প্রয়াত রাধিকারঞ্জন কর্মকার মাকে জানিয়েছিলেন : "মাগো! প্রণামপূর্বক অবোধ সন্তানের বিনীত প্রার্থনা এই যে, অনেকদিন হইতে আপনার নিকট পত্র লিখিতে আমার একান্ত ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিব—এই ভয়ে চুপ করিয়া ছিলাম। কিন্তু এখন আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"আমার অবস্থা—(১) কোন সদুপদেশ শুনিলে অথবা কোন ধর্মপূর্ণ কথা শুনিলে মন শুধু সেই সময়ের জন্য ধর্মভাবাপন্ন হয় এবং কিছুকাল পরেই সেই ধর্মভাবের আকাঙ্ক্ষা, উদ্বেগ ও ব্যাকুলতা মন হইতে চলিয়া যায়, আর তেমন একাগ্রতা থাকে না। আমার মনের ব্যাকুলতা ও একাগ্রতা কে যেন নষ্ট করিয়া দেয়।

"মা, কি করিলে আমি সেই দুষ্টটিকে দমন করিয়া অনন্য মনে শ্রীভগবানের শ্রীচরণ ধারণা করিতে পারি—কৃপা করিয়া তাহা বলুন। মাগো, শুধু আপনার কৃপাই ভিক্ষা চাই।

"(২) নাম করিবার সময় মন এদিক ওদিক যায়, চেষ্টা করিয়া কিছু মুহূর্তের জন্য দৃঢ় করি কিন্তু আবার চঞ্চলতা প্রাপ্ত হয়। দেখিতেছি আমার চেষ্টায় কিছুই হইতেছে না। এইজন্যই মা আপনার কৃপা ভিক্ষা চাই। কি করিব মা, আমি তো আপনার সন্তান। এই সময়ে আপনিই আপনার সন্তানের এই দুর্দশা দেখুন।"

শ্রীশ্রীমা তাঁর এই প্রপন্ন সন্তানকে যে অনবদ্য আশিসলিপিখানি পাঠিয়েছিলেন তা এখানে হুবহু প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক]

শ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

কলিকাতা
১১।৯।(১৯)১৮

কল্যাণবরেষু,

মনের স্বভাবই এইরূপ। কখনও ভাল থাকে, কখনও চঞ্চল হয়। এজন্য লেগে পড়ে থাকতে হয়, অভ্যাস যোগ। ক্রমশঃ হয়। ভগবানকে প্রার্থনা করিবে। আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

আশীর্বাদিকা
মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে ডাকঘরের ছাপ অস্পষ্ট। (দ্রঃ উদ্বোধন, ৮৬তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৯০, পৃঃ ১১২)—সম্পাদক

॥ ৯৫ ॥

তরলাবালা সেনগুপ্তকে লিখিত*

শ্রীশ্রীহরি শরণম্

জয়রামবাটী
৪ঠা আশ্বিন

পরম কল্যাণীয়া

মা, তোমার পত্রখানা পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম।

আমি শারীরিক একপ্রকার ভাল আছি; বাকি সকলে ভাল আছে। তোমরা সকলে আমার আশীর্বাদ জানিবে। ওরূপ অবস্থায় মালা জপ করা চলে না, মনে মনে জপ করিবে। আশাকরি তোমরা সকলে ভাল আছ। বাকি মঙ্গল। ইতি

আঃ
মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে কলমা (ঢাকা) ডাকঘরের [তারিখ : 26 SEP. (19)19] ছাপ আছে। (দ্রঃ উদ্বোধন, ৭৭তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৮২, পৃঃ ২৭৬)—সম্পাদক

॥ ৯৬ ॥

তরলাবালা সেনগুপ্তকে লিখিত*

শ্রীশ্রীহরি শরণম্

জয়রামবাটী
১লা কার্ত্তিক

পরম কল্যাণীয়া

মা, তোমার পত্রে সমস্ত অবগত হইয়া বিশেষ চিন্তিত ও দুঃখিত হইলাম। রাধু এখন বসিতে ও দাঁড়াইতে না পারায় বড়ই ভাবিত আছি। আমার নিজের শরীরও বেশ ভাল নাই, পেটের গোলমাল হইতেছে। খোকা[১] প্রভৃতি বাকি সকলে একপ্রকার ভাল আছে। তোমরা সকলে আমার আশীর্বাদ জানিবে। বাকি মঙ্গল। ইতি

আঃ
মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে কলমা ডাকঘরের [তারিখ : 21 OCT. (19)19] ছাপ আছে। (দ্রঃ উদ্বোধন, ৭৭তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৮২, পৃঃ ২৭৬)—সম্পাদক

১ রাধুর শিশুপুত্র।—সম্পাদক

॥ ৯৭ ॥

তরলাবালা সেনগুপ্তকে লিখিত*

শ্রীশ্রীহরি শরণম্

কলিকাতা
৩রা কার্ত্তিক

কল্যাণীয়াসু

মা, তোমার চিঠি পাইয়াছি। তুমি আমার বিজয়ার আশীর্বাদ জানিবে। তোমার প্রেরিত মিষ্টি পাইয়াছি। নলিনী কাশী হতে অযোধ্যা গিয়াছে শুনছি। বোধ হয় এখানে ফিরিতে বিলম্ব আছে। বেলুড় মঠে প্রতিমা

আনা হয় নাই, পটে পূজা হয়েছে। কাশীতে প্রতিমা হয়েছিল এবং বেশমত পূজাদি হয়েছে। সংসারে থাকিতে গেলেই অল্পবিস্তর ঝঞ্ঝাট জুটে পড়ে। ঠাকুরকে স্মরণ রাখিবে। ইতি

আশীর্বাদিকা
তোমার মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে ডাকঘরের ছাপ অস্পষ্ট। (দ্রঃ উদ্বোধন, ৭৭তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৮২, পৃঃ ২৭৬)—সম্পাদক

॥ ৯৮ ॥

তরলাবালা সেনগুপ্তকে লিখিত*

শ্রীশ্রীহরি শরণম্

জয়রামবাটী
২রা অগ্রহায়ণ

কল্যাণবরেষু

মা, তোমার পত্রে তোমাদের সকলের কুশল [সংবাদ] পেয়ে সুখী হইলাম। আমার [শরীর] এখন ভাল আছে। রাধারানী সেইরূপ আছে, খোকাটি ভাল আছে। অপরাপর সকলের শরীর প্রায় ভাল নাই—এখানে ভীষণ ম্যালেরিয়া আরম্ভ হইয়াছে। রাধুর কাছে কোন ডাক্তার বা কবিরাজ আনাইয়া দেখাইবার জো নাই। সে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকে। কি হইবে তাহা ঠাকুরই জানেন। আশাকরি তোমরা সকলে কুশলে আছ। তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

আঃ তোমাদের
মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে কলমা ডাকঘরের [তারিখ : 11 DEC. (19)19] ছাপ আছে। (দ্রঃ উদ্বোধন, ৭৭তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৮২, পৃঃ ১৬৪)—সম্পাদক

॥ ৯৯ ॥

ফুলরানী সেন মজুমদারকে লিখিত*

শ্রীশ্রীহরি শরণম্

বাগবাজার, কলিকাতা
৭ই বৈশাখ

কল্যাণীয়াসু

মা, তোমার পত্রখানি পাইয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলাম। তাহাকে[১] তোমাদের নিকট ভগবান দিয়াছিলেন, তিনিই আবার লইয়াছেন। যাহা হউক, আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। তোমরা সকলে আমার আশীর্বাদ জানিবে।

আমি এখানে আসিয়া অবধি জ্বরে বড় কষ্ট পাইতেছি, শরীর খুব দুর্বল হইয়া এখন শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়া আছি, দৈনিক জ্বর হইতেছে, জ্বর কিছুতেই বন্ধ হইতেছে না। ডাক্তারি চিকিৎসা হইতে সমস্ত জিনিসে অরুচি। কিছুমাত্র খাইতে পারিতেছি না। অধিক আর কি লিখিব? তোমাদের কুশল লিখিবে। বাকি মঙ্গল। ইতি

আশীর্বাদিকা
মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে ডাকঘরের ছাপ অস্পষ্ট। পত্রটি পাটনার আনন্দ দাশগুপ্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত। (দ্রঃ উদ্বোধন, ৭৯তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪, পৃঃ ২৩২)—সম্পাদক

১ ফুলরানী সেন মজুমদারের প্রথম পুত্র। দেওঘর বিদ্যাপীঠে সর্পদংশনে তার মৃত্যু হয়।—সম্পাদক

॥ ১০০ ॥

লাবণ্যকুমার চক্রবর্তীকে লিখিত*

শ্রীশ্রীহরি শরণম্

জয়রামবাটী
৭ই আশ্বিন

পরম কল্যাণীয়

বাবাজীবন, তোমার প্রেরিত ৫ টাকা পাইয়াছি। আমি শারীরিক একপ্রকার ভাল আছি। তোমরা সকলে আমার আশীর্বাদ জানিবে। আশাকরি তোমরা সকলে ভাল আছ।

এখানকার বাকি মঙ্গল। ইতি

আঃ
মাতাঠাকুরানী

* পত্রটির ডাকঘরের ছাপ অজ্ঞাত। (দ্রঃ যুগজ্যোতি, পৃঃ ৭০)—সম্পাদক

॥ ১০১ ॥

লাবণ্যকুমার চক্রবর্তীকে লিখিত*

শ্রীশ্রীহরি শরণম্

জয়রামবাটী
১৬ই পৌষ

কল্যাণবরেষু

বাবাজীবন, তোমার প্রেরিত ৫ টাকা ও পত্রখানি পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। বৌমায়ের দীক্ষার জন্য মনস্থ করিয়াছ তাহাতে

আপত্তি কি, কিন্তু এখানে এখন জ্বর-জারির সময় আমারও শরীর তত ভাল নয় এবং রাধু এপর্যন্ত দাঁড়াইতে বা চলিতে না পারায় বিশেষ চিন্তিত আছি। অতএব তোমাকে লিখি যে, কলকাতায় যাইলে পর সেখানে আসিলেই সুবিধা। তোমরা কলিকাতায় মধ্যে মধ্যে সংবাদ রাখিবে। আমার মাঘ মাসে কলিকাতায় যাইবার কথা আছে। তারপর ঠাকুরের ইচ্ছায় কতদূর কি হয় জানি না। তোমরা সকলে আমার আশীর্বাদ জানিবে। আমি একপ্রকার ভাল আছি। বাকি মঙ্গল। ইতি

আঃ তোমাদের

মাতাঠাকুরানী

• পত্রটির ডাকঘরের ছাপ অজ্ঞাত। (দ্রঃ যুগজ্যোতি—লাবণ্যকুমার চক্রবর্তী, ১ম সং, ১৩৭৪, পৃঃ ৬৬)—সম্পাদক

॥ ১০২ ॥

মুকুন্দবিহারী সাহাকে লিখিত*

শ্রীশ্রীহরি শরণম্

জয়রামবাটী

৭ই আশ্বিন ১৩২৬

পরম কল্যাণীয়

বাবাজীবন, তোমার প্রেরিত ৫ টাকা পাইয়াছি। আমি শারীরিক একপ্রকার ভাল আছি। বাকি সকলে ভাল আছে। তোমরা সকলে আমার আশীর্বাদ জানিবে। আশাকরি, তোমরা সকলে ভাল আছ। ইতি

আঃ

মাতাঠাকুরানী

* দ্র : মাস্টার মশাই, শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষাপীঠ, মুকুন্দপল্লী, বীরভূম, ১ম প্রকাশ, ১৯৬৬,

পৃঃ ৯৩। পত্রপ্রাপক মুকুন্দবিহারী সাহা শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য। তাঁর মাতৃস্মৃতি বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তিনি বীরভূম জেলার রামপুরহাটের কাছে শ্যামপাহাড়ীতে (তুম্বুনি) 'শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষাপীঠ'-এর প্রতিষ্ঠাতা। শিক্ষক-ছাত্র মহলে এবং স্থানীয় লোকেদের কাছে তিনি 'মাস্টার মশাই' নামে সুপরিচিত ছিলেন।—সম্পাদক

॥ ১০৩ ॥

মুকুন্দবিহারী সাহাকে লিখিত*

শ্রীশ্রীহরি শরণম্

জয়রামবাটী
১৪।৬।(১৯)২৬

কল্যাণীয়

বাবাজীবন, তোমার প্রেরিত কাপড় দুইখানি পাইয়াছি। আমরা একপ্রকার ভাল আছি। তোমরা সকলে আমার আশীর্বাদ জানিবে। বাকি মঙ্গল। ইতি

আঃ
মাতাঠাকুরানী

* দ্র : মাস্টার মশায়, পৃঃ ৯৩

॥ ১০৪ ॥

জনৈক ভক্তকে লিখিত*

জয়রামবাটী
২৩শে চৈত্র

কল্যাণবরেষু

বাবাজীবন, তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। সংসারে থাকিতে গেলে মধ্যে মধ্যে মনে অশান্তি আসে বটে। তা তোমাদের ভয়

কি? তোমরা তাঁর শরণাগত। ঠাকুর তোমার মঙ্গল করুন—এই আশীর্বাদ করি। অত্রস্থ কুশল। আমি ভাল আছি। ইতি

আশীর্বাদিকা
তোমার মাতাঠাকুরানী

* পত্রটিতে ডাকঘরের ছাপ অস্পষ্ট। (দ্রঃ উদ্বোধন, ৮৭তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মাঘ ১৩৯১, পৃঃ ৮)—সম্পাদক

॥ ১০৫ ॥

জনৈক ভক্তকে লিখিত*

শ্রীশ্রীগুরু শরণম্

জয়রামবাটী
১৬ই আষাঢ়

কল্যাণবরেষু

বাবাজীবন, তোমার পত্র ও প্রেরিত টাকা পাঁচটি পাইয়া সুখী হইলাম। তুমি আশীর্বাদ জানিবে এবং বৌমা ও ছেলেদিগকে আমার আশীর্বাদ জানাইবে। আমি উপস্থিত ভাল আছি এবং বাটীর সকলে ভাল আছে। সম্ভবতঃ দুর্গাপূজার পর কলিকাতা যাইতে পারি। মালা যখন ছিঁড়িয়া গিয়াছে, তখন মালা জপ নাই বা করিলে। মনে মনেই জপ করিবে। আশাকরি তোমাদের কুশল। ইতি

আশীর্বাদিকা
তোমার মাতাঠাকুরানী

* পত্রটিতে ডাকঘরের ছাপ অস্পষ্ট। (দ্রঃ উদ্বোধন, ৬৫তম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৭০, পৃঃ ৬০১)—সম্পাদক

॥ ১০৬ ॥

জনৈক ভক্তকে লিখিত*

১নং মুখার্জী লেন
বাগবাজার
১১ই শ্রাবণ

কল্যাণীয়াসু

মা, তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। পথ হারাবে কেন? পথ পাবার জন্যেই তো এখানে আসা। যখন মনে অশান্তি আসে ঠাকুরকে খুব ডাকিবে। তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

আশীর্বাদিকা
তোমার মাতাঠাকুরানী

* পত্রটিতে ডাকঘরের ছাপ অস্পষ্ট। (দ্রঃ উদ্বোধন, ৮৬তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৌষ ১৩৯১, পৃঃ ৭৮৫)—সম্পাদক

॥ ১০৭ ॥

জনৈক ভক্তকে লিখিত*

কলিকাতা
১৮ই শ্রাবণ ১৯০৮

কল্যাণীয়া

মা, তোমার চিঠি পাইয়াছিলাম কিন্তু সময় পাই নাই, অই তোমায়

চিঠি লিখিতে পারি নাই। তোমার জন্য বড়ই দুঃখিত আছি। মা, আপনার মনকে আপনি না বুঝাইলে কে বুঝাইবে? জগতে লোকের এইরূপই হইতেছে। তবে তোমার একটি বলেই বেশি, তা কি করিবে? ঠাকুর তোমার মনে শান্তি দিন। তিনি শান্তি দিবেন, এরূপ থাকিবে না। তোমার মায়ার বস্তু সেইটি ছিল। এখন মন ঠাকুরের প্রতি দিয়া তাঁকে ডাক, শান্তি পাবে। আর কি বলিব মা, তিনি নেন আবার ব্যবস্থা করেন। একভাবে কখন কাহাকেও রাখেন না। আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে, তোমার সেখানের সকলকে জানাইবে। আমি ভাল আছি, আর আর সকলে ভাল আছেন। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষিণী
তোমার মাতা

* ডাকঘরের ছাপ অস্পষ্ট। (দ্রঃ উদ্বোধন, ৪৬তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১, পৃঃ ২১৮)—সম্পাদক

॥ ১০৮ ॥

জনৈক ভক্তকে লিখিত*

ওঁ রামকৃষ্ণ জয়তি

২৬শে মাঘ ১৩১৬

পরম শুভাশীর্বাদ

বাবাজীবন, তোমার পত্রখানি বহুদিন পরে আজ পাইলাম ও পরম আনন্দ লাভ করিলাম।... তুমি এত ভাবনা করিও না। জগতের গতি একমাত্র তিনি। তাঁহাকে মনের সহিত ডাক, তিনি সর্বদা রক্ষা

করিবেন।... তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে ও সকলকে জানাইবে। আমার শরীর তত ভাল নাই। কারণ, বাতে বড়ই কষ্ট পাইতেছি; সেজন্য তুমি কোন চিন্তা করিও না। বাড়ির সকলে উপস্থিত ভাল আছেন। ইতি

তোমার মঙ্গলময়ী মাতৃদেবী

* ডাকঘরের ছাপ অস্পষ্ট। (দ্রঃ উদ্বোধন, ৬৫তম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৭০, পৃঃ ৬০১)—সম্পাদক

পরিশিষ্ট

মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম থেকে লেখা স্বামী বিমলানন্দের পত্রের উত্তরে শ্রীমায়ের মূল পত্রের ফটো।

[শঙ্করীপ্রসাদ বসুর সৌজন্যে]

শ্রীগুরবে নম

জয়রামবাটী
১৩০৯। ১৫ই ভাদ্র

নিরাপদেষু—

পরম শুভাশীর্ব্বাদবিশেষ—

বাবাজী—১খান পত্র পাইয়া জ্ঞাত আছি। শ্রীশ্রীস্বামীজী মহারাজের জন্য যে কষ্ট হইতেছে লিখিয়া কি জানাই। আমাদের গুরু জিনি [যিনি] তিনি ত অদ্বৈত। তোমরা সেই গুরুর শিস্য [শিষ্য] তখন তোমরাও অদ্বৈতবাদী। আমি যোর [জোর] করিয়া বলিতে পারি তোমরা অবশ্য অদ্বৈতবাদী [।] মিসেস সেভিয়ারকে আমার ভালবাসার সহিত আশীর্ব্বাদ জানাইবে। তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে [।] কালীকৃষ্ণ তথায় যাইবেক জানিয়া মতিলালের ১খান পত্র পাইয়াছি [।] তাহাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে [।] মেয়ে মানুষের মঠ*—মঠে সাবধানে থাকিবে। আর স্বামীজীর যোর [জোর] নাই। আমরা সকলে ভাল আছি। তোমাদের সংবাদ লিখিবে। ইতি

তোমাদের মাতা
আশীর্ব্বাদিকা

মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের তৎকালীন অধ্যক্ষ এবং 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার সম্পাদক স্বামী স্বরূপানন্দের ব্যক্তিগত ডায়েরীতে শ্রীমায়ের উপরোক্ত পত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। তা থেকে জানা যায় যে, শ্রীমায়ের পত্রটি মায়াবতীতে স্বামী বিমলানন্দের হাতে পৌঁছেছিল ৭ সেপ্টেম্বর ১৯০২।
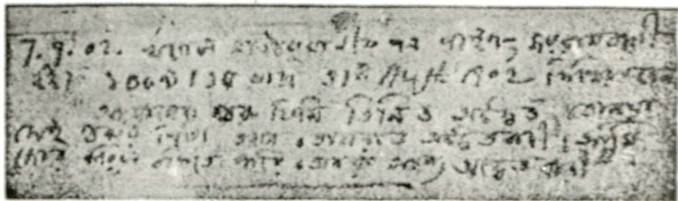
7.9.02 খগেন মাতাঠাকুরাণীর পত্র পাইল, জয়রামবাটী হইতে ১৩০৯। ১৫ ভাদ্র 31st Augt. 1902 লিখিয়াছেন [:] "আমাদের গুরু যিনি তিনি ত অদ্বৈত [।] তোমরা সেই গুরুর শিষ্য তখন তোমরাও অদ্বৈতবাদী। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি তোমরা অবশ্য অদ্বৈতবাদী [।]"

---

* 'মেয়ে মানুষের মঠ'—কথাটি মূলপত্রে পাশে লেখা আছে (ফটো দ্রষ্টব্য)। মিসেস সেভিয়ার মায়াবতী আশ্রমে থাকতেন। সম্ভবত সেকারণেই শ্রীমা ঐকথা লিখেছিলেন। আমরা এই অনুমানের ভিত্তিতে কথাটিকে এখানে বসিয়েছি।

সম্পাদক

একটি ঐতিহাসিক পত্র

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

প্রতিচ্ছবি-সহ (পৃঃ ৮১৮ক, খ) শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর যে-পত্রটি প্রকাশিত হলো, সেটি আমাদের বিবেচনায় একটি ঐতিহাসিক পত্র। রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের ইতিহাসে এটির স্থান আছে। এই আন্দোলন ভারত ও পৃথিবীর ধর্মান্দোলনের ক্ষেত্রে যেহেতু উল্লেখযোগ্য স্থান নিয়েছে, তাই এর ইতিহাসে যদি কোন রচনার বিশেষ মূল্য থাকে, তাহলে তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব স্বীকার করতে হবে।

পত্রলেখিকা কিন্তু লেখিকা হিসেবে কোনমতে বিখ্যাত নন। তিনি স্বহস্তে চিঠি লিখতেন না। ঠিকভাবে বলতে গেলে, তিনি লিখতেই পারতেন না। এক্ষেত্রে তিনি তাঁর সুবিখ্যাত 'নিরক্ষর' স্বামীকেও অতিক্রম করেছেন।[১] 'নিরক্ষর' শ্রীরামকৃষ্ণ লিখতে জানতেন এবং অতি সুছাঁদ ছিল তাঁর হস্তাক্ষর।

---

১ স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রণীত 'শ্রীমা সারদা দেবী' গ্রন্থে শ্রীশ্রীমার লেখাপড়ার কিছু বিবরণ আছে। বিয়ের আগে নিজের পড়াশোনা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমা বলেছেন ঃ "ছেলেবেলায় প্রসন্ন, রামনাথ (জ্ঞাতিভাই) ওরা সব পাঠশালায় যেত। ওদের সঙ্গে কখনো কখনো যেতুম। তাতেই একটু শিখেছিলুম।" বিয়ের পরে লেখাপড়া সম্বন্ধে তিনি বলেছেন ঃ "কামারপুকুরে লক্ষ্মী আর আমি 'বর্ণপরিচয়' একটু একটু পড়তুম। ভাগনে (হৃদয়) বই কেড়ে নিলে; বললে, 'মেয়েমানুষের লেখাপড়া শিখতে নেই; শেষে কি নাটক-নভেল পড়বে?' লক্ষ্মী তার বই ছাড়লে না। ঝিয়ারী মানুষ কিনা, জোর করে রাখলে। আমি আবার গোপনে আর একখানি এক আনা দিয়ে কিনে আনালুম। লক্ষ্মী গিয়ে পাঠশালায় পড়ে আসত; সে এসে আবার আমায় পড়াত।"

শ্রীশ্রীমার কথায় আরও জানা গেছে, তিনি দক্ষিণেশ্বরে আরও একটু ভাল করে শিখতে পেরেছিলেন। ভব মুখুজ্যেদের একটি মেয়ে স্নান করতে এসে তাঁকে পড়িয়ে যেত; শ্রীশ্রীমা তাকে মাইনে-রূপে (বা গুরুদক্ষিণারূপে!) বাগানের শাকপাতা দিতেন। "এই বিদ্যাভ্যাসের ফলে তিনি রামায়ণাদি পড়িতে পারিতেন, কিন্তু লিখিতে বিশেষ পারিতেন না; এমনকি শেষ বয়সে নাম সহি পর্যন্ত করিতে পারিতেন না।"

পত্রটির মুদ্রিত প্রতিচ্ছবি থেকে পাঠক দেখবেন, তাতে বর্ণাশুদ্ধি যথেষ্ট আছে এবং ভাষাও সুগঠিত নয়। পত্রটির বক্তব্য শ্রীশ্রীমা বলে গিয়েছিলেন এবং সেবক বা সঙ্গিনীদের কেউ তা লিখে দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও বলতে হবে, এর মধ্যে এমন কিছু বস্তু আছে যা বিশেষভাবে অনুধাবনের যোগ্য।

এই পত্র ইতিপূর্বে সম্পূর্ণতঃ কোথাও প্রকাশিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই, যদিও এর প্রয়োজনীয় অংশ বহুদিন আগেই বেরিয়ে গেছে। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্যগণ-লিখিত' স্বামীজীর ইংরেজী জীবনীর তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়—তার মধ্যেই সম্ভবতঃ পত্রটির প্রথম প্রকাশ্য উল্লেখ পাই। তারপর স্বামী শ্রদ্ধানন্দ তাঁর 'অতীতের স্মৃতি' গ্রন্থে স্বামী স্বরূপানন্দের ডায়েরী থেকে উক্ত পত্রের কয়েক লাইন উদ্ধৃত করেছেন। স্বামী গম্ভীরানন্দ তাঁর 'শ্রীমা সারদা দেবী' গ্রন্থে স্বামীজীর ইংরেজী জীবনী থেকে উক্ত অংশ নিয়েছেন এবং 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থে তা নিয়েছেন 'অতীতের স্মৃতি' গ্রন্থ থেকে। স্বামী স্বরূপানন্দের ডায়েরী আমি স্বামী অজ্জানন্দের কাছে দেখবার সুযোগ পেয়েছি—সেখান থেকে উক্ত অংশ 'নিবেদিতা লোকমাতা' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছি। স্বামীজীর শিষ্য খগেন অর্থাৎ স্বামী বিমলানন্দ শ্রীশ্রীমাকে এক পত্র লেখেন—তার উত্তরে শ্রীশ্রীমার ঐ পত্র। ৭ সেপ্টেম্বর ১৯০২ তারিখে স্বামী স্বরূপানন্দের ডায়েরীতে এবিষয়ে লেখা আছে—"খগেন মাতাঠাকুরানীর পত্র পাইল, জয়রামবাটী হইতে, ১৩০৯, ১৫ ভাদ্র, ৩১ আগস্ট ১৯০২; লিখিয়াছেন—।" [শ্রীমায়ের পত্রের ফটোর অপরদিকে দ্রষ্টব্য।]

পত্রটির পটভূমিকা স্বামীজীর জীবনী-পাঠকের জানা আছে। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষদিকে দারুণ বৃষ্টি ও তুষারপাতের মধ্য দিয়ে নিতান্ত অসুস্থ শরীরে স্বামীজী দুর্গম মায়াবতীতে গিয়েছিলেন শোকার্ত মিসেস সেভিয়ারকে সান্ত্বনা দিতে এবং নিজের একটি প্রিয় স্বপ্নের কিছু সার্থকতার রূপকে স্বচক্ষে দর্শন করতে। স্বামীজীর স্বপ্ন-কল্পনা অনুযায়ী মায়াবতীতে ক্যাপ্টেন সেভিয়ার অদ্বৈত আশ্রম

স্থাপন করেছিলেন—সেই ক্যাপ্টেন সেভিয়ার দেহত্যাগ করেছেন বিনা চিকিৎসায়। এ-মৃত্যু স্বামীজীর 'ভিশন'-এর জন্য আত্মোৎসর্গ ছাড়া আর কিছু নয়।

স্বামীজীর নানাপ্রকার 'ভিশন'-এর প্রধান একটিকে—বিশুদ্ধ অদ্বৈতকে সাধনারূপে গ্রহণ এবং ধর্মরূপে প্রচারের ব্রতকে গ্রহণ করেছিলেন ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার। অদ্বৈত আশ্রমের স্থাপনা সেইজন্যই। কোন্ বিরাট ও বিশুদ্ধ কল্পনায় স্বামীজী এক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত ছিলেন, তা স্বামীজীর জীবনী-পাঠক জানেন। তাঁরা জানেন, ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার—এই দুই বিদেশীকে এবং স্বামী স্বরূপানন্দ নামক স্বদেশীয়কে একাজে সহায়ক পেয়ে স্বামীজী কতখানি উল্লসিত ছিলেন। ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের পঞ্জরাস্থি দিয়ে মায়াবতীতে কোন্ অদ্বৈত-বজ্র নির্মিত হয়েছে, তা-ই দেখার জন্য স্বামীজীর শেষ হিমালয়যাত্রা।

মায়াবতী স্বামীজীকে কতখানি আনন্দ দিয়েছিল, তা তাঁর জীবনীতে পাওয়া যায়। একটি ব্যাপার কতখানি আঘাত করেছিল, তাও পাই। অদ্বৈত আশ্রমের একটি ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণের পট প্রতিষ্ঠা করে স্বামীজীর কয়েকজন শিষ্য পূজা আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। স্বামীজী একান্তভাবে চেয়েছিলেন, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একটি কেন্দ্র অন্ততঃ থাক যেখানে বিশুদ্ধ নিরাকার অদ্বৈতের উপাসনা হবে। দূর হিমালয়ে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম স্বামীজীর সেই পরম আকাঙ্ক্ষিত কেন্দ্র—সেখানেও সাকার উপাসনা!! তদুপরি, আমার ধারণা, ঘটনাটিকে 'কথামত কাজ না করা' বলেই তাঁর মনে হয়েছিল। ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদী, তাঁরা অদ্বৈত আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা; প্রধান কর্মী স্বামী স্বরূপানন্দও তাই—সেই আশ্রমে। যেহেতু এটি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত, তার জোরে সঙ্ঘের সাধু-ব্রহ্মচারীরা যদি সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা আরম্ভ করে দেন, তাহলে আদর্শরক্ষা তো হয়ই না, নেতার প্রতিশ্রুতিরক্ষাও হয় না।

১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত স্বামীজীর ইংরেজী জীবনীর তৃতীয় খণ্ড থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ অনুবাদ করে দিচ্ছি—

"কয়েকজন (অদ্বৈত) আশ্রমবাসীর একান্ত ইচ্ছায় একটি ঠাকুরঘর কিছুদিন আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের পটপূজা হতো। (মায়াবতীতে) উপস্থিত হওয়ার পরে স্বামীজী একদিন সকালে সেই ঘরটি দেখতে পান। দেখেন যে, অদ্বৈত আশ্রমে রীতিমত ঠাকুরঘর চালু হয়ে গেছে, ধূপ-ধুনো, ফুল-ফল দিয়ে দিব্যি ভোগ-পূজা চলছে। তখনই তিনি কোন কথা বলেননি; কিন্তু সন্ধ্যায় সকলে যখন অগ্নিকুণ্ড ঘিরে বসেছেন তখন তিনি অদ্বৈত আশ্রমের মতো জায়গায় ঠাকুরপূজা করার কঠোর সমালোচনা করলেন। বললেন : অত্যন্ত অনুচিত কাজ করা হয়েছে। অদ্বৈত আশ্রমে ধর্ম আচরিত হবে ব্যক্তিগতভাবে; আশ্রমবাসীরা নিজস্ব ভাবে ধ্যানাদি করবেন, একক বা সমবেতভাবে শাস্ত্রচর্চা করবেন, তাঁরা সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অদ্বৈতবাদের অনুশীলন করবেন ও তার শিক্ষা দেবেন—দ্বৈতবাদের দুর্বলতা বা নির্ভরতা থেকে একেবারে দূরে থাকবেন। অদ্বৈত আশ্রম থেকে প্রচারিত 'প্রস্পেকটাস'-এ স্বামীজী স্বয়ং নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন—এখানে বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ অদ্বৈততত্ত্ব, সর্বপ্রকার কুসংস্কার ও দুর্বলকর সংস্রব থেকে যা মুক্ত—কেবল তা-ই অনুশীলিত ও প্রচারিত হবে। অদ্বৈত আশ্রম একমাত্র অদ্বৈতের জন্যই উৎসর্গীকৃত। সুতরাং, স্বামীজী বললেন, এক্ষেত্রে বিচ্যুতির সমালোচনা করার অধিকার তাঁর আছে। তাছাড়া তাঁর নিজ গুরুর শিক্ষা ও আশীর্বাদেই তিনি অদ্বৈতবাদী হয়েছেন এবং তিনি এবিষয়ে সচেতন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সর্বপ্রকার ধর্মধারণা শিক্ষা দেওয়ার ও প্রচার করার দায় দিলেও তাঁর (স্বামীজীর) ক্ষেত্রে কিন্তু অদ্বৈতবাদের ওপরই জোর দিয়ে গেছেন।

"অদ্বৈত আশ্রমে আনুষ্ঠানিক পূজা সম্বন্ধে স্বামীজী যদিও তাঁর কঠোর মনোভাব উপস্থিত সকলকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি পূজাঘরটি অবিলম্বে ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেননি; যাঁরা ওর জন্য দায়ী, তাঁদের অনুভূতিতে আঘাত করার মতো কোন কাজ তখন

করেননি। সেটা করলে কর্তৃত্বের জোর খাটানো হতো। যাঁরা ওকাজ করেছেন, তাঁরাই যেন নিজেদের ভুল বুঝে তার থেকে সরে যান—এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। কিন্তু স্বামীজীর আপসহীন মনোভাব (যার পূর্ণ সমর্থক ছিলেন তাঁর দুই অদ্বৈতবাদী শিষ্য—স্বামী স্বরূপানন্দ ও মিসেস সেভিয়ার) অপর আশ্রমবাসীদের মনের ওপরে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই প্রতিষ্ঠানের ঘোষিত আদর্শ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবার জন্য এবং তা বজায় রাখবার জন্যই যে স্বামীজী তাঁদের নিয়োগ করেছেন, সেটা গভীরভাবে অনুভব করে তাঁরা পূজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং ক্রমে ঠাকুরঘরও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।[২]

"আশ্রমবাসীদের একজনের মনে দ্বৈতবাদের দিকে ঝোঁক ছিল। এক্ষেত্রে অদ্বৈত আশ্রমের সদস্য হওয়া তাঁর পক্ষে উচিত হয়েছে কিনা সেবিষয়ে সন্দিহান হয়ে তিনি সর্বোচ্চ বিচারকরূপে শ্রীমা সারদাদেবীর কাছে মীমাংসা চেয়েছিলেন। মাতাঠাকুরানী তাতে উত্তর দেন, 'শ্রীগুরুদেব ছিলেন সম্পূর্ণ অদ্বৈতবাদী; তিনি অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দিয়েছেন। তোমরা তাহলে অদ্বৈতবাদ অনুসরণ কর না কেন? তাঁর সকল শিষ্যই অদ্বৈতবাদী।' বেলুড় মঠে ফেরার পরে মায়াবতীর ঠাকুরঘর সম্বন্ধে আক্ষেপ করে স্বামীজী বলেছিলেন, 'ভেবেছিলুম, অন্ততঃ একটি কেন্দ্রেও তাঁর বাহ্যপূজাদি বন্ধ থাকবে। হায়, গিয়ে দেখি বুড়ো ওখানেও জেঁকে বসে আছে। ভালই।'"

স্বামীজীর ইংরেজী জীবনীতে প্রকাশিত এই বিবরণের বিশেষ মূল্য এইখানে—জীবনীটি লেখা হয়েছিল স্বামী বিরজানন্দ এবং মিসেস সেভিয়ারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। অদ্বৈত আশ্রমে পূর্বোল্লিখিত ঘটনা যখন ঘটে, উভয়েই তখন সেখানে উপস্থিত। সুতরাং, তাঁরা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণই লিখিয়েছেন। এবং আরও উল্লেখযোগ্য, উভয়ে ছিলেন

২ একটা প্রশ্ন ওঠে—স্বামীজীকে কি কেউ ঠাকুরঘরটির বিষয়ে সংবাদ দিয়েছিলেন? 'অতীতের স্মৃতি' গ্রন্থের মতে—না, তা সত্য নয়; স্বামীজীই একদিন তা 'আবিষ্কার' করে ফেলেছিলেন। স্বামীজী অতঃপর মাদার সেভিয়ার ও স্বামী স্বরূপানন্দকে অদ্বৈত আশ্রমের নীতিবিরুদ্ধ পূজাদি চলতে দেওয়ার জন্য 'খুব তিরস্কার' করেছিলেন।

ভাবধারার ক্ষেত্রে 'বিরোধী শিবিরের'—স্বামী বিরজানন্দ ঠাকুরঘর-প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম[৩] এবং মিসেস সেভিয়ার কট্টর অদ্বৈতবাদী।

ইংরেজী জীবনীর মধ্যে মাতাঠাকুরানীর চিঠির যে-অংশ পাই, তা কিন্তু আক্ষরিক অনুবাদ নয় এবং জনৈক আশ্রমবাসী (স্বামী বিমলানন্দ) ঠিক কোন্ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে শ্রীশ্রীমাকে চিঠি লিখেছিলেন, তাও বোধহয় সবটা দেওয়া হয়নি। স্বামী বিমলানন্দের কি কেবল দ্বৈতবাদে ঝোঁক আছে সুতরাং অদ্বৈত আশ্রমে তাঁর থাকা উচিত কিনা—মাত্র এই বিষয়েই প্রশ্ন করে শ্রীশ্রীমাকে চিঠি লিখেছিলেন, নাকি অদ্বৈত আশ্রমে ঠাকুরঘর থাকার বিরুদ্ধে নিজ গুরুর মনোভাবের বিষয়েও প্রশ্ন করে পাঠিয়েছিলেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল বলেই মনে হয়। এবং আমরা বুঝতে পারি, যাঁরা সর্বস্ব দিয়ে ধর্মকে বরণ করেন, তাঁরা কী গভীর জিজ্ঞাসায় মথিত হতে পারেন যা স্বামীজীর মতো গুরুর কাজের যৌক্তিকতা সম্বন্ধেও সংশয় জাগাতে পারে। এবং পুনশ্চ, বুঝতে পারি—সঙ্ঘের কাছে শ্রীমা সারদাদেবী কেবল গুরুপত্নী ছিলেন না, তিনি গুরুর প্রতিনিধি, সঙ্ঘজননী এবং সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণ।[৪]

সারদাদেবীর আলোচ্য পত্রটির গুরুত্ব, আমরা যতদূর দেখেছি, এপর্যন্ত স্বামীজীর দিক দিয়েই বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু ওটি কি সারদাদেবীর জীবনীর পক্ষে কম গুরুত্বপূর্ণ? যদি আমরা একবার ভেবে দেখি—কী সহজে স্বচ্ছন্দে তিনি পারিপার্শ্বিক থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিত্য সত্যের ভূমিতে স্থাপন করতে পারতেন, তাহলে

---

৩ "স্বামী বিরজানন্দ ছিলেন ঐ ঠাকুরঘরটির একজন প্রধান পাণ্ডা।"—'অতীতের স্মৃতি'।

৪ সোজা ভাষায় সঙ্ঘের 'হাইকোর্ট'। স্বামী শিবানন্দ ঐ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। স্বামী গম্ভীরানন্দের 'শ্রীমা সারদা দেবী' গ্রন্থে পাই, একবার জনৈক ব্রহ্মচারী কোন অন্যায় কাজ করে ফেলায় পাছে স্বামী শিবানন্দ তাঁকে মঠ থেকে তাড়িয়ে দেন—সেই ভয়ে একেবারে সোজা পায়ে হেঁটে জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে হাজির হন। শ্রীশ্রীমা উক্ত ব্রহ্মচারীকে ক্ষমা করার অনুরোধ জানিয়ে স্বামী শিবানন্দকে চিঠি দেন। তারপর তিনি ছেলেটিকে মঠে পাঠিয়ে দেন। "ব্রহ্মচারী মঠে পৌঁছিলে শিবানন্দজী তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন : 'ব্যাটা, তুই আমার নামে হাইকোর্টে নালিশ করতে গিয়েছিলি?'"

একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। সারদাদেবী নারী এবং মাতা। দৈনন্দিন জীবনে তিনি স্বতই দ্বৈতবাদী। তাঁর পূজার দেবতা আবার নিজ স্বামী—যিনি গুরু এবং ঈশ্বর তাঁর কাছে, সারাদিন তাঁর পূজাতেই কাটে। সেই স্বামী-গুরু-ঈশ্বরের পূজার পট সরিয়ে নেওয়া হয়েছে গুরুর শিষ্যের ইচ্ছায়। তখন তাঁর কি মনোভাব এবং সিদ্ধান্ত?—অদ্বৈত আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা বন্ধ করিয়ে স্বামীজী ঠিক কাজই করেছেন!! আমাদের লৌকিক দৃষ্টিতে এ-বস্তু অলৌকিক। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণীর পক্ষেই এ-জিনিস করা সম্ভবপর; শ্রীরামকৃষ্ণ যে অদ্বৈতসাধনার সময়ে জ্ঞানের অসিতে মাতৃমূর্তিকে পর্যন্ত দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন! সারদাদেবী সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন ঃ "ও সারদা, সরস্বতী"—সেকথার আর কোন্ প্রমাণ প্রয়োজন?

পত্রটির আরেকটি বিশেষ মূল্য আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের এবং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সর্বোচ্চ ধর্মধারণা কি—এবিষয়ে যদি প্রশ্ন ওঠে তাহলে এই পত্র তার মীমাংসা করে দেবে। শ্রীরামকৃষ্ণ সমন্বয়াচার্য সত্য, কিন্তু নিজে তিনি অদ্বৈতবাদীও। তাঁর ধর্মমত নিয়ে অবশ্য তর্ক আছে। তিনি কি দ্বৈতবাদী, না বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, না কি অদ্বৈতবাদী? 'কথামৃত' পড়ে অনেকেই তাঁকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী মনে করেন। এক বিশিষ্ট পণ্ডিত-অধ্যাপক গ্রন্থ লিখে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন—অদ্বৈতবাদী বিবেকানন্দ জোর করে শ্রীরামকৃষ্ণকে অদ্বৈতবাদী খাড়া করেছেন, যা তিনি মোটেই ছিলেন না। এধরনের রচনা নিশ্চয়ই শেষ রচনা নয়। এক্ষেত্রে নিঃসংশয় সিদ্ধান্তের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রমাণ চাই—সারদাদেবীর পত্রটি তেমন একটি অব্যর্থ প্রমাণ।

সবিনয়ে সবশেষে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়াচার্য হওয়ার সঙ্গে অদ্বৈতবাদী হওয়ার বিরোধ তো নেই-ই, বরং উলটো পক্ষে, অদ্বৈতবাদী না হলে তিনি সমন্বয়াচার্য হতে পারতেন কি? সমন্বয়বাদীদের কথা—যেকোন পথ ধরে অগ্রসর হওয়া যাক না কেন, যদি যথার্থ ব্যাকুলতা থাকে তাহলে চরম লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে। মাত্র অদ্বৈতবাদীরাই একথা বলতে পারেন,

কারণ তাঁরা চলার পথে কোন সাকার ভগবানকে—কোন ঈশ্বরীয় রূপকেই পথের শেষ বলেন না। পরিণতিতে যাঁদের কাছে কোন একটিমাত্র মূর্তি নেই, এক অদ্বয় সত্তাকেই সর্ববিধ ঈশ্বরীয় রূপের মূল বলে যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁরা কোন একটিমাত্র পথকেও অবলম্বনীয় মনে না করতে পারেন। অপরদিকে দ্বৈতবাদীরা যেহেতু তাঁদের সম্প্রদায়গত সাকার ভগবানকেই শুধু মানেন, তাই সেই ভগবানের কাছে উপস্থিত হওয়ার জন্য সম্প্রদায়গত পথটিকেও একমাত্র অবলম্বনীয় বলে স্বীকার করা তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। দ্বৈতবাদীরা খুব উদার হলে বড়জোর ভিন্ন মতাবলম্বীদের 'সহ্য' করেন, কিন্তু 'স্বীকার' করেন কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন : ব্রহ্ম যদি অগ্নি—শক্তি তার দাহিকাশক্তি। কিন্তু অগ্নিরই দাহিকাশক্তি—দাহিকাশক্তির অগ্নি নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রহ্মের শক্তি সারদা, তাই তিনি সজোরে মূল সত্যরূপকে প্রকাশ করেছেন : "আমাদের গুরু যিনি তিনি তো অদ্বৈত।"* □

* উদ্বোধন, ৭৪তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৭৯, পৃঃ ৫০৫-৫১০

শ্রীমায়ের 'ডাকাত-বাবা'

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

'শ্রীশ্রীমায়ের কথা', 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ', আশুতোষ মিত্রের 'শ্রীমা', স্বামী ঈশানানন্দের 'মাতৃসান্নিধ্যে' এবং স্বামী গম্ভীরানন্দ, ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত প্রমুখ প্রণীত শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিটি জীবনীর পাঠকমাত্রেই 'ডাকাত-বাবা'র কথা জানেন। কিভাবে তেলো-ভেলোর মাঠে তাঁর সঙ্গে 'ডাকাত-বাবা'র দেখা হলো, ডাকাত-বাবা ও ডাকাত-মা কত স্নেহযত্নের সঙ্গে রাত্রে তাঁর আহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং পরদিন সকালে তারকেশ্বর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিলেন সেসব কথা উপরি-উক্ত আকরগুলি থেকে জানা যায়; কিন্তু কোথাও ডাকাত-বাবার নাম, নিবাস ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

এ-সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে শ্রীমায়ের দুই সেবক স্বামী পরমেশ্বরানন্দ (কিশোরী মহারাজ) এবং স্বামী গৌরীশ্বরানন্দের (রামময় মহারাজ) কাছে আমরা কিছু সংবাদ ও তথ্য পেয়েছি। তাঁদের কাছে শুনেছি, ডাকাত-বাবার নাম ছিল সাগর সাঁতরা। তিনি ছিলেন তেলো বা তেলুয়া গ্রামের বাসিন্দা। ভেলো বা ভালিয়া তেলোর সংলগ্ন গ্রাম।

তেলো-ভেলো বর্ধমানের মহারাজার জমিদারীর অধীনস্থ সমরশাহী পরগনার অন্তর্ভুক্ত মৌজা। এই পরগনার পত্তনীদার (মূল জমিদারের অধীনস্থ ছোট জমিদার) ছিল মলয়পুরের সামন্ত পরিবার। সাগর সাঁতরা ছিলেন পত্তনীদারের অধীনস্থ ছোট জমিদার তেলোর ঘোষ পরিবারের পাইক। কখনো কখনো ডাকাতি করলেও পেশায় ডাকাত-বাবা কিন্তু ডাকাত ছিলেন না।

স্বামী পরমেশ্বরানন্দ বলতেন : "তেলো-ভেলোর ঘটনার অনেক বছর পরের কথা। মা তখন জয়রামবাটীতে আছেন। একটি বাগ্দী যুবক এসে মাকে বলে, 'আমাকে দীক্ষা দাও।' আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। মা বললেন, 'এখন আমার শরীর ভাল নেই, এখন তো দীক্ষা হবে না।' ছেলেটি ভাবল, সে বাগ্দী বলে—নীচ জাত বলে মা তাকে দীক্ষা দিচ্ছেন না। তাই সে খুব রাগ করে অভিমান-ভরা গলায় বলল, 'বুঝেছি, বাগ্দীর মেয়ে হতে পার, কিন্তু বাগ্দীর মা হতে পার না। আমি তেলো থেকে আসছি। তুমি কি জান, তোমার ডাকাত-বাবা আমার বাবা?' একথা শুনে মা খুব খুশি হলেন এবং অসুস্থ শরীরেই তাকে সেদিন দীক্ষাও দিলেন।" (দ্রঃ উদ্বোধন, ৯৫তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, চৈত্র ১৩৯৯, পৃঃ ১২৫-১২৬)

সাগর সাঁতরার নাতি (পৌত্র) কৃষ্ণপদ সাঁতরার সূত্রে আমরা অবগত আছি যে, তাঁর কাকা মেহারী সাঁতরা মায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছিলেন। একথা তিনি শুনেছেন তাঁর বাবা বিহারী সাঁতরার কাছে। কৃষ্ণপদ জানিয়েছেন যে, তিনি তাঁর কাকাকে দেখেননি; কারণ, তাঁর জন্মের আগেই ২০।২২ বছর বয়সে তাঁর কাকা মারা যান। কৃষ্ণপদ আরও জানিয়েছেন, তাঁর ঠাকুরমা অর্থাৎ শ্রীমায়ের 'ডাকাত-মা'র নাম ছিল মাতঙ্গিনী। তাঁর ঠাকুরদার অর্থাৎ সাগরের বাবার নাম ছিল মথুর এবং মায়ের নাম ছিল তারারানী। মকর সংক্রান্তির দিন তাঁর ঠাকুরদার জন্ম হয়েছিল বলে তাঁর নাম রাখা হয়েছিল 'সাগর'। (দ্রঃ ঐ, পৃঃ ১২৬)

ঠাকুরদাকে কৃষ্ণপদ দেখেননি, কিন্তু বাবার কাছে শুনেছেন, ঠাকুরদার বিরাট দশাসই চেহারা ছিল। গায়ে ছিল প্রচণ্ড শক্তি। আর ছিল ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া একমাথা কালো চুল। রাত্রে খাওয়ার পর যখন মুখ ধুতেন তখন তার আওয়াজে পাড়ার লোক জানত যে, সাগরের রাতের খাওয়া শেষ হলো।

ডাকাত-বাবা ওস্তাদ লাঠিয়াল ছিলেন। তিনি এত দ্রুত লাঠি

ঘোরাতেন যে, ঢিল ছুঁড়লে তা ঐ লাঠিতে লেগে ফিরে আসত। ঐ অঞ্চলে সবাই তাঁকে সমীহ করত তাঁর স্বাস্থ্য ও শক্তির জন্য।

সাগরের অভিনয়-দক্ষতাও ছিল। গ্রামের কৃষ্ণযাত্রার দলে তিনি নিয়মিত অভিনয় করতেন। শোনা যায়, 'কংসবধ' পালায় তিনি কংসের এবং 'সতী বেহুলা' পালায় তিনি যমরাজের ভূমিকায় অভিনয় করতেন। গ্রামের প্রাচীন ব্যক্তিদের সূত্রে জানা যায় যে, সাগর অশিক্ষিত হলেও মুখে মুখে পালার জন্য গান রচনা করে দিতেন। তাঁর রচিত তিনটি গানের কথা জানা গিয়েছে ঃ

(১) কেন কাঁদে প্রাণ তাঁরই তরে—
সে যে নহে অন্তরঙ্গ
কুল করে যে ভঙ্গ,
সাধুর ঘরে যেন চোরে চুরি করে।

(২) শুন রাধে বিনোদিনী
চিন্তা কেন কর ধনী
উপায় করিব আমি,
হয়ো না উতলা।
ব্রজে তুমি রাইকিশোরী,
ছলেতে আয়ানের নারী
গোলোকে গোলোকেশ্বরী,
আপনি কমলা॥

(৩) এসেছি একেলা ভবে নিঃসম্বলে যেতে হবে
মন তুমি মজো না এ সংসার-ফাঁদে।
তুমি ওহে চিরদ্বারী, ওহে ত্রিভঙ্গমুরারী
ঠাঁই দিয়ো, আমায় ঐ রাঙাপদে॥

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি'তে অক্ষয়কুমার সেন লিখেছেন যে, প্রথম গানটি ডাকাত-বাবা তারকেশ্বরের পথে শ্রীমাকে গেয়ে শুনিয়েছিলেন

এবং এই গানটি তাঁর খুব ভাল লেগেছিল। অক্ষয়কুমার সেন মায়ের মুখেই সেকথা শুনেছিলেন। (দ্রঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি, ৮ম সং, ১৩৭৮, পৃঃ ২১২)

১৯১০-১৯১১ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল-মে (বৈশাখ) মাসে একদিন বেলগাছের ডাল কাটতে গিয়ে ডাকাত-বাবা গাছ থেকে পড়ে যান। তাঁর মাথায় খুব চোট লাগে এবং সে-আঘাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। ডাকাত-বাবার মৃত্যুর ৯।১০ বছর পর ডাকাত-মা মারা যান।

শ্রীমায়ের সেবারের যাত্রায় সহযাত্রী ছিলেন ভূষণ মণ্ডলের মা, সৌখুনী নামে জয়রামবাটীর এক বিধবা সদ্গোপ-কন্যা (মায়ের শৈশবের 'সই'), ঠাকুরের ভাইঝি লক্ষ্মী-দিদি এবং ভাইপো শিবু-দাদা। লক্ষ্মী-দিদির কাছে মুড়ির পুঁটলির মধ্যে মায়ের গয়না লুকানো ছিল। (শ্রীশ্রীসারদাদেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, ১০ম সং, ১৯৯৩, পৃঃ ৩০) শ্রীমায়ের সেবারের যাত্রার সঠিক সময় নিয়ে মতভেদ আছে। শ্রীমা নিজে সেসম্পর্কে কিছু বলেননি। এসম্পর্কে তেলো গ্রামের সন্তান অধ্যাপক তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ গবেষণা করে আমাদের জানিয়েছেন :

"মায়ের ডাকাত-বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎকার পর্বের সময়কাল গণনায় বিশেষ বিভ্রান্ত হতে হয়। কারণ, শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনীকার স্বামী সারদানন্দ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-এ ঐ ঘটনার সময়কাল উল্লেখ করেননি, অথচ মায়ের বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থে আমরা নিম্নলিখিত সময়সূচীর উল্লেখ পাই :

"(ক) স্বামী গম্ভীরানন্দের 'শ্রীমা সারদা দেবী' গ্রন্থে (১৩৭৫, পৃঃ ৯৪-৯৯) এই ঘটনার সময়কাল অনুল্লিখিত।

"(খ) শ্রীদুর্গাপুরী দেবীর 'সারদা-রামকৃষ্ণ' গ্রন্থেও (১৩৬১, পৃঃ ৬৬-৭০) এই ঘটনার সময়কালের উল্লেখ নেই।

"(গ) ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যের 'শ্রীশ্রীসারদাদেবী' গ্রন্থে (১৩৯৩, পৃঃ ৩০) এই ঘটনার সময়কাল হিসাবে বলা আছে—১২৮৪ সালের (১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দ)... শীতকালীন ঘটনা।'

"(ঘ) মানদাশঙ্কর দাশগুপ্তের 'শ্রীশ্রীমা সারদামণিদেবী' গ্রন্থে (১৩৯০, পৃঃ ৩৪) উল্লেখ আছে—'শ্রীশ্রীমা একবার [সম্ভবতঃ চতুর্থবার, ১৮৭৭ ফেব্রুয়ারি (মাঘ-ফাল্গুন ১২৮৩)] পদব্রজে দক্ষিণেশ্বর আসিবার পথে ডাকাতের হাতে পড়িয়াছিলেন।'

"(ঙ) ক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরীর 'শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত' (১৩৬০, পৃঃ ১১৬) গ্রন্থে বিবৃত আছে—'সম্ভবতঃ ১২৮১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে) মাতাঠাকুরানী দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন। আসিবার সময় পথিমধ্যে এক অদ্ভুত ব্যাপার (ডাকাত-বাবার ঘটনা) ঘটিয়াছিল।'

"(চ) স্বামী তেজসানন্দের 'শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী' (১৩৬৯, পৃঃ ৯৭) গ্রন্থে ডাকাত-বাবার ঘটনাকাল হিসাবে ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসকে চিহ্নিত করা আছে।

"(ছ) 'শতরূপে সারদা' গ্রন্থে (১৯৮৫, পৃঃ ৮১৩-৮১৪) উল্লেখ আছে—'ঘটনাটি যে ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে ঘটেনি সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ, শ্রীমা তাঁর সঙ্গিনীদের মধ্যে লক্ষ্মীদেবীর উপস্থিতির কথা বলেছেন। লক্ষ্মীদেবী সঙ্গিনীরূপে প্রথম আসেন ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে। লক্ষ্মীদেবীর প্রথমবার আগমনের সময়েও ঘটনাটি ঘটেনি, কারণ সেসময় সঙ্গে ছিলেন [মায়ের] মাতা শ্যামাসুন্দরী দেবী। [ডাকাত-বাবার ঘটনায়] শ্রীমা তাঁর মায়ের উপস্থিতির কথা কখনো বলেননি। [তাছাড়া] শ্যামাসুন্দরী কন্যাকে পরিত্যাগ করে অগ্রসর হবেন, এটা সম্ভবও নয়। সুতরাং এটি ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দের পরবর্তী কালের ঘটনা, সেসময় লক্ষ্মীদেবী [মায়ের] সহযাত্রিনী ছিলেন।'

"অথচ অন্যান্য তথ্য অনুসন্ধানে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, 'লক্ষ্মীমণিদেবী ১৮৭৩ থেকে ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দ অবধি প্রায় দীর্ঘ ১৩ বছর দক্ষিণেশ্বরে নহবত ঘরে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর সঙ্গে একত্রে বাস করেছেন।' (শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাদেবীর স্বজনবর্গ—নির্মলকুমার রায়, কথামৃত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃঃ ১১৭)। মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত উল্লেখ করেছেন : 'তিনি (লক্ষ্মীমণিদেবী) চন্দ্রাদেবীর মৃত্যুর (১৮৭৬)

পূর্ব হইতেই মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে মায়ের কাছে আসিয়া রহিয়াছেন।' (পৃঃ ৭৫) এছাড়া আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়, যা লক্ষ্মীমণিদেবীর দক্ষিণেশ্বরে আগমন ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে ঘটেছে বলে সিদ্ধান্ত টানতে সাহায্য করে। ঘটনাটি হলো—'তাঁহার (ঠাকুরের) ভাগিনেয় হৃদয় একদিন নহবত ঘরে কালীবাড়ির প্রসাদ দিতে গিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া মা ও লক্ষ্মী-দিদির সহিত গল্প করেন। ঐসময়ে ঠাকুর তাঁহার ঘরে বসিয়া মাঝে মাঝে হৃদয়ের উচ্চহাসি ও কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেছিলেন। হৃদয় ফিরিয়া আসিলে ঠাকুর তাঁহার ঐ আচরণের জন্য তাহাকে বিশেষভাবে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "যাবি আর দিয়ে চলে আসবি। খবরদার, কখনো যেন আর দেরি না হয়।" ' (শ্রীশ্রীমা সারদামণিদেবী, পৃঃ ৫৭) এই ঘটনাও ব্যক্ত করে যে, লক্ষ্মী-দিদি ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দের আগেই দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন, যেহেতু হৃদয় ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করেছেন। ডাকাত-বাবার কাহিনীর সময়কাল স্বামী সারদানন্দ বা স্বামী গম্ভীরানন্দের গ্রন্থে উল্লেখ নেই। কিন্তু মায়ের অন্যতম ভক্ত ও শিষ্য মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত তাঁর গ্রন্থে উল্লিখিত ঘটনার সময়কাল হিসাবে ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দকে উল্লেখ করেছেন এবং ঐসময়ে মায়ের দক্ষিণেশ্বর-যাত্রার কথা স্বামী গম্ভীরানন্দের গ্রন্থেও উল্লিখিত। সে কারণে আমাদের অনুমান— সম্ভবতঃ ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি (১২৮৩ সালের মাঘ-ফাল্গুন) মাসে মায়ের কলকাতা-যাত্রার সঙ্গে ডাকাত-বাবার ঘটনা সম্পর্কিত।" (অধ্যাপক তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'শ্রীশ্রীমা ও ডাকাত-বাবা' গ্রন্থে (১৯৯৪) ১২-১৪ পৃষ্ঠায় ১১ সংখ্যক পাদটীকাতেও এই আলোচনা করেছেন।)

বেশ কয়েক বছর আগে তেলো গ্রামের অধিবাসীদের উৎসাহে এবং শ্রীশ্রীমায়ের সেবক স্বামী পরমেশ্বরানন্দের (কিশোরী মহারাজ) উদ্যোগে পূর্বতন তেলোর চটিতে (যেখানে শ্রীমাকে ডাকাত-বাবা ও ডাকাত-মা সেই রাত্রিতে রেখেছিলেন) মায়ের মূর্তি-সহ একটি মন্দিরও স্থাপিত হয়েছে (৩ মে ১৯৭৭), প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'তেলুয়া

রামকৃষ্ণ-সারদা সেবাশ্রম' (১৪ মার্চ ১৯৬৫, ফাল্গুন সংক্রান্তি)। প্রতিবছর সেবাশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব উপলক্ষে ধর্মসভাদি অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, স্বামী পরমেশ্বরানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের মূর্তি অনুমোদন করেছিলেন এবং মূর্তিটি এমনভাবে করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন মনে হবে মায়ের বয়স তখন ২৪ বছর, অর্থাৎ যে-বয়সে তেলো-ভেলোর ঘটনাটি ঘটেছিল। তাতেও ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দটিই আসে। আশ্চর্য যোগাযোগ! ঠিক ১০০ বছর পর তেলোতে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির ও মূর্তি প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দে (৩ মে বুদ্ধপূর্ণিমার দিন)।

কলকাতা থেকে তেলো-ভেলো যেতে হলে আরামবাগ, কামারপুকুর, জয়রামবাটী, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর ও দুর্গাপুর-গামী এক্সপ্রেস বাসে মুথাডাঙা স্টপেজে নামতে হবে। অথবা তারকেশ্বর থেকে আরামবাগ-গামী ১৬ নং বাসে ঐ স্টপেজে নেমে সেখান থেকে ১৬এ নং বাসে ভেলুয়া বা ভেলো কালীতলা (তেলো-ভেলোর 'ডাকাত-কালী') স্টপেজে নামতে হবে। তারপর দশ-পনের মিনিটের হাঁটাপথ। □

শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহ—দুটি শোনা ঘটনা

শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

করুণাময়ী শ্রীশ্রীমায়ের সম্পর্কে দুটি ঘটনা মনে পড়ছে। প্রথমটি আমার বাবার মুখে শোনা। পূজনীয় স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ মহারাজও (রামময় মহারাজ) একটি চিঠিতে ঘটনাটির সত্যতা আমার কাছে উল্লেখ করেছিলেন। দ্বিতীয়টিও আমার শোনা।

আমার বাবা প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জয়রামবাটীর কাছাকাছি হুগলী জেলার শ্যামবাজার গ্রামে বাস করতেন। বাবা ও আমার মা শ্রীশ্রীমার কৃপা লাভ করেছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের উৎসাহে ও প্রেরণায় ঐ দরিদ্র অনুন্নত অঞ্চলে বদনগঞ্জ গ্রামে তিনি ১৯১০ সালে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই ঐ বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ঐ বিদ্যালয়েরই প্রথম দিকের ছাত্র ছিলেন স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ। তিনি শ্রীশ্রীমার কাছে অনেকদিন কাটিয়েছিলেন। বাবা ঐ অঞ্চলের ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টও ছিলেন।

ছেলেবেলায় আমি বাবার কাছে শুনেছিলাম, একদিন তিনি জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতে আছেন। এমন সময় একজন একটি বিশেষ চিঠি বাবার হাতে দেয়। সেইদিনই সন্ধ্যার পরে হলেও বাবা যেন অবশ্যই গ্রামে ফিরে আসেন—একথা চিঠিতে লেখা ছিল। বাবা সেইমত চলে আসার জন্য প্রস্তুত হয়ে মাকে প্রণাম করতে গেছেন। বাবার বিরুদ্ধে তখন নানা কারণে গ্রামীণ শত্রুতা চলছে। পরে জানা গিয়েছিল যে, ঐ রাত্রে নির্জন খালের ধারে বাবাকে মেরে ফেলার এক ষড়যন্ত্র করে ঐ চিঠি পাঠানো হয়েছিল। শ্রীশ্রীমা চিঠির কথা শুনে বললেন : "যার চিঠি, তার হাতের লেখা তুমি চেন?" বাবা বললেন : "হ্যাঁ, মা—অমুকের।" "যে চিঠি নিয়ে

এসেছে তাকে তুমি চেন?" বাবা বললেন : "না মা, চিনি না।" শ্রীশ্রীমা বললেন : "না বাবা, আজ রাত্রে যেতে হবে না। কাল সকালে অন্য রাস্তা দিয়ে মড়াগেড়ে হয়ে অম্বিকা চৌকিদার ও রামময়কে সঙ্গে নিয়ে যেও।" শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে বাবা বললেন : "না মা, আজ যাব না—আপনার কথামত কালই যাব।" শ্রীশ্রীমায়ের আদেশে বাবা সেদিন না গিয়ে পরদিন সকালে অম্বিকা চৌকিদার ও রামময় মহারাজকে নিয়ে মড়াগেড়ের পথে গ্রামে ফেরেন। বাবা বলতেন : "যা হয় হোক, মায়ের কোন আদেশ আমি কখনো অমান্য করতে পারিনি।" বাবা তখনো জানতেন না, তাঁকে হত্যার চক্রান্ত হয়েছিল সেই রাত্রে। কিন্তু সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী শ্রীশ্রীমা তা জানতে পেরেছিলেন। তাই সেদিন বেরতে নিষেধ করেছিলেন। বাবার মুখে পরে শুনেছিলাম যে, একটি ঘটনা মিথ্যা সাজিয়ে বাবাকে খবর দেওয়া হয়েছিল যাতে বাবা সেইরাত্রে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন।

অনেক ছেলেবেলায় এই ঘটনাটি শুনেছিলাম। তখন শ্রীশ্রীমার ঐশী শক্তি সম্বন্ধে কোন কৌতূহলও জাগেনি। বাবা মারা যাওয়ার প্রায় আটত্রিশ বছর পরে রামময় মহারাজের কাছে ঘটনাটির সত্যতা সম্পর্কে জানতে ২৯।১১।১৯৮৪-তে চিঠি লিখি। তার উত্তরে ৫।১২।১৯৮৪ তারিখে জয়রামবাটী থেকে রামময় মহারাজ আমাকে যে-চিঠি দেন তার প্রাসঙ্গিক অংশ : "হ্যাঁ, শ্রীশ্রীমা পূজনীয় মাস্টার মহাশয়কে [আমার বাবাকে] রাত্রে যেতে বারণ করেছিলেন। পরদিন ভোরে আমাকে ও অম্বিকা চৌকিদারকে সঙ্গে নিয়ে মড়াগেড়ের পথে যেতে বলেছিলেন। আমরা তাই গিয়েছিলাম।... ঘটনাটি ১৯১৭ সালের।"

অপর ঘটনাটি এবার বলি। আমাদের বাড়িতে বাবার আমল থেকে এক বৃদ্ধ বাগ্দী ছিল—তাকে বাল্যকাল থেকে আমরা 'শিবু-কাকা' বলতাম। সে-ও আজীবন আমাদের 'তুই তুই' বলে নাম ধরে ডাকত।

শুনেছিলাম, সে পূর্বজীবনে ডাকাত ছিল—পরে শ্রীশ্রীমায়ের প্রভাবে বদলে যায়।

একদিন জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসবে সারাদিন আনন্দে কাটিয়ে সন্ধ্যার পরে হেঁটে হেঁটে আমাদের গ্রামে ফিরেছি। শিবু-কাকার তখন ৮৫ বছর বয়স। চোখে ভাল দেখে না। বসে বসে হ্যারিকেনের আলোয় তামাকপাতা কাটছে তামাক তৈরি করার জন্য। শিবু-কাকা আমায় দেখে বলল : "কিরে, এত অন্ধকারে এত দেরি করে কোথা থেকে এলি?" আমি বললাম : "জয়রামবাটীতে মার বাড়িতে উৎসব ছিল। সারাদিন সেখানে কাটিয়ে সন্ধ্যার পরে বেরিয়েছি, তাই দেরি।" শিবু-কাকা আমার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল : "হ্যাঁরে, অনেক ভক্ত, অনেক সাধু-সন্ন্যাসী এসেছিল? খুব পুজো হলো? খুব প্রসাদ পেল সবাই?" আমি বললাম : "হ্যাঁগো কাকা, অনেক সাধু-সন্ন্যাসী, ভক্ত এসেছিলেন। সারাদিন খুব গান, কীর্তন, পুজো হলো। অনেকে প্রসাদ পেল।"

আমার কথায় শিবু-কাকা অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল : "আমি আর কোনদিন জয়রামবাটী যেতে পারব নারে, বাপ। তোর বাবা জিনিসপত্র দিয়ে আমাকে জয়রামবাটীতে মায়ের কাছে পাঠাত। আমি ছোট জাতের। কিন্তু আমাকেও মা বামুন-কায়েতের ছেলেদের মতো আদর-যত্ন করে খেতে দিত। আমাকে কত ভালবাসত! সেসব আর কখনো পাব না। শরীরের যা অবস্থা তাতে সেখানে যেতেও আর পারব না। জানিস, একদিন মায়ের কাছে গিয়েছি। মা তখন স্নান করতে যাচ্ছে। মা বলল, 'শিবু, বোস, আমি আসছি।' একটু পরে মা স্নান করে এসে আমাকে গুড়, মুড়ি আর অনেক প্রসাদ খেতে দিল। ভাবলাম, মা-ই তো মা লক্ষ্মী। মনে মনে করছি, ভদ্রলোকদের মতো মায়ের পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে পেলে আশা মেটে। চলে আসব বলে দূর থেকেই মাকে প্রণাম করছি। মা বলল, 'আয় শিবু, কাছে এসে প্রণাম কর।' আমি মায়ের কাছে

এসে তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম রে বাপ!" শিবু-কাকা কথা বলছে, আর হাউ হাউ করে কাঁদছে। তার কথা শুনে আমার চোখেও জল এল। ভাবলাম, আমি লেখাপড়া শিখেছি, ভদ্রলোক; আর ও পুরনো দাগী ডাকাত, নিরক্ষর, জাতে বাগ্দী। কিন্তু ও-ই তো ধন্য। মায়ের কত আশীর্বাদ ও পেয়েছে। শিবু-কাকার কথা রামময় মহারাজকে বলাতে তিনি আবেগভরে বলেছিলেন ঃ "সূর্যরশ্মি পদ্মফুলের ওপরেও পড়ে আবার নোঙরা জিনিসের ওপরেও পড়ে। তেমনই শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহ, করুণা, আশীর্বাদ ভাল-মন্দ, পাপী-পুণ্যবান সকলের ওপরই সমভাবে বর্ষিত হচ্ছে। কেউ বুঝতে পারে, কেউ পারে না।" □

ঘটন না অঘটন?

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

দু-একটা মিরাকুল যে চোখে দেখিনি তা নয়—মানে আমার নিজের জীবনেই এমন ঘটনা ঘটেছে, যাকে মিরাকুল বলাই উচিত। সে সব কাহিনী লিখেওছি—এক পূজাসংখ্যার 'যুগান্তরে'—'কাকতালীয়?' এই নাম দিয়ে।

আরও শুনেছি কিছু কিছু।

এক সাধুর[১] মুখে শুনেছি, একটি সবজিওলা বর্ধমান স্টেশনে বসে ছিল, লোকাল ট্রেনে মাল নিয়ে কলকাতা আসবে বলে। মাল বলতে বিশেষ কিছু ছিল না সেদিন, কিছু শাক ছিল মাত্র। তার মধ্যে কচি চড়ুই শাক বা চাঁপানটেই প্রধান। পাশে বসে ছিলেন এক বৃদ্ধামতো মহিলা, পাড়াগাঁয়ের সদাকুণ্ঠিত জড়োসড়ো গোছের বয়স্কা একটি মেয়েছেলে। তিনি বারবারই সেই শাকগুলিতে হাত বুলিয়ে দেখতে লাগলেন, যেন স্পর্শেই ওদের স্বাদ অনুভব করছেন, আর মুখে বলতে লাগলেন : "বাঃ বাঃ, অনেকদিন এমন টাটকা শাক দেখি নি বাবা, তা যা বলব!"

বুড়ির রকমসকম দেখে মায়া হলো শাকওলার। বললে : "তা নাও না বুড়ি-মা, দু আঁটি তিন আঁটি—যা ইচ্ছে! স্বচ্ছন্দে নাও, পয়সা লাগবে না।"

মহিলা মাথা নেড়ে বললেন : "না বাবা, এখন নিতে পারব না। এখন ঘরকে যাচ্ছি না।"

---

১ গজেন্দ্রকুমার মিত্রের কাছে শুনেছি সাধুটি হলেন স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ মহারাজ। তিনি একসময়ে (১১৫৮-১১৬৭) 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী' তথা উদ্বোধন কার্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ মহারাজের কাছে ঘটনাটি আমরাও শুনেছি। শুনেছি, ঘটনাটি ঘটেছিল তাঁরই অধ্যক্ষতাকালে।—সম্পাদক।

তারপর একটু থেমে বললেন : "তুমি কোথায় যাবে বললে? শ্যামবাজারে যাও শাক বেচতে? তা বাবা যদি তোমার দয়া হয়, একদিন বরং আমার ঘরে দু-আঁটি শাক ফেলে দিয়ে এসো। যেদিন বাঁচবে টাঁচবে—"

"আমি ঠিকানা পাব কোথায়?"

"কিছু না, শ্যামবাজারের বাজার থেকে বেরিয়ে একটু উত্তরে—বাগবাজার, সেই মুখে যেয়ে জিজ্ঞেস করো, মার বাড়িটা কোথায়, কেউ না কেউ দেখিয়ে দেবেই—"

তা গিছল সে লোকটি। বাজারে যাবার আগেই গিছল। আলাদা করে চাঁপানটে একটা ছেঁড়া কাপড়ে বেঁধে নিয়ে। বাড়ি খুঁজে বের করতেও কোন অসুবিধে হয়নি। কিন্তু মুশকিল হলো—লোকটি যখন বলল : "এই ঠিকনার একটি বুড়ীমতো মেয়ে ছেলে থাকে, আমাকে বলেছেন একটু নটে শাক দিয়ে যেতে—তাই আমি এনেছি।"

সেটা আসলে মঠ, সাধুরা থাকেন। তাঁরা তো অবাক। "না বাপু, এখানে কেউ মেয়েছেলেটেলে থাকে না। দেখতে পাচ্ছ তো সাধুদের আস্তানা—এখানে মেয়েছেলে থাকবেই বা কেন? নিশ্চয় তোমার ভুল হয়েছে।"

তবু লোকটি বারবারই বলতে লাগল : "না, সে বুড়ী-মা আমাকে অনেক করে বলেছেন যে—"

বলতে বলতেই নজরে পড়ল, সিঁড়ির বাঁকে বিশ্বজননী সারদামণির নানা বয়সের ছবি—এক ফ্রেমে বাঁধানো—সে বলে উঠল : "বা রে! এই তো। এই বুড়ী-মাই তো আমাকে নটে শাকের কথা বলেছেল—আপনারা বলছ তিনি এখানে থাকেন না!"

সাধুরা তো অবাক! মাগো, তোমার দুটো শাক খাবার ইচ্ছে হয়েছিল তো আমাদের বলোনি কেন!* □

---

* সাধনা ও জন্মান্তর—গজেন্দ্রকুমার মিত্র, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃঃ ৬৭-৬৮

ভানু-পিসির গান

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য

ভানু-পিসির গান, অর্থাৎ ভানু-পিসি যে-গানগুলি গাইতেন। ভানু-পিসি ওরফে মানগরবিনী। ব্রজগোপীর ভাবে ভাবিতা, জয়রামবাটীর এক সদ্‌গোপ দুহিতা। নিরক্ষর পল্লীবালা। স্বভাবসিদ্ধ অনুরাগে রামকৃষ্ণচরণে সমর্পিতজীবনা, সারদা-সঙ্গ-সুখিতা—শ্রীমার ব্যথার ব্যথী, প্রাণের সখী। শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্য ও স্নেহধন্যা। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীতে 'ভানু-পিসি' নামে সুপরিচিতা। ভানু-পিসির গাওয়া নিম্নলিখিত পাঁচখানি গান আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি।

(১)

তোরে ভালবাসি মন। তাই দিলাম হরির নাম অমূল্য রতন॥
দিলাম হরির নাম রাখ যত্ন করে এ দেহভাণ্ডারে;
দেখো, দেখায়ো না রিপু ছজনারে।
মন রে, তোমায় দিতে হবে কর, রবিসুত কর ধরিবে যখন॥
মন রে, দগ্ধ আছ সদাভবকোপানলে,
স্নান করে এস জাহ্নবীর জলে;
মুখে হরির নাম নাও তুলে, সকল যাবে ভুলে,
আর হবে না জনম॥

(২)

প্রেমনগরে রাই মহাজন, তস্য খাতক শ্রীহরি।
কস্য কর্জ্জপত্র লিখে দিয়েছেন বংশীধারী॥
পরিশোধের কথা আছে—দেবেন চূড়াধড়া বেচে;
সম্ভাবনা তার কী বা আছে—কেবল বাঁশের বাঁশরি॥

(৩)

শ্যামের নাগাল পেলাম না লো সই,
আমি কী সুখে আর ঘরে রই।
শ্যাম যে মোর নয়নের তারা,
তিল-আধ না দেখলে সই হই দিশেহারা;
আমি গৃহকর্ম তেয়াগিয়ে শ্যামের মুখপানে চেয়ে রই॥
শ্যাম যখন বাজায় গো বাঁশি,
আমি তখন যমুনাতে সই জল লয়ে আসি,
আমার কাঁখের কলসী কাঁখে রইল,
শ্যামের বদন-পানে চেয়ে রই॥

(৪)

কোথা রইলে হে মধুসূদন।
যারে না দেখলে ঝুরে দুনয়ন॥
আমরা ব্রজের অবলা নারী,
অনাথ করে ছেড়ে গেছেন মোদের বঙ্কুবিহারী;
আমরা যমুনাতে জলকে যেতে, কলসী রেখে,
খুঁজে এলাম ভাণ্ডীরবন॥

(৫)

আদরিণী নাম ঘুচেছে; গরবিনী নাম ঘুচেছে,
আর কি ব্রজে সে সুখ আছে।
হরি বিনে বৃন্দাবনে দিনে অন্ধকার হয়েছে॥
ফলে ফুলে কুঞ্জকানন ছিল যেমন ইন্দ্রভবন,
সে সুখ-সম্পদ এখন কালাচাঁদের সঙ্গে গেছে—
দীননাথের সঙ্গে গেছে॥
পাতাচাপা কপাল কুব্জার, সুখসায়রে ভেসে গেছে।
পাথরচাপা কপাল রাধার, দুখসায়রে ডুবে আছে॥□

শ্রীশ্রীমাকে লিখিত স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পত্র*

শ্রীশ্রীগুরুদেব-শ্রীপাদপদ্মভরসা

বিবেকানন্দ সোসাইটি, কলম্বো
২৮।৬।১৯০৬

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর শ্রীচরণকমলেষু

মা, আপনার আশীর্বাদে কালী [স্বামী অভেদানন্দ], আমি ও বসন্ত [স্বামী পরমানন্দ] ভাল আছি। কালী এখানে অনেক বক্তৃতা দিয়াছে। এই লঙ্কাদ্বীপের যাবতীয় লোক কালীর প্রতি বিশেষ ভক্তি দেখাইয়াছে। কালী অনেকগুলি বক্তৃতা এখানে করিয়াছে। আমরা এদেশের অনেক শহর দর্শনাদি করিয়াছি এবং সেখানে সেখানে কালীর বক্তৃতা হইয়াছে।

আমরা অদ্য সন্ধ্যার সময় জাহাজ করিয়া তুতকুড়ি নামক ভারতবর্ষের দক্ষিণে অবস্থিত একটি শহরে যাইব। কাল সকালে তথায় পৌঁছিব। সেখানকার লোকেরা কালীকে বিশেষ সমাদর ও অভ্যর্থনা করার জন্য প্রস্তুত আছে। আপনি আশীর্বাদ করুন যেন কালী দীর্ঘায়ু হইয়া শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের কার্য করিতে সমর্থ হয়। আপনার আশীর্বাদ যেন বসন্ত ও আমার প্রতি চিরকাল থাকে। ইতি

আপনার সন্তান
শশী

আপনি আমাদের সকলের অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ জানিবেন। ইতি

সন্তান
শশী

---

* সৌজন্য : ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য

শ্রীশ্রীমাকে লিখিত
স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের পত্র

শ্রীশ্রীগুরুদেব-শ্রীপাদপদ্মভরসা

The Hindu Temple
2963 Webster St.
San Francisco, Calif., U.S.A
২৮শে শ্রাবণ ১৩১৬, শুক্রবার

পরমারাধ্যা পরম পূজনীয়া শ্রীশ্রীমতী মাতাঠাকুরানী-শ্রীপাদপদ্মেষু—

মা ব্রহ্মময়ি,

আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানিবেন। মা, আপনি কলিকাতায় আসিয়াছেন শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। আশাকরি আপনার শরীর বেশ ভাল আছে এবং বাত অথবা অম্বল প্রভৃতি এতদিনে আপনার শরীর হইতে একেবারে চলিয়া গিয়াছে। আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশীর্বাদে সুশীল [স্বামী প্রকাশানন্দ], হরিপদ [স্বামী বোধানন্দ] ও আমি আজকাল বেশ ভাল আছি। এখানকার আর সকলেই ভাল আছেন। শরতের ভাই নরেশ [স্বামী সারদানন্দের ভাই নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী] এই দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে চাকরি করিতেছে ও বেশ ভাল আছে। হরিপদ আজকাল এখানে আছে, শীঘ্রই চলিয়া যাইবে নিজের কর্মক্ষেত্রে।

মা, আপনার কৃপা অসীম। আমি এতদিন বিদেশে রয়েছি, তত্রাচ মা, আপনি আমাকে ফেলিয়া দেন নাই। প্রায়ই মা, আপনি আমাকে

স্বপ্নে দেখা দেন। আপনার কৃপায় আজও আপনার সেবা করিতে স্বপ্নেও ভুলি নাই। আবার যে কবে মা, আপনার সেবায় যাইয়া, চাক্ষুষ করিয়া, আবার কৃতার্থ হইব, তাহা কিছুই বলিতে পারি না। সবই মা আপনার ও শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপার উপরেই নির্ভর করে। এই মন্দির নির্মাণ করিতে এত দেনা করিতে বাধ্য হইয়াছি যে, তা আর বলবার নয়। প্রায় ৪৫ হাজার টাকার দেনা ঘাড়ে ঝুলছে। তাহা পরিশোধ করিতে না পারিলে আমার এখান থেকে যাওয়া উচিত নয়। এই বিবেচনায় আজও এখানে থাকিতে হইয়াছে। তা না হলে এতদিনে চলিয়া যাইতাম। এই মন্দির হওয়া অবধি, আপনাদিগের কৃপায়, মা, তাঁর নাম ও হিন্দুধর্মের নাম খুব লোকে জানিতেছে। এখানকার দেশ-দেশান্তর হইতে লোকজন প্রায়ই এই হিন্দুমন্দির দর্শন করিতে আসে। কিন্তু মা, কিছু মনে করিবেন না, আমার অদৃষ্টক্রমে একটাও দাতা লোক আসে না। কেহ কেহ ধনী লোক আসে, কিন্তু তারা সব এত কৃপণ যে তা আর কি বলিব! অবশ্য আপনাদিগের কৃপায়, টাকাকড়ির দৌলতে অথবা দেনার দৌলতে যে টাকাকড়ির দিকেই সব মন যাইয়া আপনাদিগকে ভুলিয়া যাইব, তা মা আজও হয় নাই। বিশ্বাস যে, মা, আপনার সন্তানের এত দুর্দশা কখনই হবে না। আপনার সন্তান আপনার এবং ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম কখনই ভুলিতে পারিবে না। তবে মা, জানি না, যদি আপনি বা ঠাকুর তামাসা দেখবার জন্যে আবার এক উলটো মন্ত্র পড়িয়া দেন, তাহলেই যা নাচার। কিন্তু মা, তাহলেও বোধ হয়, যেন সেই অন্ধকূপ হতেও আপনাদিগকে ডাকতে ভুলিব না। তাহা অন্য লোকে জানিতে পারিবে না বটে; অন্য লোকে বুঝিবে যে, এইবার "সন্তান" অন্ধকারে পড়ে মাকে একেবারে ভুলে গেছে; কিন্তু মা, মা জানেন (অর্থাৎ আপনি জানেন) আর আপনার সন্তান জানে যে, ঠাকুর আর মা ভোলবার জিনিস নহে। এসব জানি, কিন্তু তবুও মা, আপনার কৃপা ও ঠাকুরের কৃপা এবং আশীর্বাদ

আরও চাই, আরও চাই। মা আশীর্বাদ করিবেন যেন সত্যি সত্যি আপনাদিগকে আদৌ না ভুলিয়া যাই; দোহাই মা! আমাদের এখন যত কিছু বিশ্বাসভক্তি, সত্যি কথা বলিতে কি মা, ও সবই হয় জেঠামি, না হয় মা, মিথ্যাকথা বা জুয়াচুরি। আমার নিজের কথা মা, আপনাকে সব খুলে বলতে পারি। আমার নিজের ভক্তিবিশ্বাস যেন ছেলেখেলা, ছেলে-ভুলানো বিশ্বাসভক্তি, বা লোকঠকানো বিশ্বাসভক্তি। কখন কখন বোধ হয় যেন মা, আমার খুব বিশ্বাসভক্তি আছে; আবার কখন কখন বোধ হয় যেন মা, না ওসব আমার মিথ্যাকথা, জুয়াচুরি ও বদমায়েসি। মা, একথা আপনাকে সত্যকথা লিখিলাম।

মা, সম্প্রতি আশু[১] এক পোস্টকার্ড আমাকে লিখিয়াছে আপনার ঠিকুজি-কোষ্ঠীর জন্য। মা, আমি তো অনেকদিন হইল হয় দিদিমাকে, না হয় প্রসন্ন-মামাকে বা অপর কোন মামাকে ফিরাইয়া দিয়াছিলাম। আমি নকল করিয়া লইয়াই ফিরাইয়া দিয়াছিলাম। সে অনেকদিন হইল, এখন তো আমার ঠিক মনে নাই কাকে ফিরাইয়া দিয়াছি। আমার কাছে তো এখানে নাই। তবুও মা, একবার আশু বা আর কাউকে দিয়া শশী-ডাক্তার [ডাঃ শশিভূষণ ঘোষ] বা মহেন্দ্র মাস্টার মহাশয়কে [শ্রীম] জিজ্ঞাসা করাইবেন, যদি ভুলিয়া আর কাহারও নিকট দিয়া থাকি। কিন্তু আমার বেশ বোধ হইতেছে যেন আমি কোন মামা বা দিদিমার নিকট দিয়াছিলাম। যাহা হউক, যদি তাহা হারাইয়া গিয়া থাকে, কিছু ক্ষতি তাহাতে হইবে না; কারণ, আমার নিকট আপনার সেই কোষ্ঠীর ঠিক ঠিক নকল এখানে আমার খাতায় তোলা আছে। আমি সেই খাতা হইতে আপনাকে নকল

---

১ শ্রীশ্রীমায়ের অন্যতম সেবক ও মন্ত্রশিষ্য এবং স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের সহোদর আশুতোষ মিত্র। তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর সন্ন্যাস-নাম হয়েছিল—স্বামী সত্যকামানন্দ। পরে তাঁকে সঙ্ঘ ত্যাগ করতে হয়। বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে তাঁর দীর্ঘ ও অন্তরঙ্গ মাতৃস্মৃতি প্রকাশিত হয়েছে। স্মৃতিকথাটি প্রথমে তিনি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছিলেন।—সম্পাদক

করিয়া এই চিঠির সঙ্গে পাঠাইলাম। আর এই চিঠির ভিতর পাঁচ টাকা আপনার হাতখরচের জন্য পাঠাইলাম।

মা, আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমার, সুশীলের ও হরিপদর অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানিবেন। যোগেন-মা, গোলাপ-মা প্রভৃতি সকল স্ত্রীলোক ভক্তবৃন্দকে প্রণাম এবং মঠস্থ ও অপরাপর সকল ভক্তবৃন্দকেই আমাদের সকলের প্রণাম। ইতি

আপনার স্নেহাস্পদ সন্তান
দাস
সারদাপ্রসন্ন

---

* এই পত্রটির কিছু অংশ বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃঃ ৪২২-৪২৪) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এখানে সম্পূর্ণ পত্রটি উপস্থাপিত হলো। শুধু পত্রটির সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের কোষ্ঠীর যে নকল সারদা মহারাজ পাঠিয়েছিলেন, তা উক্ত খণ্ডে থাকায় পুনরায় তা উপস্থাপন করা হলো না। পত্রের যে-অংশটি আশুতোষ মিত্র তাঁর 'শ্রীমা' গ্রন্থে উল্লেখ করেননি, সেই অংশটি সহ প্রায় সম্পূর্ণ চিঠিটি আমরা ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য মহারাজের সৌজন্যে পেয়েছি।—সম্পাদক

তিরোধানের পর শ্রীশ্রীমায়ের নিত্য অধিষ্ঠান সম্পর্কে কথামৃতকারের পত্র*

[শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য উমেশচন্দ্র দত্তকে লিখিত]

শ্রীগুরুদেব-শ্রীচরণভরসা

কলিকাতা
দেবীপক্ষ পঞ্চমী, ১৩২৮

শ্রীশ্রীউমেশ বাবাজী,

আপনার পত্র পাইয়া বুঝিলাম যে, আমরা সত্য সত্য মা-হারা হইয়াছি। হায়! এক বৎসর হইল তিনি আমাদের কাছ থেকে অদর্শন হয়েছেন। শুনেছিলাম এক বৎসর পর্যন্ত মাতৃহীনের বিপদ ও অশান্তি থাকে—কিন্তু কই, দিন দিন আরও

"পড়িয়ে ভবসাগরে ডুবে মা তনুর তরী।
মায়া-ঝড় মোহ-তুফান ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করী॥
একে মন-মাঝি আনাড়ি, তাহে ছজন গোঁয়ার দাঁড়ি;
কুবাতাসে দিয়ে পাড়ি, হাবুডুবু খেয়ে মরি।
ভেঙে গেল ভক্তির হাল; ছিঁড়ে পড়ল শ্রদ্ধার পাল,
তরী হলো বানচাল, উপায় কী করি;
উপায় না দেখি আর, অকিঞ্চন ভেবে সার;
তরঙ্গে দিয়ে সাঁতার শ্রীদুর্গানামের ভেলা ধরি॥"

এখন উপায় কি? মা যদি মারেনও আবার 'মা মা' বলে ছেলে ডাকে মায়ের কোলে যাবে বলে। ছেলের উপায় কেবল 'মা মা' করা—বেড়ালছানার মতো—কাঁদা। মা যা করেন।

আপনাকে কী লিখিব—আপনারও যা দশা আমারও সেই দশা। এখন কেবল 'মা মা' করা। যে-মা বঙ্গদেশে শ্রীশ্রীদুর্গারূপে পূজা লইতে আসিয়াছেন, আজ তাঁহার বোধন হইবে; যে-মা শরীর ধারণ করে আমাদের জন্য গত বছর ৪ঠা শ্রাবণ পর্যন্ত নিশিদিন মঙ্গলচিন্তা করিয়াছেন, সেই মা কি এখন আমাদের জন্য ভাবছেন না? তাহা কখনই সম্ভবে না।

সেদিন স্বপ্ন দেখিলাম—মা বলছেন : "তুমি আমার দেহত্যাগ যা দেখেছিলে সে দেহ মায়িক, এই দেখ আমি সেইরূপই রহিয়াছি।"

Affly
শ্রীম

---

* সৌজন্য : ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য

শ্রীশ্রীমা সম্পর্কে পত্রে পুঁথিকার অক্ষয়কুমার সেনের প্রাণের কথা

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি'র রচয়িতা অক্ষয়কুমার সেন শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য উমেশচন্দ্র দত্তকে একটি পত্রে [২০ শ্রাবণ ১৩২৩ (৫ আগস্ট ১৯১৬)] লিখেছিলেন : "ঠাকুরে ও শ্রীশ্রীমায়ে এক জানিও।" কিন্তু তাঁর অনেক পত্রের সন-তারিখ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। উমেশবাবু তখন ময়মনসিংহ জেলা বোর্ডের ডাক্তার। তাঁর আমন্ত্রণে অক্ষয়বাবু একবার (১৯১৬) ঐ জেলার সুসঙ পরগনায় গিয়ে প্রায় দু-মাস ছিলেন। তাঁর ভাবময় জীবনের সংস্পর্শে ঐ অঞ্চলের, বিশেষতঃ কুল্লাগড়া গ্রামের, অনেকে ঠাকুরের ভক্ত হয়ে যান। তাঁকে নিয়ে সেখানে এক বিরাট উৎসব আয়োজিত হয় খোলা মাঠের মধ্যে। স্থানটি বৈষ্ণবপ্রধান। একদল লোক এই বলে দাবি করতে থাকে যে, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে ভোগ নিবেদন করতে হবে, অন্যের প্রসাদ তারা খাবে না। এইসময়ে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে থাকে ও অক্ষয়বাবু ঊর্ধ্বমুখে আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলতে থাকেন : "ঠাকুর, ঠাকুর! তোমার নামে এত আয়োজন সব পণ্ড হবে?—ঠাকুর—ঠাকুর!" সহসা এক ঝড় উঠে মেঘকে সোমেশ্বরী নদীর ওপারে ঠেলে দেয় ও প্রবল বর্ষণে সেখানকার গাছপালা ঝাপসা হয়ে যায়। অক্ষয়কুমার সেন তখন সোচ্ছ্বাসে বলে ওঠেন : "দেখলি বেটারা, আমার ঠাকুরের মহিমা দেখলি? তোরা বলছিস আমার ঠাকুরের প্রসাদ খাবি না!" সকলে তখন চিৎকার করে বলতে লাগল : "আমরা খাব, আমরা খাব!" অক্ষয়কুমার সেনের নিম্নে উপস্থাপিত পত্রগুলি তাঁর জীবনের শেষভাগে, দশ বছরের মধ্যে, উমেশচন্দ্র দত্তকে লেখা। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী রচনার জন্য উপাদান সংগ্রহ করতে গিয়ে চিঠিগুলি আমার হাতে এসেছিল।—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য

(১)

২১শে ভাদ্র

...যতই বিকারী অবস্থা হউক না কেন, যাদের এমন ঠাকুর ও এমন মা আছেন তাদের তরী ডুবিবার নহে। এখন ঠাকুর শ্রীশ্রীমায়ের দেহে অবস্থিতি করিয়া আর এক নূতন ধরনে খেলা করিতেছেন। শ্রীশ্রীমা যতই সহজ কথা বলুন না কেন, যতই প্রাণ আরামের কথা বলুন না কেন, সহজে ধরা দিবার লোক নহেন। কথার মানে বুঝা মহাদায়, তবে অকাট্য বাক্য। ঐ মা জগতের প্রত্যেক বস্তুতে—জগময়ী। এ-দৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত শান্তি নাই। সময়ে অবশ্য হইবে তাহার আর সন্দেহ কি! মা-দর্শনের ফল মা-দর্শন। একবার শ্রীপদস্পর্শে যে কি ফল আসে কে তার নিরূপণ বা ইয়ত্তা করিতে পারে। কোনরকমে তাঁর উপর ভালবাসা একটা আসা চাই।...

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীঅক্ষয় মাস্টার

(২)

১৬ই শ্রাবণ, কৃষ্ণা দশমী

স্নেহাস্পদ,

তোমার ২৩।৭।১৮-র পত্র পাইলাম। নবদ্বীপের ও ঈশ্বরেরও পাইলাম। কান ও সায়টিকা ভাল হইয়াছে। জ্বরের পীল অবশ্য অবশ্য পাঠাইও।

পূজনীয় শরত ঠাকুরের [স্বামী সারদানন্দের] পত্র পড়িলাম। তিনি সুহৃদ্‌বৎ ও আত্মীয়বৎ ঠিক কথাই লিখিয়াছেন। তাঁর কথা শুনাই তোমার মঙ্গল। তাঁর উভয় পত্রের মর্ম এই যে, মা যখন তোমাদিগে কৃপা করিয়াছেন এবং যাহার বলে তোমরা বুঝিয়াছ যে, আমরা ঠাকুরের ও মায়ের ও তাঁর ভক্তদের সঙ্গে এক পরিবারভুক্ত, তখন তোমরা যেখানেই থাক না কেন পরে তাঁহারা কি বস্তু অবশ্যই

জানিতে পারিবে। যদি ঠাকুরকে ও মাকে ভগবান বলিয়াই বুঝিয়া থাক, আর তাঁদের উপর ভক্তি-ভালবাসা না থাকে, তাহলে তোমাদের কিছুই হইবে না। তাই তিনি নিরুপম গোপগোপিনীদের সঙ্গে কৃষ্ণের যে কি ভাব-ভালবাসা ছিল তাহাই বুঝাইয়া তদ্বৎ আচরণ করিতে বলিয়া, তিনি যে ঠাকুরের পাদপদ্মের প্রেমিক ভক্ত তার পরিচয় দিয়া তোমাদের উপর পরম কৃপা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি প্রকাশ্যভাবে তোমার ত্রুটি না দেখাইয়া সঙ্কেতে এই বলিতেছেন যে, তুমি মায়ের উপর যে-ভক্তি দেখাইতেছ সেটি ঠিক বিমল ভক্তি নহে, ইহাতে স্বার্থপরতা মিশ্রিত আছে।... ঠাকুরকে যত ভাবিবে ততই ভালবাসা আসিবে ও তাঁর দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে। যতই তাঁর চিন্তা করিবে ততই সংসারের তুচ্ছ চিন্তাগুলি আপনি পলাইয়া যাইবে। ঠিক কথা। আর শেষকথা, মা সকলের মধ্যে রয়েছেন, তোমার স্ত্রীপুত্রের ভিতর তাঁকে দর্শনের উপায় কর।

উমেশ, তোমরা মায়ের কৃপাপাত্র, তোমাদিগে উপদেশ দিবার কোন অধিকার বা শক্তি নাই। তবে তোমরা এখন একত্রে যতগুলি আছ সকলেই আমাকে বড়দাদার মতো জ্ঞান করিয়া থাক, সেই হিসাবে লিখিতেছি যে, সত্য সত্যই আমরা ঠাকুরের পরিবারভুক্ত হইয়াছি বটে। এটি তাঁর গুণে, আমাদের গুণে নহে। তাঁর পরিবারভুক্ত হইতে হইলে আমাদের যে ভাবভক্তি থাকা উচিত তার কিছুই নাই। ইহা মায়াজনিত স্বার্থপরতা জানিতে দিতেছে না। ইহা যে কি ব্যাপার তাহা তোমাদিগের মধ্যে হাজারবার বলিলেও বুঝিতে পারিবে না এবং ঠিক সময় হইলে মায়ের কৃপায় আপনারাই বুঝিতে পারিবে। ব্যস্ত না হইয়া বিড়াল-শাবকের ন্যায় মিউমিউ রবে দিন কাটাও। মায়ের কৃপায় কিছুই জানিতে বাকি থাকিবে না। মা যাদের সহায় তাদের আর চিন্তা কি? তবে বহুজন্মের সংস্কারে নানা ভ্রমভ্রান্তি আসিবে, কিন্তু স্থায়ী হইবে না। বরং যাবার সময় পরম আলোক দেখাইবে।...

(৩)

উমেশ,

সকলে মিলে একটু ঠাণ্ডা হইয়া কিছুদিনের জন্য স্থির হইয়া বোসো। মাকে নিকটের পরিবর্তে দূরে থাকিয়া দর্শন কর। মা যে সর্বত্রে সকলের মধ্যে। এই মা আবার সশরীরে। নিকটের চেয়ে দূরে দেখায় আরও মজা। যিনি যত কৃপা পাইবেন তিনি ততই সর্বত্রে দেখিতে পাইবেন। দেখ না ঐ দেহধারী মা জগৎ লইয়া কেমন খেলিতেছেন। যত এই খেলা দেখিতে পাইবে ততই মায়ের উপর ভক্তি-ভালবাসা আসিবে। যে-অবস্থায় দেহধারিণী মা স্বচ্ছন্দে থাকিতে ভালবাসেন, আমরা তাঁকে সাক্ষাৎ দেখিতে গেলে তাঁর সে-আরামে ব্যাঘাত দেওয়া হয়। এই কথা শরত ঠাকুর তোমাকে সঙ্কেতে বলিয়াছেন। আর কথাটিও সত্য। সর্বদা মায়ের কাছে থাকা সংসারীদের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। নিকটের চেয়ে দূরে মাকে আরও ভাল দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহাতে খুব উন্নতিও হয়। সর্বদা যাবতীয় অবতারপুরুষের লীলা আন্দোলন করিবে। নানা গ্রন্থ যখন যা ভাল লাগে, তাহাই পাঠ কর। ঠাকুর যে সকল অবতারের সমষ্টি! ঠাকুরের লীলায় পুরাণ কোরান বাইবেল সব প্রমাণিত। মাকে প্রার্থনা দ্বারা এই চক্ষু মাগো। দেহকে ও মনকে একস্থানে রাখিয়া আনন্দ কর। যতদিন দেহমন ছুটাছুটি করিতে চাইবে ততদিন, জানিও, মা হাজার পত্র লিখুন আর যাই করুন তিনি এখনও তোমাকে চৈতন্য দেন নাই।...

মা তোমাকে বেশ রাখিয়াছেন। সহজে যা আসে তাই কর। এত বাদপ্রতিবাদ করিয়াও কি স্ত্রীলোককে মায়ের কাছে পাঠাইতে আছে? আমার দুবার যাওয়ায় বিঘ্ন হওয়ায় এখন চুপ মারিয়া গিয়াছি। তাঁর ইচ্ছা হইলে সহজে কাজ হয়। এই তো পত্রদ্বারা সকল কথাই চলিতেছে। সংসারে তোমার এখন অনেক কাজ বাকি।... মা তোমাকে যে পোষ্যবর্গ দিয়াছেন তারা সব মায়ের, তাদের সেবাতে মায়ের

সেবা মনে কর। তাদের সেবাতে যে মায়ের সেবা হইতেছে তাহা প্রত্যক্ষ কর। তারা কে ও তুমিই বা কে জানিবার জন্য চিন্তা কর। কিসব সামান্য বিষয় লইয়া দেহমন অস্থির করিতেছ? শান্ত হও, ধীরস্থির হও।... আমার বোধ হয়, মা তোমাকে এইসব লেখাইতেছেন। তুমি আমাকে অতিশয় ভালবাস, আমার কথায় বিশ্বাস কর, তাই আমার দ্বারা কর্তব্য কি বলাইতেছেন। আমার মতে কাজ করিলে অচিরেই পরম মঙ্গল জানিতে পারিবে। মা যেখানেই থাকুন— আমাদের মা। নিরন্তর সকলকে তিনি দেখিতেছেন। এখন নরলীলায় সদেহে। মানুষের মতো সেই দুখসুখ সুস্থদুস্থ সব আছে। তাঁর সঙ্গে এখন গর্ভধারিণীর মতো ব্যবহার করিতে হইবে। মা যখন কৃপা করিয়াছেন তখন তিনিই ভবনদী পারের বন্দোবস্ত করিবেন। আমাদিগে চঞ্চল হইতে হইবে না। খালি মিউমিউ কর। স্থির হয়ে মায়ের খেলা দেখ। তোমাদের পরম মঙ্গল নিশ্চয়। মা-দরশনে সব অমঙ্গল দূরে গিয়াছে এবং কঠোর তপস্যায় যা না হয় তাই হয়েছে। সংস্কারের ধাঁধায় দেখিতে পাইতেছ না। পরে পাইবে।

(৪)

কার্ত্তিক কৃষ্ণা চতুর্থী

স্নেহভাজন শ্রীমান উমেশ,

বিজয়ার প্রেমালিঙ্গন। তোমার ২৪।৯।(১৯)১৮ তারিখের পত্রের উত্তর জানাইতে দেরি হওয়ার কারণ হাঁপানী প্রবল হওয়া ও এই অভাবগ্রস্ত পরিবারের উপর কয়েকটি বিপদ ক্রমান্বয়ে উৎপতন। শ্রীশ্রীপ্রভুদেবের ইচ্ছায় একরকম কাটিয়া গিয়াছে।... এখন বা সত্বর মরিতেছি না, তাহা মায়ের কথায় বেশ বহুপূর্ব হইতেই বুঝিয়াছি। উমেশ! মা ভারি চাপা, সহজে ধরাছুঁয়া দেন নাই। দশকর্মান্বিত বামুনের কন্যা কিনা। তোমার উপর তাঁর অপার কৃপা, তুমি অবশ্যই বুঝিতেছ—আমি কিন্তু পারি নাই। মায়ের মহিমা ও খেলার আদি

অন্ত নাই। মায়ের কাছে ঠাকুর পর্যন্ত মুগ্ধ। মা-সম্বোধনে মা যাহাকে একবার উত্তর দিয়াছেন তার আর কোন ভয় নাই।... তোমাদের মতো কৃপা মায়ের কাছে কজনা পাইয়াছে? বুড়োকে এসময়ে ভুলিও না। তোমার দ্বারা আমি মায়ের কাছে অনেক কৃপা পাইলাম।... সাক্ষাতে মায়ের মহিমা বলিব। শুনিলে তুমি পাগল তো লোকের কাছে আছই, তার উপর আরও পাগল হইবে ও আমাকে আর ছাড়িতে চাহিবে না।...

(৫)

[ময়নাপুর]

২০।১১। (১৯) ২০

... তোমার মনোরথ অচিরে পূর্ণ হয়—ইহা আন্তরিক ইচ্ছা। আমার বিশ্বাস মায়ের কৃপায় হইবেই হইবে। মায়ের অলঙ্ঘ্য বাক্য—হরিহরের কাটিবার সাধ্য নাই। মা ত্রিগুণময়ী সৃষ্টীশ্বরী। যাবতীয় নামরূপ মায়ের পদতলগত। মায়ের মাহাত্ম্য ঠাকুর ব্যতীত আর কাহারও জ্ঞাত নাই। মায়ের জয় হউক ও তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

মায়ের শরণাগত দাস

শ্রীঅক্ষয়কুমার

(৬)

মকরসংক্রান্তি

...আমার সঙ্গে তোমার কেবল ক্ষণিক শান্তি হইতে পারে। এ শান্তি আর চাহিও না। চিরশান্তির জন্য সেই শান্তিময়ীর নিকট প্রার্থনা কর, অতি অল্পকাল মধ্যেই তোমার আনন্দের অবস্থা আসিবে। দিন কয়েক সহ্য কর। আমাদের মতো ভাগ্যবান লোক জগতে কটা? হবার বাকি কি আছে। জন্ম জন্ম কঠোর তপস্যার ফলের চেয়েও

মূল্যবান ফল মায়ের এক দর্শনেই পাইয়াছি। বেদকথাকে উপকথা ও শ্রীশ্রীমাকে সাধারণ ব্রাহ্মণের মেয়ে জ্ঞান করিয়াই সর্বনাশ করিয়াছি। মনে কর দেখি, দেহ রাখিয়া যখন সেখানে গিয়া দেখিব—সেই বিরাট সিংহাসনে ঠাকুর ও মা দুজনে বসে আছেন, তখন—বসিতে পারিলাম না, কাজেই লেখা বন্ধ করিতে হইল।... কষ্টভোগের জন্য মা এই যাতনার সংসারে রাখিয়াছেন। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হউক। তাঁর জয়—মায়ের জয়।...

(৭)

[১১।৭।(১৯)২৬]

কেন মা কেন মা আজি এ নবভাব জননী,
নাহি নড়া সাড়া কেন নাহিক শ্রীমুখে বাণী।
কৈ সে সুধাকথা, যাহে নষ্ট হৃদয়ব্যথা,
হৃদয়ে রয়েছে আঁকা (সেই) কথামৃত-সঞ্জীবনী।
ছিলে মা মাটির ঘরে দশদিক আলো করে,
আজি দেখি শ্রীমন্দিরে কেবল প্রতিমাখানি।
মা ছিলে, প্রতিমা হলে, মা তুমি কোথা লুকালে;
দেখা পাব কোথা গেলে দাও মা বলে, বিকল প্রাণী।
বুঝি অভিমানের ভরে লুকিয়েছ মা লোকান্তরে,
দেখতে কি পাব না ফিরে অভয় পদ দুখানি।
রামকৃষ্ণ-মহালীলায় মা তুমি হইয়া সহায়
পূর্ণ করিলে মহিমায় জগ-মা জগ-বন্দিনী॥

স্নেহাস্পদ,

...এখন মা একরকম রেখেছেন। তাঁর দিকেই সর্বদা মন আকৃষ্ট। সংসারের অসারতা ও অনিত্যতা খুব দেখাইতেছেন। আবার যদি বিপরীত দেখান তখনও তদ্বৎ।...

(৮)

ময়নাপুর
২৪শে কার্ত্তিক (১৯২৩)

শ্রীমান,

দীর্ঘায়ু ও নিরাপদ হও, ইহাই মায়ের চরণে প্রার্থনা।...

শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে চক্ষু ভিক্ষা করিয়াছিলাম। কল্পতরু তা দিয়াছেন। এ-সংসার, যা দেখিতেছি, অতি বিচিত্র। কথায় বলিবার নহে, বলিলেও অপরের উপলব্ধির নহে। এ-দর্শনের পথ জ্বালাময় যাতনাময় বজ্রকঠোর। পলে পলে বিষোদ্গারিণী বিষধরীর দংশন। এইসব মায়ের ইচ্ছায়। জানিয়া দেখিয়া চলিতেছি, সুতরাং 'মা রাখ' বলিবার যো নাই। যে সহ্য করিতে পারে মা তাকে বেঁধে মারে। নিজের ছাগল যেদিকে ইচ্ছা কাটিবে। ব্যাসকূট—হিঁয়ালি। বুঝবার যো নাই। মা দয়াময়ী আর কৈ, মা ইচ্ছাময়ী।...

দেশে এবৎসর খুব ম্যালেরিয়া। এক-এক দিন রন্ধন বন্ধ। পূর্বের ন্যায় একশত পিল যত শীঘ্র পার পাঠাও।... এসময়ে কাছে থাকিলে বিস্তর সাধনায় দ্রষ্টব্য এমন অনেক দেখিতে পাইতে। অবস্থায় না পড়িলে, কিংবা অবস্থায় যে পড়েছে তাকে না দেখিলে তত্ত্ব উপলব্ধি হয় না।... দিন অচল থাকে না, চিরদিন সমান যায় না। যাতনার ভিতরেও যখন মাকে পাইতেছি, মাকে আর ভয় কেন? মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ হউক, তাঁর জয় হউক।... এখন যে দেহের অবস্থা, এ অতি যাতনাময়। দালানবাড়িতে সেই একা। কখন কখন ভয়ে কেঁদে ফেলি। আজ ২৮শে কার্ত্তিক। এই ৪ দিনের মধ্যে একদিন যাই যাই।

[এই পত্রই মনে হয় অক্ষয়বাবুর লেখা শেষ পত্র। অতঃপর তিনি ৭ ডিসেম্বর তারিখে অভয় অমৃতলোকে প্রয়াণ করেন। আগে

লেখা একখানি পত্রের মধ্যে তাঁর রচিত নিম্নোক্ত গীতটি পাওয়া গিয়েছে—

কে তুমি প্রেমী বিরাগী, বালক-আচার।
হাস কাঁদ নাচ গাও মা-মা বোলে অনিবার॥
নয়ন দুখানি বাঁকা, কটাক্ষে করুণা মাখা,
দীনহীনের সখা হেন নাহি দেখা যায়;
কৃপাবারি-বরিষণে যেন ঘন বরিষার॥
ভাবেতে সদা বিহ্বল, তনুখানি টলটল,
শ্রীবদন সমুজ্জ্বল কিবা শোভা পায়;
বিকচ কমলে যেন মাখা কর চন্দ্রিমার॥
বেণুবীণা জিনি স্বর, কণ্ঠে গীতি সুমধুর,
শ্রুতিবিমোহনকর যে শুনে মোহ যায়;
ত্রিতাপতাপিত চিতের সদ্য শান্তির আগার॥
নিরক্ষর বিদ্যাপতি, কণ্ঠতুণ্ডে সরস্বতী,
শ্রুতি স্মৃতি গীতা পাঁতি সব বাহিরায়;
ভকত মধুপজাতি পিয়ে তত্ত্বসুধাসার॥
জগৎগুরুর বেশে জ্ঞানভক্তি পরকাশে,
জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে বাঁটিলে সবায়;
যে যেমন তেমন রেখে ভাবে কৈলে একাকার॥
চিরকেলে ধর্মদ্বন্দ্ব ঘুচাইলে তমসন্দ,
কি আনন্দ এবারে ধরায়;
রামকৃষ্ণ সর্বধর্মসমন্বয়ের অবতার॥
রামকৃষ্ণদাস অক্ষয় শ্রীপদে মাগে আশ্রয়,
দেহ প্রভু শুদ্ধাভক্তি মোহিও না আর;
সকল বিফল, কেবল চরণকমল সার॥]□